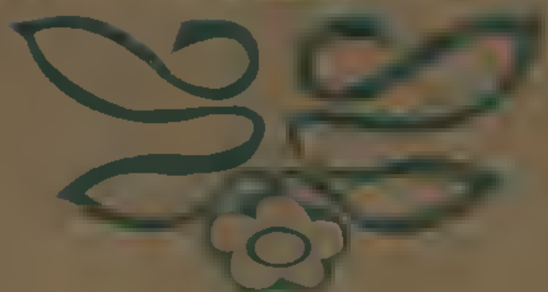


মাদারেজুন নবুওয়াত



শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত

চতুর্থ খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশঃ জুন ২০০২ ইং
রবিউল আউয়াল-১৪২৩ হিঃ
দ্বিতীয় প্রকাশঃ মে ২০১০ ইং

প্রচ্ছদঃ আব্দুর রৌউফ সরকার

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা

MADAREZUN NABUWAT (VOL. IV) By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated by Maolana Mominul Haque/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh. Exchange : Taka 180.00 US $ 10 only.

ISBN 984-70240-0016-3

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ইচ্ছেমতো যে কিছু একটা করবো, তার উপায় নেই। সারাক্ষণ শরীরে সেঁটে বসে আছে অক্ষমতার পরিচ্ছদ। অযোগ্যতার উত্তরীয়। আর পাপবোধও আমাদের অভিপ্রায়ের আকাশকে করে রাখে মেঘাচ্ছন্ন। সুর ও স্বরবিবর্জিত সময়-সঙ্গীতের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে আমাদের অপেক্ষাগুলো।

আমরা জানতে পারি না কখন কোথায় কী কীভাবে কেনো ঘটছে। অনন্ত রহস্যময়তার বিস্ময়কর বিস্ফোরণের নির্বাক দর্শক আমরা। হতবাক হয়ে দেখি—তাঁর অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়ের অভিঘাতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে জমাট মেঘের টুকরা। বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে শস্যজ সম্ভাবনার। বিষয়ের বাগানে বেদনার বৃক্ষে বিরহের বৃন্তে দল মেলছে প্রেমপুষ্প —নবতম গ্রন্থকমল।

এভাবে এবার ফুটলো 'মাদারেজুন্ নবুওয়াত চতুর্থ খণ্ড' — বঙ্গপিপাসার প্রার্থিত সলিল। রসুলবিরহীরা জয়ধ্বনি করুন। বলুন — আল্লাহু আকবর। বলুন — ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলুন — সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আস্হাবিহি ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহ্লি বাইতিহি আজ্মাঈন। আমিন।

পৃথিবী পুড়ে যাচ্ছে — পাপে, অমমতায়, ভ্রাতৃহননে, আত্মহননে। ক্রমাগত অবমানিত হয়ে চলেছে পুষ্প-পাখি-শিশু-রমণী-নীড়-নিসর্গ। সুন্দর শৃঙ্খলিত। নিরাপত্তা প্রপীড়িত। ভালোবাসা বাস্তুচ্যুত।

মূঢ় মানবতা! এবার যে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আসতে হবে ভালোবাসার সবুজ গম্বুজের ছায়ায় — যদি পরিত্রাণ চাও, চাও মহাকল্যাণ, পৃথিবীর এবং পরবর্তী পৃথিবীর। ধরতে হবে পথ, সেই মহানতমজনের, যিনি আপন, আপনতম, মহাবিশ্বের মহামমতার পারাবার।

আমরা তাঁর পথের কতিপয় বিনম্র সেনানী, ডাক দিয়ে যাচ্ছি, ডেকে ডেকে মরছি — সেই কবে থেকে।

কবে সকাল হয়েছে। প্রত্যুষের নরম আলো প্রখর, প্রখরতর হচ্ছে। এখনো কি জাগবে না? এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে যে। সামনে রোদন ও রহস্যের কতো সাগর, কতো মরুভূমি, কতো পাহাড়-পর্বত-অরণ্যানী! জ্ঞান ও প্রেমের প্রদীপ বুকে জ্বালিয়ে নাও। চলো। ওঠো। চলো......

চতুর্থ খণ্ডটিও অনুবাদ করেছেন এই নগণ্য ফকিরের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মুমিনুল হক। এর সঙ্গে অন্যান্য ফকির-দরবেশগণের সযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধান তো রয়েছেই। দোয়া করি অনুবাদক, প্রকাশক, সহযোগী, সমর্থক, পাঠক-পাঠিকা সবাইকে আল্লাহ্তায়ালা দান করুন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের প্রণোদনা ও প্রচেষ্টাকে দান করুন নিরাপত্তা ও সাফল্য। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।
প্রারম্ভে ও অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।



তোমার নামের নেশা কাটে না যে কিছুতেই প্রিয়
বাসনার বৃন্ত থেকে ঝ'রে গ্যাছে বহুবিধ ভুল
প্রযুক্তি প্রবৃত্তি বুদ্ধি সব কূলে অবাণিজ্য ভাসে
সত্তার সমস্ত সীমা মত্ত হ'লো তোমার নেশায়।
শ্রুতি যদি মুছে যায় একবার ওই নাম শুনে
চিরতরে, তবু জানি ধন্য হবে শোনার কারণ
একটি বারের মতো ওই নাম উচ্চারণ ক'রে
বাকশক্তি চিররুদ্ধ হয় যদি তবু রাজী আছি।

মুহূর্তের পটে যদি একবার দ্যাখা দিয়ে যাও
তারপর দিনভর রাতভর অন্ধ হ'তে পারি
দোজখের শাস্তিশিখা মেনে নিতে কী আপত্তি আছে
তোমার নামের রেখা আঁকো যদি বুকের জখমে
বিনা উচ্চারণে মনে তোমারই নামের নাদ, নবী!
প্রভুপ্রশংসিত তুমি প্রেমমূল প্রেমিক মনের।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফসীরে মাযহারী (১-১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী-১ম ও ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশবন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্ত প্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদের
কাব্যসংকলন

সূচী

চতুর্থ প্রকার ইবাদত ঃ রোজা

পানাহার এবং সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। পরিপূর্ণ রোজা হচ্ছে, শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় গোনাহ এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত রাখা। কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে, মিথ্যা কথা এবং গীবত রোজাকে নষ্ট করে দেয়। ইমাম আহমদ র. বলেছেন গীবত যদি রোজাকে নষ্ট করে তবে আমাদের মধ্যে কে আছে এমন, যে তার রোজাকে ঠিক রাখতে পারবে। রোজা উত্তম, না নামাজ এ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। জমহুরের মাজহাব হচ্ছে নামাজই উত্তম। তাঁদের দলিল এই হাদিস— তোমরা আমল করো, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামাজ। আবু দাউদ। নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু উমামা রা. বলেছেন, আমি একবার রসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে একটি উত্তম আমল শিক্ষা দিন। তিনি স. বললেন, তোমার উপর রোজা অত্যাবশ্যক করে নাও। কেননা রোজার মতো আমল আর নেই। হাদিসখানির মর্মার্থ এরকম হতে পারে যে, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রোজা অন্যান্য আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেন, রোজা আমার জন্য, আর আমিই তার বিনিময় প্রদান করবো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আদম সন্তানদের সমস্ত আমল তাদের নিজেদের জন্য, আর রোজা আমার জন্য। 'আমিই তার বিনিময় প্রদান করবো' কথাটির অর্থ— আমি তাকে অনেক সওয়াব দান করবো, অথবা তাকে আমি প্রদান করবো পরিপূর্ণ সওয়াব। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে রয়েছে, বনী আদমের প্রত্যেক আমলের সওয়াব দশ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। রোজা আমার জন্যই। আমি তাকে এমন পুরস্কার প্রদান করবো, যার পরিমাণ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি এ সম্পর্কে কাউকে অবহিত করবো না। কেননা এ পুরস্কার আমি তাদেরকে দান করবো ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতিরেকেই। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'রোজা আমার জন্য' অথচ সকল ইবাদতই করা হয় আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। সুতরাং বুঝতে হবে 'আমার জন্য' বলে প্রকাশ করা হয়েছে রোজার

অনন্যসাধারণ মর্যাদার কথা। অথবা কথাটির অর্থ— গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করা যায় অন্যান্য আমলের মাধ্যমে। কেবল রোজা হচ্ছে ব্যতিক্রম। কেননা কোনো কাফের রোজা দ্বারা তাদের মিথ্যা মাবুদদের ইবাদত করেছে, এরকম প্রমাণ নেই। কিন্তু সেজদা, অর্থ-অর্ঘ উৎসর্গ, মূর্তিদর্শনের জন্য দূর দূরান্ত থেকে আগমন; প্রতিমার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদির প্রমাণ রয়েছে ভুরি ভুরি। যুগে যুগে প্রতিমাপূজকেরা এরকমই করে এসেছে। কিন্তু রোজা এ ধরনের অপব্যবহার থেকে মুক্ত। রোজা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ আমল। কেউ যদি রোজা না রেখেও বলে 'আমি রোজাদার' তবে একথা বলা যাবে না যে, সে অহংকারী (রিয়াকারী)। সে যদি রিয়া করেই থাকে তবে বলতে হবে, রিয়া করেছে সে তার কথায়, রোজার মধ্যে নয়। রোজাদারের নফস (প্রবৃত্তি) রোজার মধ্যে কোনো লয্‌যত (আস্বাদ) পায় না। সুতরাং বুঝতে হবে, রোজাদার রোজা পালন করে কেবল তার প্রভুপ্রতিপালকের উদ্দেশ্যেই। যেমন বোখারী শরীফে এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, বান্দারা আমার উদ্দেশ্যে তাদের পানাহার এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে, তাই তার রোজা আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করবো। প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অর্থ— সহবাস হতে পারে অথবা হতে পারে যাবতীয় অসৎ কামনা-বাসনা। যাবতীয় কামনা-বাসনা বর্জন করতে হলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ থেকে বিরত রাখতে হবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ বলেছেন, রোজার মাধ্যমে পানাহার বর্জন করা প্রভুপ্রতিপালকত্বের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত বান্দাকে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেন। সার কথা হচ্ছে, সকল ইবাদতের মধ্যে রোজা একটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইবাদত। বিশেষ করে রমজানের রোজা। কেননা রমজানের রোজা ফরজ।

রসুলে আকরম স. স্বভাবগতভাবেই সৃষ্টিকুলের প্রতি ছিলেন মমতাময়। বিশেষ করে রমজান মাসে তাঁর দয়ামায়া যেনো উছলে পড়তো। রমজানের দিনে-রাতে সব সময়ই তিনি প্রচুর দান খয়রাত করতেন। জিকির, নামাজ, ইতেকাফ ও তেলাওয়াতে ভরপুর রাখতেন রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত। যেহেতু এই পবিত্র মাসটি ফয়েজ ও বরকতে থাকে ভরপুর, তাই এমতো মহান দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই তিনি স. বিভোর থাকতেন ইবাদত-বন্দেগীতে। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া ও দান যেহেতু এ মাসে প্রবল- প্রবলতর হয়, তাই তাঁর মধ্যেও দয়া ও দানের প্রাবল্য প্রকাশ পেতো অত্যধিক। কেননা তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নূর ও গুণাবলীর প্রতিবিম্বস্থল। তিনি স. রমজান মাসের প্রতি রাতে হজরত জিবরাইলের সাক্ষাৎ পেতেন। জিবরাইল আ. এর সঙ্গে যখন মিলিত হতেন, তখন খায়ের ও বরকত এতো প্রবল বেগে বর্ষিত হতো যে, তা সকলের কাছেই পৌঁছে যেতো।

রমজান মাসে তিনি স. জিবরাইল আ.কে কোরআন মজীদ পাঠ করে শোনাতেন জিবরাইল আ.ও তাঁকে কোরআন পাঠ করে শোনাতেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে চলতো কোরআন পঠন-শ্রবণের পালা। যেমন কোরআনের হাফেজগণ একে অপরকে কোরআন পাঠ করে শোনান। এ সকল বিবরণের মধ্যে মানুষের জন্য এই শিক্ষাটি রয়েছে যে, তারা যেনো রমজান মাসের এই খায়ের ও বরকতের মুহূর্তগুলোতে পুণ্যবান মানুষের সাহচর্য গ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রয়াসী হয় অত্যধিক পুণ্যকার্য সম্পাদন ও পাপকর্ম পরিত্যাগের জন্য।

রমজান মাসের রোজা ফরজ হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। তখন থেকেই রসুলপাক স. রমজানের রোজা রাখতে শুরু করতেন। কোরআন মজীদ অবতরণের প্রারম্ভকালও ছিলো রমজান মাস। লওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশেও পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয় এই রমজান মাসেই। আলেমগণ বলেন, হজরত ইব্রাহীম আ. এর সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিলো রমজান মাসের প্রথম রাত্রিতে। রমজানের ষষ্ঠ রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো তওরাত শরীফ। আর ইঞ্জিল শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিলো রমজানের ত্রয়োদশ রাত্রিতে। আর কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয় রমজানের চব্বিশতম রাতে।

রসুলেপাক স. যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখনই ইফতার করতেন। অযথা বিলম্ব করতেন না। বিলম্ব করতেন সেহরী খাওয়ার বেলায়। তাঁর সাহাবীগণও জনসাধারণকে অবিলম্বে ইফতার এবং বিলম্বে সেহেরী করার জন্য উৎসাহ দিতেন। রসুল স. কয়েকখানা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। কখনও খেজুর না পেলে ইফতার সম্পন্ন করতেন কয়েক ঢোক পানি দিয়ে। সেহরীর সময়ও তিনি স. খেজুর ভক্ষণ করতেন। এ সম্পর্কে তিনি স. বলতেন, সেহরীর জন্য খেজুর কতোই না উত্তম। ইফতারের সময় তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন— হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আমি রোজা রেখেছি আর তোমার দেওয়া রিজিক দিয়ে ইফতার করলাম। সুতরাং আমার রোজা কবুল কর। ইফতারের পর পাঠ করতেন— পিপাসা দূরীভূত হলো, শিরাসমূহ শান্ত হলো, পুরস্কারও হলো নির্ধারিত। ইফতারের সময় এরকম দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব। তিনি স. রোজাদারদেরকে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে, গীবত করতে, ঝগড়া-ঝামেলা করতে এবং কলহপটুদের কথার প্রত্যুত্তর দিতে নিষেধ করেছেন। রমজান মাসে সফররত অবস্থায় কখনও কখনও তিনি রোজা রাখতেন, আবার কখনও কখনও রোজা পরিত্যাগ করতেন। অন্যদেরকেও সফরে রোজা রাখা না রাখার ব্যাপারে এরকম নিজস্ব ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে বলতেন। বিদ্বানগণের মধ্যে এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম, না উত্তম রোজা পরিত্যাগ করা। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ ইমামগণের

মাজহাব হচ্ছে— সফর অবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা উত্তম, যে রোজা রাখতে সমর্থ। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কষ্ট-অসুবিধা না হলে রোজা রাখাই উত্তম। আর কষ্ট হলে রোজা না রাখাই সমীচীন। রমজানের রাতে গোসলের প্রয়োজন পড়লে তিনি স. রাতেই গোসল সেরে নিতেন। আবার কোনো কোনো রাতে গোসল করতেন সুবেহ্সাদেকের পর। আলেমগণ বলেন, রাত থাকতে গোসল করে নেওয়া উত্তম। তিনি স. রমজানের দিনের বেলায় মেসওয়াক করতেন, কুলি করতেন, নাকে পানি দিতেন। তবে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা করতেন না। রমজানের মধ্যে দিনের বেলায় মেসওয়াক করা এবং সুরমা লাগানোর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনো সহীহ্ হাদিস পাওয়া যায় না। ইমাম আবু হানিফার মাজহাব এর বৈধতার দিকে। তাঁর নফল রোজা রাখার নিয়ম ছিলো এরকম— রোজা রাখতে শুরু করলে একাধারে রোজা রেখেই যেতেন। মানুষ মনে করতো, তিনি স. বুঝি আর কখনো রোজা ছাড়বেন না। আবার যখন রোজা না রাখা শুরু করতেন, তখন একাধারে রোজা না রেখেই চলতেন। এমনকি মানুষ তখন মনে করতো, তিনি স. বুঝি আর কখনো রোজা রাখবেন না। রসুলেপাক স. আইয়ামে বীযের রোজা রাখার প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন। এমনকি সফরে থাকলেও কখনো কখনো আইয়ামের বীযের রোজা ভঙ্গ করতেন না। তবে সারা বৎসর রোজা রাখার ব্যাপারে তিনি নিষেধ করতেন। এ সম্পর্কে তিনি স. বলতেন এরকম রোজাদারের রোজা রোজা নয়। তার ইফতারও ইফতার নয়। সোমবার এবং বৃহস্পতিবারেও তিনি স. রোজা রাখতেন এবং জিলহজ মাসের প্রথম নয় দিনও রোজা রাখতেন। বলতেন, জিলহজ মাসের রোজার চেয়ে উত্তম কোনো নফল রোজা নেই এবং এ দিনগুলোর চেয়ে কোনো উত্তম দিনও নেই। আশুরার রোজা অর্থাৎ মহররম মাসের দশম দিনের রোজাও তিনি যথারীতি পালন করতেন। জীবনের অন্তিম সময়ে রসুল স. বলেছিলেন, আগামী বৎসর বেঁচে থাকলে আমি মহররমের নয় তারিখেও রোজা রাখবো। জিলহজ মাসের নয় তারিখে আরাফাতের দিনে হজ পালনের সময় তিনি রোজা রাখেননি। শাওয়াল মাসের ছয় রোজা সম্পর্কে তিনি স. বলেছেন, রমজানের রোজার পর যারা এ ছয়টি রোজা রাখবে, তারা সারা বৎসর রোজা রাখার মতো সওয়াব পাবে।

রসুল স. রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। জীবনে একবার মাত্র তাঁর ইতেকাফ বাদ পড়েছিলো। সেই বাদ পড়ে যাওয়া ইতেকাফ শাওয়াল মাসে কাযা হিসেবে আদায় করে নিয়েছিলেন। একবার ইতেকাফ করেছিলেন রমজানের প্রথম দশ দিন। একবার মধ্যবর্তী দশদিন। আর একবার শেষ দশদিন। যখন জানতে পারলেন, শবে কদর শেষ দশদিনে হয়ে থাকে, তখন থেকে পৃথিবীর জীবনের শেষ পর্যন্ত শেষ দশ দিনেই তিনি স. ইতেকাফ করেছিলেন। তাঁর ইতেকাফ পালনের জন্য কখনও কখনও মসজিদের ভিতরে তাঁবু (পর্দা) করে

দেওয়া হতো। আবার কখনও বিছিয়ে দেওয়া হতো তক্তা। তার উপর বিছানো হতো ফরাশ। এভাবে প্রতি বৎসরেই তিনি স. দশ দিন ইতেকাফ করতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে একবার বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন। তবে চল্লিশ দিন ইতেকাফ করার কথা কোনো বর্ণনাতেই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বৎসরই হজরত জিবরাইল আ. এর সঙ্গে কোরআন মজীদ শ্রবণ-পঠন করতেন। জীবনের শেষ বৎসর শ্রবণ-পঠনের অনুষ্ঠান করেছিলেন দুইবার। ওফাত শরীফের অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সওমে বেসাল (বিরামহীন রোজা) ঃ

রসুলেপাক স. রমজান মাসের কোনো কোনো রাতে পানাহার করতেন না। এভাবে বিরামহীন রোজা রেখে যেতেন। ইফতারও করতেন না। কিন্তু সাহাবীগণকে এরকম করতে নিষেধ করতেন। এটা ছিলো স্নেহশীল হওয়া এবং তাঁর স্বচ্ছ দূরদর্শিতা এবং তাঁদের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ-মমতার প্রকাশ। উম্মত-জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন সওমে বেসাল করতে নিষেধ করলেন, তখন সাহাবীগণ নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমাদেরকে সওমে বেসাল পালন করতে নিষেধ করা হচ্ছে কেনো ? আমরা তো আপনার অনুসরণের মুখাপেক্ষী। তিনি স. বললেন, তোমরা আমার মতো নও। এক বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে? আমি তো আমার প্রভুপ্রতিপালকের সঙ্গে রাত্রিযাপন করি। কেননা তিনিই আমার পালনকর্তা এবং আমার একান্ত সহায়। তিনি আমাকে আহার করান, পানও করান।

উল্লেখিত পানাহার সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত পানাহারসামগ্রী পৃথিবীর দৃশ্যমান পানাহার সামগ্রীর মতোই। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে প্রতি রাতে বেহেশত থেকে কথিত পানাহার সামগ্রী সরবরাহ করতেন। আর তিনি তাই পানাহার করতেন। এটা ছিলো তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ মর্যাদা। এজাতীয় পানাহার দ্রব্য হণ করা সওমে বেসালের পরিপন্থীও নয়। এতে করে রোজা ভঙ্গ হওয়াও সাব্যস্ত হয় না। কেননা রোজা ভঙ্গের ক্ষেত্রে যে খাদ্য ও পানীয় শরিয়ত নির্ধারণ করেছে, তা পার্থিব। তাই মোজেজার পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জান্নাতী আহার্য ও পানীয় রোজা ভঙ্গকারী নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো একই সঙ্গে পুরস্কার ও সওয়াব। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত পানাহারের কথা বলে রসুলেপাক স. এর শারীরিক সামর্থ্যের কথাই বলা হয়েছে। তিনি আমাকে পানাহার করান— কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে পানাহারজনিত শক্তি দান করেন। অর্থাৎ তিনি আমাকে এমন কিছু দান করেন, যা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত, যার কারণে আমি ইবাদত-বন্দেগীর শক্তি পেয়ে থাকি। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণাজনিত কোনো ক্লান্তি-অবসন্নতা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে উক্ত পানাহার সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণের

পছন্দনীয় মত হচ্ছে আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেন রূহানী আহার্য, যা প্রকৃতপক্ষে উদ্দীপনা, আত্মিক আস্বাদ, সংগোপন আলাপন, মারেফতের ফয়েজ এবং আল্লাহ্তায়ালার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য, যা আপতিত হতো তাঁর হৃদয়ে, আত্মায় ও সত্তায়। তাই তিনি স. পানাহার না করেও থাকতেন পরিতৃপ্ত ও প্রফুল্ল। ফলে শারীরিক খাদ্যগ্রহণের কোনো প্রয়োজনই তাঁর পড়তো না। রূপক ভালোবাসা ও প্রকাশ্য আনন্দের ক্ষেত্রেও তা ছিলো একান্ত বাস্তবপ্রতিম। তাই প্রচলিত পানাহারের কথা তাঁর মনেই পড়তো না। রূপক মহব্বতের প্রভাবই যদি এরকম হয়, তবে প্রকৃত মহব্বত এবং আত্মিক আনন্দ যে কীরূপ হবে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

উম্মতের জন্য সওমে বেসালের মাসআলা

রসুলে আকরম স. ব্যতীত অন্য কারও জন্য সওমে বেসাল জায়েয, হারাম, না মাকরুহ— সে সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের একদল বলেন, ওই লোকের জন্য সওমে বেসাল জায়েয, যে সামর্থ্যধারী। এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পনের দিন পর্যন্ত একাধারে সওমে বেসাল করতেন। ইব্রাহীম নাখয়ী তাবেয়ী থেকে কথিত হয়েছে, তিনি চল্লিশ দিনব্যাপী রোজার মধ্যে ভক্ষণ করতেন একটি অথবা কয়েকটি আঙ্গুর। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো সাধক একাধারে চল্লিশ দিন ধরে পানাহারহীন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন, যেনো চল্লিশ দিন তাঁদের কাছে ছিলো একদিন। বর্ণিত হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী বিরতিহীন রোজা পালন করতেন। এতে করে মনে হয় রসুল স. এর নিষেধাজ্ঞা ছিলো উম্মতের প্রতি তাঁর অপার স্নেহমমতাবশতঃ। হারাম করার উদ্দেশ্যে তিনি স. বারণ করেননি। তবে অধিকাংশের মত হচ্ছে, উক্ত রোজা উম্মতের জন্য জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মাজহাবও এরকম। ইমাম শাফেয়ী স্পষ্টভাবে একে মাকরুহ বলেছেন। তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহে তাহরীমি। আবার কেউ কেউ একে সাব্যস্ত করেছেন মাকরুহে তানযীহী বলে। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ এবং ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ বলেছেন, সওমে বেসাল সেহেরী পর্যন্ত জায়েয। এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা সওমে বেসাল কোরো না। তবে সেহেরী পর্যন্ত করতে পারো। এদ্বারা বুঝানো হয়েছে, ইফতার বিলম্ব করে সেহেরী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। একেবারে ইফতার ও সেহেরী না করে বিরতিহীন রোজা রাখা যায় না। অর্থাৎ কষ্টকর না

হলে এরকম করা বৈধ। অযথা কষ্ট করার নাম ইবাদত নয়। এভাবে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যও আশা করা যায় না। উপরোক্ত হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ— বেসালের রোজা রসুল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট। তাই জমহুরের মাজহাব হচ্ছে— তিনি স. ছাড়া অন্য সকলের জন্য সওমে বেসাল হারাম। কেননা তিনি স. এরূপ করতে সাধারণভাবে বারণ করেছেন। বলেছেন, তোমরা সওমে বেসাল কোরো না। আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পথে রিয়াজত ও মুজাহাদার মাধ্যমে যাঁরা নফসকে শাসন করতে চান, তাঁরাও যেনো অন্ততপক্ষে এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করে নেন, যাতে করে বেসালের শর্ত পূর্ণ হয়, আবার হারামের মধ্যেও যেনো পতিত হতে না হয়।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

পঞ্চম প্রকার ইবাদত ঃ হজ ও ওমরা

হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা, অভিপ্রায়। শরিয়তের পরিভাষায় হজ হচ্ছে এক বিশেষ নিয়মে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করা। হজ শব্দটির 'হা' বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই দেওয়া যায়। হজ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেন, 'ওয়া লিল্লাহি আ'লান্ নাসি হিজ্জুল বাইত'

ওমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ আধিক্য। ওমরা হজের উপর অধিক বা অতিরিক্ত কাজ। তাই এর নাম ওমরা। শরিয়তের পরিভাষায় ওমরা হচ্ছে এমন বিশেষ কাজ, যা তওয়াফ ও সায়ীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওমরা পালনে উকুফে আরাফা (আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান) নেই। উকুফে আরাফা সম্পৃক্ত হজের সাথে। হজের সাথে ওমরার সম্পর্ক ওই রকম, যেরকম ফরজ নামাজের সাথে সম্পর্ক নফল নামাজের। রসুলেপাক স. হজ পালন করেছেন একবার, হিজরতের পরে, যাকে হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ) বা হাজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়। ওই হজ পালনের সময় রসুলেপাক স. মানুষকে হজের আহকাম ও মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সম্ভবত আগামী বৎসর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো না। তিনি স. এরকম বলেছিলেন হজের খুতবা দানকালে। বলেছিলেন, ওই সময় অতি নিকটে, যখন তোমরা আপন প্রভুপালকের কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সুতরাং তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর যেনো তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা পুনরায় কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন কোরো না। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক একে অপরকে হত্যা করবে। সুতরাং তোমরা সাবধান! আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুপালনকর্তার নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত, তারা অনুপস্থিতদের কাছে ধর্মের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি পৌঁছে দিয়ো। এটা

তোমাদের কর্তব্য। আর যাদের কাছে এই বিধানাবলী পৌঁছে দেওয়া হবে, তারা হয়তো হবে পৌঁছানেওয়ালার চেয়ে অধিক সংরক্ষণক্ষম এবং প্রজ্ঞাবান। রসুলেপাক স. আরও বললেন, তোমরা হজের মাসায়েল শিখে নাও, সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার আমি হজ করতে পারবো না। আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কোরো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পোড়ো, রমজান মাসের রোজা রেখো এবং আপন আপন প্রশাসকের আনুগত্য কোরো। তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি স. হজ করেছিলেন হিজরতের দশম বৎসরে। তবে হিজরতের পূর্বেও রসুল পাক স. হজ করেছিলেন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরতের পূর্বে দু'বার হজ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন হজ করেছিলেন তিনি তিনবার। কেউ কেউ বলেন এর চেয়েও অধিক হজ করার কথা। মূল কথা হলো, এব্যাপারে কোনো সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নেই।

জমহুরের মতে হজ ফরজ হয়েছিলো হিজরতের অষ্টম বৎসরে। সুসাব্যস্ত মত হচ্ছে, নবম বৎসরে। ওই বৎসরেই রসুলেপাক স. হজের সফরের জন্য আসবাবপত্র প্রস্তুত করায় মশগুল হয়েছিলেন। তবে যুদ্ধের কারণে সে বৎসর হজ করতে পারেননি। রসুলেপাক স. এর দরবারে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল আগমন করতেন বিধায় সে সময় তাঁর পক্ষে সকলকে হজের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব হয়নি। তাই তিনি একবার হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে আমীরুল হুজ্জাজ (হজাধিনায়ক) নিযুক্ত করে মক্কা মুকার্‌রমায় প্রেরণ করেন। এরপর মুশরিকদেরকে সুরা বারায়াতের নির্দেশাদি শোনানোর জন্য প্রেরণ করেন হজরত আলী রা.কে। যখন হজরত আলী মুর্তজা মক্কায় পৌঁছলেন, তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বললেন, তুমি আমীর না মামুর (অধিনায়ক না অনুগামী)। তিনি বললেন, আমি অনুগামী। সুরা বারায়াতের হুকুম নিয়ে হজরত আলীকে বিশেষভাবে পাঠানোর কারণ ছিলো এই — এই সুরার মধ্যে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা ছিলো। তখনকার নিয়ম ছিলো, চুক্তিভঙ্গের সময় স্বয়ং চুক্তিসম্পাদনকারী অথবা তাঁর পরিবারের কেউ উপস্থিত হয়ে তা ভঙ্গ করার ঘোষণা দিবে। এ কারণেই তিনি স. হজরত আলীকে পাঠিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. ওমরা পালন করেছেন চারবার। তাঁর প্রথম ওমরা সম্পাদিত হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর। হিজরতের ষষ্ঠ বৎসরে তিনি স. ওমরার উদ্দেশ্যেই মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। হুদায়বিয়া ছিলো মক্কা থেকে এক মনযিলের দূরত্বে। সেখানে পৌঁছার পর দেখতে পেলেন, মুশরিকেরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিলো। আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিজয়ের অঙ্গীকার যেহেতু তখনও পূরণ হয়নি, তাই

আল্লাহ্তায়ালার হুকুম মতো তাদের সঙ্গে তিনি স. সন্ধি করলেন এবং ইহরামমুক্ত হয়ে গেলেন। উভয়পক্ষের আলোচনায় সাব্যস্ত হলো, আগামী বৎসর তিনি স. ওমরা পালন করতে পারবেন। এরকম সন্ধির পর তিনি স. মদীনায় ফিরে এলেন। তিনি স. দ্বিতীয় ওমরা করেছিলেন সপ্তম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুসারে। ওমরা শেষে তিনদিন পর ফিরে আসেন মদীনায়। তৃতীয় ওমরা করেছিলেন অষ্টম হিজরীতে, মক্কাবিজয়ের বৎসর। হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মালসমূহ বন্টনের পর মক্কা শরীফ থেকে এক মনযিল দূর জিইররানা নামক স্থান থেকে রাত্রি বেলায় তিনি স. চলে আসেন ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে। ওমরা শেষে আবার রাত্রি বেলায়ই ফিরে যান জিইররানায়। চতুর্থ ওমবা করেছিলেন দশম হিজরীতে বিদায় হজের সময়। তিনি স. তিন বার ওমরা করেছিলেন বলে কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করে থাকেন। হুদায়বিয়ার বৎসর প্রকৃতপক্ষে তাঁর ওমরা পালন করার সুযোগ হয়নি। কেননা তখন তিনি স. মক্কা শরীফে প্রবেশই করতে পারেননি। হুদায়বিয়া থেকেই ইহরাম মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু জমহুর উলামা তাকেও ওমরা হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

রসুল স. যখন হজ পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন সাহাবীগণকে এব্যাপারে অবহিত করলেন। সংবাদ পেয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। অন্যান্য শহর-নগর-গ্রামাঞ্চল থেকেও মানুষ মদীনা মুনাওয়ারায় এসে সমবেত হলো। মুসলমানগণ কেউ কেউ মদীনা শরীফে পৌঁছে গেলো। আবার কেউ কেউ একত্রিত হলো মক্কা শরীফের পথে। লোক সমাগম এতো বেশী হলো যে, তা বর্ণনার বাইরে। অগ্রে-পশ্চাতে-দক্ষিণে-বামে সবদিকেই কেবল মানুষ আর মানুষ। তাদের মধ্যে কতোজন পদব্রজী, আর কতোজন বাহনারোহী, তা নিরূপণ করা সম্ভব ছিলো না। এক বর্ণনায় এসেছে, হজযাত্রীদের সংখ্যা ছিলো একলক্ষ চব্বিশ হাজার। রসুল স. মুযদালিফা থেকে ইহরাম বেঁধে সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে মক্কা শরীফে পৌঁছলেন এবং হজ আদায় করলেন। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আরাফার রাতে তাঁর উম্মতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। প্রত্যুত্তর এসেছিলো— ক্ষমা করে দিলাম। তবে যারা জালেম তাদেরকে নয়। তাদেরকে আমি মজলুমদের সঙ্গে পাকড়াও করবো। রসুল স. নিবেদন করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি সর্বক্ষমতার অধিকারী। তুমি তো ইচ্ছে করলে মজলুমদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জালেমদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারো। তাঁর এমতো প্রার্থনার প্রত্যুত্তর আর আসেনি।

মুযদালিফায় যখন প্রভাত হলো, তখন তিনি স. উক্ত প্রার্থনা পুনরায় উপস্থাপন করলেন। জবাব এলো 'তুমি যা চাও, তাই হবে'। তিনি স. তখন মৃদু হেসেছিলেন। তাই দেখে হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর নিবেদন করলেন,

ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সর্বদাই হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। আপনি কি হাসছেন কোনো বিশেষ কারণে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলিস যখন জানতে পারলো, আমার দোয়া কবুল করা হয়েছে, আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তখন সে তার মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে বিলাপ করতে করতে এখান থেকে পলায়ন করলো। তার এহেন দুর্গতি দেখে আমার হাসি পেলো। বিদ্বানগণ বলেন, এখানে উম্মত বলে বলা হয়েছে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত সকল উম্মতের কথা। এই বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলে থাকেন, হজ দ্বারা হক্কুল ইবাদেরও কাফফারা (বান্দার অধিকারক্ষুণ্ণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়। তিবরানী বলেন, হাদিসে উল্লেখিত 'জালেম' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল জালেমকে, যারা তওবা করে হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। বায়হাকীও উক্ত বর্ণনার অনুকূলে আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। যদি তা বিশুদ্ধ হয়, তবে বিষয়টি প্রামাণ্য হবে। অন্যথায় এমর্মে আল্লাহ্‌তায়ালার এহেন বাণীই যথেষ্ট 'শিরক ব্যতীত সব গোনাহই আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন'। জুলুম শিরিকের নিম্ন পর্যায়ের গোনাহ। এখন কথা হচ্ছে হক্কুল্লাহ্ তো আল্লাহ্‌তায়ালা মাফ করবেন হজের মাধ্যমে। তবে হক্কুল ইবাদ মাফ করবেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। তার পরও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত। আর হাদিসে এর প্রকাশ্য দিকটি সাধারণভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তিরমিজি শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— যে ব্যক্তি হজ করলো গোনাহ্ এবং পাপাচার না করা অবস্থায়, সে গোনাহ্ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ওই দিনের মতো, যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিলো। বলা হয়েছে, এ অবস্থা হক্কুল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। হক্কুল ইবাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর একথাও বলা হয়েছে যে, হক্কুল্লাহ্‌র (আল্লাহর হকের) সাথে সম্পৃক্ত কথাটির মানে হচ্ছে, বান্দার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু খাস্ হক্কুল্লাহ্ মাফ হয় না। যেমন নামাজ বা কাফফারা। যেহেতু এসব খাস হক্কুল্লাহ্, তাই তা রহিত হওয়ার নয়। এগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার হকের সাথে সম্পৃক্ত, গোনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। গোনাহ হচ্ছে নামাজ যথাসময়ের পরে বিলম্বে আদায় করা। আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্ধারিত সময়ের বিরোধী কাজ করা। এ জাতীয় গোনাহ হজ দ্বারা মাফ হবে। সুতরাং জানা গেলো যে, হজের মাধ্যমে বিরোধিতার গোনার মাফ হবে। কিন্তু হক সংক্রান্ত গোনাহ মাফ হবে না। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, কেউ যদি এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, হজ এমন গোনাহসমূহ বাতিল করে দিতে পারে, যা বান্দার উপর ওয়াজিব ছিল, যেমন নামাজ ইত্যাদি, তাহলে তাকে তওবা করতে

হবে। নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর হক্কুল ইবাদ যে হজ দ্বারা মাফ হয়, তা এজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতেও এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। বিষয়টি সূক্ষ্মতাবিবর্জিত নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলে আকরম স. বিদায় হজের সময় নিজ হাতে তেষট্টিটি উট যবেহ করেছিলেন। তেষট্টি সংখ্যাটি হয়েছিলো রসুলে পাক স. এর পবিত্র আয়ুষ্কালের তেষট্টি বৎসর অনুপাতে। আবু দাউদ শরীফে আছে, পাঁচ-ছয়টি করে উট নিজেরাই রসুল স. এর নিকটে এগিয়ে আসতো, যাতে তিনি স. আগে ভাগে তাদেরকে যবেহ করে দেন। প্রত্যেক উট অন্যান্যদের চেয়ে আগে আসার জন্য চেষ্টা করতো। তারা একে অন্যকে ধাক্কা দিয়া সরিয়ে আসার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলো। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. বলেন, রসুল স. প্রায় সাঁইত্রিশটির মত সাহাবীগণের উট যবেহ করেছিলেন, যার মধ্যে তিনটি উট ছিলো তাঁর নিজের। উটগুলো নিজে বা অন্যদের দ্বারা হজে কোরবানী করার নিয়তে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। মুসলিম শরীফে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর পত্নীগণের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করেছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করেছিলেন। তার পর ডেকেছিলেন মস্তক মুণ্ডনকারীকে। তাঁর নাম ছিল মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ্। তিনি তাঁকে ডানপাশ থেকে মুণ্ডনকার্য শুরু করার জন্য ইশারা করলেন। মুণ্ডনকারী নির্দেশ পালন করলেন। কর্তিত কেশরাশি তিনি স. সাহাবীগণের কারো কারো মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ভাগে দু'একখানা করে পেলেন। এরপর বাম দিকের কর্তিত কেশ দিলেন হজরত আবু তালহা আনসারী রা.কে। তারপর কর্তন করলেন নখ। তা-ও সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তাঁর সঙ্গের অধিকাংশ সাহাবীই তখন মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। অল্প কয়েকজন কর্তন করেছিলেন চুল। তারপর রসুল স. দোয়া করেছিলেন এই বলে— হে আল্লাহ্! মস্তকমুণ্ডনকারীদেরকে তুমি রহম করো এবং শেষ দোয়ায় সংযোজন করেছিলেন— এবং রহম করো কর্তনকারীদেরকে। রসুলে আকরম স. যখন যমযম কূপের তীরে উপস্থিত হলেন, তখন হজরত আব্বাস রা. এবং তাঁর সন্তানগণ পানি তুললেন। তিনি স. বললেন, তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের আওলাদ! তোমরাই পানি ওঠাও, কেননা এটা খুবই নেক আমল। লোকেরা তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে— এ আশংকা না থাকলে আমি নিজেই যমযম কূপ থেকে পানি ওঠাতাম, আর হাজীগণকে পানি পান করানোর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সহযোগিতা করতাম। কেননা পানি পান করানোর মধ্যে বরকত, ফযীলত এবং মর্যাদা রয়েছে। একথার অর্থ— আমি যদি স্বহস্তে পানি উত্তোলন করি, তাহলে তা সুন্নতে পরিণত হয়ে যাবে। আর লোকেরা এ সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য সবাই এগিয়ে আসবে। তখন তাদেরকে সামলানো তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে

যাবে। তোমরা হবে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা এক ডোল পানি তুলে রসুল স. এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি স. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা পান করলেন। তাঁর এমতো দাঁড়িয়ে পানি পান করার কারণ হতে পারে কয়েকটি। হয়তো তিনি স. কর্মটি জায়েয বুঝানোর জন্য এরূপ করেছিলেন, অথবা করেছিলেন কোনো প্রয়োজনের তাগিদে। কিংবা ভিড়ের কারণে। বসার সুযোগ পাচ্ছিলেন না বলে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। কেউ কেউ বলেছেন, দাঁড়িয়ে পানি পান করা যমযমের পানি এবং ওযুর পরের অবশিষ্ট পানির জন্য বিশেষ আদব।

যমযম কূপের নামকরণের কারণ এই যে, এ কূপের পানি অফুরন্ত। যমযম বা যাযম বলা হয় অধিক পানিকে। কেউ কেউ বলেছেন, নামটি অন্য কোনো শব্দ থেকে উৎপন্ন নয়। প্রথম থেকেই এ কূপের নাম ছিল যমযম। সর্বপ্রথম যমযম কূপ আবিষ্কার করেন হজরত জিবরাইল আ.। যখন শিশু নবী হজরত ইসমাঈল আ. পিপাসার্ত হয়ে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে তাঁর পা দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তখন ওই স্থানে একটি ঝর্ণা আবিষ্কৃত হয়েছিলো। মশক ভর্তি করার জন্য তার চতুর্দিকে বাঁধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো, যাতে প্রবাহিত হয়ে পানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে না যায়। চতুর্দিকে যদি বাঁধ তৈরী করা না হতো, তবে তার পানি প্রবাহিত হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে যেতো। হাদিস শরীফে এরূপ বর্ণনা রয়েছে। তারপর হজরত ইব্রাহীম আ. সেখানে কূপ তৈয়ার করেন। জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কায় বসতি স্থাপনের পর কূপটিকে ভরাট করে ফেলেছিলো। পরে তার কোনো চিহ্নও আর অবশিষ্ট ছিলো না। পরবর্তীতে রসুল স. এর পিতামহ হজরত আব্দুল মুত্তালিবকে আল্লাহ্তায়ালা মর্যাদা দান করলেন। তিনি আমুল ফীল বা হস্তী বৎসরে স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন তিনি কূপটি খনন করছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি কূপটি খনন করেছিলেন হস্তী বৎসরের পূর্বে। তারপর আবু তালিব তার সংস্কার করেছিলেন। তখন তিনি স. স্বয়ং তার মধ্যে পাথর সংযোজন করেছিলেন। 'তারিখে মক্কা' (মক্কার ইতিহাস) গ্রন্থে তার আলোচনা আছে।

জেনে রাখা উচিত যে, যবেহতে সওয়াব রয়েছে এবং যা ইবাদত, তা তিন প্রকারের— ১. হুদী অর্থাৎ হজের কোরবানী। যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে পশু সঙ্গে নিয়ে হেরেমে আসা অথবা কারো মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়ে পরে তাকে যবেহ্ করা। ২. ঈদুল আযহার কোরবানী। ৩. আকীকার যবেহ্— নবজাত সন্তানের জন্য আকীকাস্বরূপ যে যবেহ্ করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মশহুর মাজহাব অনুসারে আকীকা সুন্নত। অবশ্য তাঁদের অন্য এক বর্ণনানুসারে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার মতে সুন্নত। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেছেন, আমার কাছে এরকম বর্ণনা এসেছে যে, আকীকা জাহেলী যুগের একটি রীতি, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে

মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে কোরবানীর যবেহের মাধ্যমে অন্যান্য যবেহের বিধানকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, যেমন রমজানের রোজার মাধ্যমে রহিত করে দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী সমস্ত রোজার বিধানকে। জানাবাতের গোসল দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত গোসলের বিধানকে; জাকাতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত সদকার বিধানকে।

মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈর গ্রন্থে হজরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জিলহজ মাসে কোরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে তার উচিত হবে কোরবানী সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শরীরের পশম এবং নখ ইত্যাদি কর্তন না করা। কোনো কোনো মাজহাবের ইমাম এবং ইমাম আহমদের মাজহাব এরকম— এ নিষেধাজ্ঞাটি আরোপিত হয়েছে হারাম হিসেবে। আবার কোনো কোনো ইমামের মতে উক্ত নিষেধাজ্ঞা মাকরুহ। হারাম নয়। 'জামেউল উসুল' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিম ইবনে লাইছী বলেছেন, একবার ঈদুল আজহার কাছাকাছি সময়ে আমি হাম্মামখানায় প্রবেশ করলাম। উদ্দেশ্য ছিলো নাভির নিম্নাংশের পশম পরিষ্কার করবো। তখন কেউ কেউ আমাকে বললেন, তোমাদেরকে তো এ কাজ করতে বারণ করা হয়েছে। তারপর আমি যখন হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের কাছে গিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা তুললাম, তখন তিনি বললেন, ভাতিজা! এ এমন এক হাদিস, যা মানুষ ভুলে গিয়েছে এবং তার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণী, আমাদের মাতা মহোদয়া হজরত উম্মে সালমা আমাকে বলেছিলেন, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, তোমরা জিলহজ মাস পেলে .... বাকী অংশ উপরে বর্ণিত হাদিসের ন্যায়। হজরত উম্মে সালমার উপরোক্ত বিবৃতি থেকে যা কিছু বুঝা গেলো, তা হচ্ছে— ওই সময় নখ ও শরীরের চুল কর্তন করা যাবে না। তবে কথাটির অর্থ এই নয় যে, ইহরামকারীদের জন্য তা যেমন হারাম, কোরবানীকারীদের জন্য ওইরূপ হারাম। 'সফরুস সায়াদাত' পুস্তকের লেখক যেরকম বলেছেন, চুল, পশম ও নখ ইত্যাদি কোনো কিছুই তখন কর্তন করা যাবে না। ধারণ করতে হবে ইহরামকারীদের মতো এক স্বতন্ত্র রূপ। বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ প্রকার ইবাদত ঃ জিকির-আজকার, দোয়া, ইস্তেগফার ও ক্বেরাত

মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলে করীম স. হক তায়ালার জিকির করতেন সব সময়, প্রতি মুহূর্তে। এটা ছিলো তাঁর সার্বক্ষণিক আমল। কোনোকিছুই তাঁকে জিকিরে ইলাহী থেকে বিরত রাখতে পারতো না। তাঁর প্রতিটি কথাই হতো আল্লাহ্তায়ালার স্মরণসম্পৃক্ত। তাঁর হামদ, ছানা, তাঁর তাওহীদ তামজিদ, তাকদীস, তাহলীল, তকবীর ইত্যাদি, আল্লাহ্তায়ালার নাম, সিফাত,

তাঁর ওয়াদা ওয়ায়ীফ, আদেশ-নিষেধ, শরিয়তের আহকামের শিক্ষা, বেহেশত দোজখের আলোচনা, উৎসাহপ্রদান, ভীতিপ্রদর্শন— সবকিছুই ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স. যখন নীরব থাকতেন, তখনও তাঁর পবিত্র কলবের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণই বিরাজ করতো। তিনি স. প্রতিটি নিঃশ্বাসে কলব ও জিহ্বা দিয়ে জিকির করতেন। ওঠা বসা, দণ্ডায়মান অবস্থা, শায়িত অবস্থা, হাঁটা চলা, খানা-পিনা, ঘ্রাণ গ্রহণ করা, আসা-যাওয়া, সফরে বা মুকিম অবস্থায় থাকা, পদব্রজ অবস্থা, আরোহী অবস্থা— মোট কথা কোনো অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির থেকে পৃথক হতেন না। জিকিরের অর্থ স্মরণ করা, যার বিপরীত শব্দ বিস্মৃতি। আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখার যে কোনো সুরত হোক— চাই তা কলব দ্বারা হোক, অথবা হোক জিহ্বা দ্বারা, প্রত্যেক অবস্থাতেই তা জিকির হিসেবে গণ্য হবে। জিহ্বা যদি কলবের অনুগামী হয়, তবে তা হবে উত্তম এবং এর পুণ্য হবে সর্বাধিক । কোনো কোনো ফেকাহশাস্ত্রবিদ বলেছেন, জিহ্বা দ্বারা জিকির না করলে তা জিকির হবে না। তাদের একথার অর্থ— ওই সকল জিকির, যা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা শরিয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে— যেমন, তসবীহ্ তাহলীল এবং নামাজের মধ্যে যা পাঠ করতে হয়। তাছাড়া ওই সকল দোয়া ও জিকির, যা নামাজের পর পাঠ করার কথা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অভিধানগ্রন্থে জিকিরের বিপরীত শব্দ বিস্মৃতি। তার মানে আল্লাহ্‌তায়ালাকে বিস্মৃত না হওয়াই আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির। সুতরাং কলবী জিকিরও জিকিরের অন্তর্গত। তাই কলবের কাজের উপর সওয়াব আরোপিত হয় না এবং তা ধর্তব্য নয়— কথাটি একদম বাতিল।

দিন-রাত্রির বিভিন্ন কাজকর্মে তাহাজ্জুদের সময় থেকে নিয়ে নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্যন্ত, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মুহূর্তে, বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন প্রকারে দোয়া পাঠ করতেন রসুলপাক স.। ওই দোয়াগুলিও জিকির-আজকার। হাদিস শরীফের বিভিন্ন কিতাবে দোয়াগুলির উল্লেখ রয়েছে। দোয়া মাসুরাসমূহ, যা যাবতীয় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনসাপেক্ষে পাঠ করতে হয়, তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দোয়া করার ফযীলত সম্পর্কে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীই যথেষ্ট। যেমনঃ

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো' যেমন 'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো'। রসুলেপাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সওয়াল করে না, আল্লাহ্‌তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। দোয়ার মধ্যে একাগ্রতা ও খুলুসিয়াত থাকতে হবে। সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দোয়ার

মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও শুকুর থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্তায়ালার পরিপূর্ণতার স্বীকৃতি মৌখিক ও আত্মিকভাবে থাকা জরুরী। তওহীদ, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি আগ্রহ, গোপন সংলাপ, বিনয়, অসহায়ত্ব, সাহায্যপ্রার্থনা, আশ্রয়প্রার্থনা— এগুলো হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু এবং দোয়া তার মগজতুল্য। তাই হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ। ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী বলেছেন, মানুষের মধ্যে এব্যাপারে মতভেদ আছে যে, দোয়া করা উত্তম, নাকি উত্তম চুপ থাকা ও রাজী থাকা? কারও কারও ধারণা, দোয়া করাই উত্তম। কেননা দোয়া স্বয়ং একটি ইবাদত। সুতরাং ইবাদত করা যে না করা থেকে উত্তম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দোয়া করা যে উত্তম, তার স্বপক্ষে আরেকটি যুক্তি এ-ও হতে পারে যে, দোয়া কবুল করা না করার সম্পূর্ণ অধিকার আল্লাহ্তায়ালার। দোয়া দ্বারা বান্দার মনের চাহিদা পূরণের কোনো আলামত যদি না-ও দেখা যায়, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা বান্দার জন্য আল্লাহ্তায়ালার যা হক ছিলো আল্লাহ্তায়ালা তা পূরণ করে নিয়েছেন। দোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্তায়ালার কাছে পেশ করা। আর তাতো বান্দার দোয়া করার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। বান্দা যেহেতু তার কর্তব্য সম্পন্ন করে নেয়, তাই তার উদ্দেশ্যও সফল হয়ে যায়। আবু হাকেম আরাজী বলেছেন, আমি মনে করি দোয়া কবুল না হওয়া থেকে দোয়া না করা অধিক মন্দ। আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেছেন, আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করি এবং তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী থাকি। আর যখন দোয়া সমাপ্ত করি, তখন মনে এমতো দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় আমার দোয়া কবুল করেছেন। কারও কারও ধারণা এ রকম— দোয়া দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালা এবং তকদীর থেকে মাহরুম হওয়ার চাইতে তাঁর ফয়সালার প্রতি রাজী থাকা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করাই উত্তম। তাই দোয়া না করে চুপ থাকাই শ্রেয়। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কারও কারও হাল এরকম— আল্লাহ্তায়ালার দরবারের আদবের প্রতি তাঁরা এতো খেয়াল রাখেন যে, সওয়াল করার উদ্দেশ্যে দোয়া করার জন্য মুখ খুলতেও তাঁরা নারাজ। তাঁরা সবসময় জিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকাতেই স্বস্তি পান এবং সর্বদা এতেই নিমজ্জিত থাকেন। যা কিছুই আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে প্রকাশ পাক না কেনো, তাতেই তাঁরা রাজী থাকেন। তারা ওই হাদিসের প্রতি লক্ষ্য রাখেন যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন 'যে আমার জিকিরে মশগুল থাকার কারণে আমার কাছে সওয়াল করা থেকে বিরত থাকে, আমি তাকে সওয়ালকারীদের মতই দান করে থাকি'। কারও কারও ধারণা রসনাকে প্রার্থনা উচ্চারণে নিয়োজিত রাখতে হবে, কিন্তু হৃদয়কে রাখতে হবে রেজা'র (পরিতুষ্টির) মাকামে, যাতে উভয়

সৌন্দর্যই দোয়ার মধ্যে সমন্বিত হতে পারে। এই হালের বিশুদ্ধতার আলামত হচ্ছে, দোয়া করবে আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে তাঁর কাছে অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশার্থে ইবাদতের অংশ হিসেবে— কামনা-বাসনা-পূরণার্থে নয়। আর দোয়া কবুল হওয়ায় বিলম্ব ঘটলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না এবং মহান আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোনোরূপ অপবাদ আরোপ করবে না। কেননা কবুল হওয়া না হওয়া উভয়টিই তাঁর কাছে সমান। ইমাম কুশাইরী বলেছেন, কোনো কোনো অবস্থায় চুপ থাকার চেয়ে দোয়া করাই উত্তম; আবার কোনো কোনো অবস্থায় উত্তম দোয়া না করা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে চুপ থাকাই আদব। কখন দোয়া করা উত্তম, আর কখন চুপ থাকা উত্তম, তা সময়ই তার মনকে বলে দিবে। মন যদি দোয়া করার দিকে ঝুঁকে যায়, তবে দোয়া করাই উত্তম। আর মন যদি চুপ থাকতে চায় তাহলে উত্তম চুপ থাকা। তবে মনের ভাবের উপর যদি জ্ঞান প্রবলতর হয়, তাহলে দোয়া করা উত্তম। কেননা দোয়া হচ্ছে ইবাদত। আর একটি কথা— মারেফত ও হাল যদি প্রবল হয় তবে চুপ থাকা উত্তম। তাছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হক বলবৎ রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে দোয়া করা উত্তমতর। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে নফসের লয্যত ও খাহেশ জড়িত থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে চুপ থাকাই উত্তম। বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) বলেন, দোয়া কখনও মৌখিক ভাষায় হয়ে থাকে, যেমন কেউ তার কোনো উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে আল্লাহ্তায়ালার কাছে প্রার্থনা জানালো। কখনও অবস্থার ভাষাতেও দোয়া হতে পারে। অর্থাৎ বান্দার অবস্থাই তার মনের ভাবপ্রকাশক হয়ে দোয়ায় পরিণত হতে পারে। কখনও আল্লাহ্তায়ালার গুণকীর্তন প্রকাশের মাধ্যমেও বান্দার মনের ভাব আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোয়ায় পরিণত হয়ে যায়। দোয়া করার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম— কথাটির তাৎপর্য এই যে, চুপ থাকার মধ্যে পাওয়া যায় পরিশুদ্ধতা এবং পরিতুষ্টি। কোনো কোনো আরেফ দোয়া করেছেন প্রশস্তির ভাষায়। আর এ প্রকারের দোয়া ভাষানির্ভর দোয়ার চেয়েও অধিক কার্যকর।

রসুলেপাক স. দোয়া করার আদব ও শর্তসমূহের বিবরণ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদব হচ্ছে— হালাল উপার্জন, সত্য বচন। কাকুতি মিনতি সহকারে নিবেদন জানানো, কবুল হওয়ার জন্য চঞ্চল না হওয়া, আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি প্রকাশের পর দোয়া শুরু করা, নবী করীম স. এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ, তাঁর বংশধর, এবং সহচরবৃন্দের প্রতি সালাম প্রেরণ— এগুলোও দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত। আর দোয়ার আদব হচ্ছে— দু'হাত উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে নিজের মুখমণ্ডলের দিকে রাখা। এক বর্ণনায় এসেছে, হাত ওঠাতে হবে কাঁধ বরাবর। আর সে সময় দু'হাত রাখতে হবে পৃথক পৃথক করে। হস্তদ্বয় খোলা রাখতে হবে আঁজলা ভরে পানি পান করার মতো করে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. যখন দোয়া করতেন, তখন দু'হাত একত্রে মিলিত করে হাতের পেটের দিক রাখতেন মুখমণ্ডলের দিকে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. আপন হস্তদ্বয় এতো উঁচু করতেন যে, বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। এস্তেস্কার (বৃষ্টিপ্রার্থনার) সময় তিনি এরূপ করতেন। বিদ্বানগণ বলেন, মোনাজাতের বিষয় যতো কঠিন হতো, তাঁর হাতও ততো উপরে উঠতো। শেষে হাত নিজের চেহারায় বুলিয়ে নেওয়াও দোয়ার অন্যতম আদব। রসুলেপাক স. কোনো দলের জন্য যখন দোয়া করতেন, তখন দলের সকলের জন্যই তা কবুল হয়ে যেতো। তাঁর সকল দোয়ার অবস্থাই ছিলো এরকম। বোখারী শরীফে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই ছিলো একটি করে গৃহীত দোয়া। আমি চাই আমার জন্য ধার্যকৃত দোয়া আমার উম্মতের শাফায়াত হিসেবে আখেরাতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি। প্রকাশ্য অর্থের দিক দিয়ে হাদিসখানি বিসদৃশ। কেননা রসুল করীম স. এবং অন্যান্য সকল নবীর গৃহীত দোয়া ছিলো অনেক। অথচ বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের গৃহীত দোয়া ছিলো একটি করে। এমতো সমস্যার সমাধানার্থে আলেমগণ বলেন, গৃহীত দোয়ার অর্থ এমন দোয়া, যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস থাকে। তাছাড়া সকল দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া যায়। কিন্তু কবুল হবেই, এমন নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাঁদের কেউ কেউ আবার জবাব দিয়েছেন এভাবে— নবীগণের সকল দোয়াই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তন্মধ্যে উত্তমতম দোয়া হচ্ছে একটি। কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য থাকে একটি সাধারণার্থক দোয়া, যা কবুল করা হয় তাঁদের উম্মতের বিষয়ে, সে দোয়া হতে পারে উম্মতের ধ্বংসের ব্যাপারে, অথবা তাদের পরিত্রাণের জন্য। বিশেষ দোয়াগুলোর মধ্যে থেকে কিছু কিছু এমন দোয়া রয়েছে, যা কবুল করা হয় না, আবার কিছু কিছু করা হয় কবুল। অথবা কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে যে, প্রত্যেক নবীর জন্য একটি এমন দোয়া ছিলো, যা তাঁরা করে গিয়েছেন কেবল তাঁদের উম্মতের জন্য। যেমন হজরত নূহ আ. দোয়া করেছিলেন 'হে আমার প্রভুপালক! তুমি পৃথিবীর কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে রেহাই দিয়ো না'। কিংবা কথিত দোয়ার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, ওই দোয়া নবীগণ করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব ব্যাপারে। যেমন হজরত জাকারিয়া আ. প্রার্থনা জানিয়েছিলেন 'আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে এমন ওলী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে' অথবা হজরত সুলায়মান আ. যেমন দোয়া করেছিলেন 'হে আমার প্রভুপালক! আমাকে এমন রাজত্ব দান করো, যা পরবর্তী কারও জন্য যেনো না হয়'। আল্লামা কেরমানী তাঁর শরহে বোখারী গ্রন্থে এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কোনো নবীর দোয়া কবুল না হওয়া কি জায়েয? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনিই আবার বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই অন্তত একটি দোয়া কবুল হয়ে

থাকে। অবশিষ্টগুলো কবুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার-অনিচ্ছার উপর। আল্লামা আইনী হানাফী বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, এ ধরনের প্রশ্ন করা সমীচীন বলে মনে হয় না। কেননা এতে নিহিত থাকে এক ধরনের মন্দ ধারণা। আমরা তো আম্বিয়া কেরামের সকল দোয়া গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। সুতরাং বুঝতে হবে 'প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে মকবুল দোয়া আছে' এ কথার দ্বারা কোনো সীমাবদ্ধতাকে বুঝানো হয়নি। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে রসুল পাক স. কোনো দোয়া করেছেন, আর তা কবুল করা হয়নি— এরকম ধারণা থেকে তাঁর মহিমা অনেক উন্নত। তিনি দোয়া করেছেন অথচ তা কবুল হয়নি— এরূপ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে যে দোয়ায় এর ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে কোনো না কোনো রহস্য। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি উম্মতের জন্য তিনটি দোয়া করেছি— ১. আমার উম্মতকে যেনো মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত না করা হয়, ২. দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেনো তাদেরকে না করা হয় ধ্বংস ৩. তাদের মধ্যে যেনো রক্তারক্তি না হয়। প্রথম দু'টি দোয়া কবুল হয়েছে, কিন্তু তৃতীয়টির ব্যাপারে এসেছে নিষেধাজ্ঞা। এখানে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হতে পারে এরকম— আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এরকম দোয়া যেনো আর না করেন। অতএব কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, তিনি স. আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে দোয়া করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুল স. তাঁর খাস খাদেম হজরত আনাসের জন্য দোয়া করেছিলেন তখন, যখন তাঁর মাতা হজরত উম্মে সুলায়ম তাঁকে নিয়ে তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনার সেবক আনাসের জন্য দোয়া করুন। রসুল স. যখন হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় এলেন, তখন হজরত আনাসের বয়স ছিলো আট অথবা নয় বৎসর। দশ বৎসর পর্যন্ত তিনি তাঁর খেদমত করেছিলেন। তিনি স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি এর সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করো। হায়াত দীর্ঘ করে দাও এবং একে ক্ষমা করো। এক বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। ওই দোয়ার বরকতে তাঁর বয়স একশ বৎসরের অধিক হয়েছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত তিন অথবা একশত সাত বৎসর। আর এক বিবরণে এসেছে, নিরানব্বই বৎসর। তাঁর খেজুরের বাগানে বৎসরে দু'বার ফল আসতো। ইমাম তিরমিজী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাসের একটি বাগান ছিলো, যাতে বৎসরে দু'বার ফল আসতো এবং সে ফলের মধ্যে এমন ঘ্রাণ থাকতো যে, মেশকের সুঘ্রাণকেও তা হার মানায়। হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। আবার হজরত আনাসের সন্তানাদি, নাতি, প্রনাতিগণ— সকলেরই বয়স একশ

বৎসর অতিক্রম করেছিলো। হজরত আনাস রা. এ সম্পর্কে নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমার কন্যাদের মধ্যে উমায়না ছিলো সর্বকনিষ্ঠা। সে আমার আওলাদ ফরজন্দদের মধ্যে একশত দু'জনের কাফন-দাফন দেখেছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে একশ' বিশজনের কথা। তিনি বলতেন, আমি রসুল স. এর তিনটি দোয়া পেয়েছি। অর্থাৎ পেয়েছি অধিক সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি ও দীর্ঘ আয়ুষ্কাল। চতুর্থ দোয়াটিও আশা করি পাবো। আর তা হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ।

রসুল স. হজরত মালেক ইবনে রবীয়া সলুলীর জন্যও দোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, যেনো তাঁর আওলাদদের মধ্যেও বরকত দেওয়া হয়। সত্তর পুত্রের জনক হয়েছিলেন তিনি। ইবনে আসাকের হাদিসটির বর্ণনাকারী। একবার তিনি স. তাঁর জনৈক সাহাবীকে হজরত আলীর খবরাখবর নিতে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, তাঁর চক্ষু উঠেছে। রসুল স. তাঁর মুখের পবিত্র লালা তার চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন হজরত আলী। তিনি স. তখন তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন 'হে আল্লাহ্! তাঁর শরীর থেকে শীত ও গরম দূর করে দাও'। তারপর থেকে তিনি কখনো শীত ও গরম অনুভব করতেন না। একবার রসুল স. হজরত আলীকে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করলেন। তিনি নিবেদন করলেন, আমি তো বিচারকার্য সম্পর্কে কিছু জানি না। মামলার নিষ্পত্তি করবো কীভাবে? তখন তিনি স. তাঁর হাত রাখলেন তাঁর বুকের উপর। দোয়া করলেন 'হে আল্লাহ্'! তুমি এর অন্তরকে শুভবোধ দান কোরো এবং এর রসনাকে রেখো সংযত। হজরত আলী রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালার শপথ! এরপর থেকে বাদী-বিবাদীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার বেলায় আমার মনে কখনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি। আবু দাউদ।

একবার হজরত আলী রা. পীড়িত হলেন। তিনি স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন এভাবে— হে আল্লাহ্! তুমি একে আরোগ্য দান করো। হে আল্লাহ্! তুমি একে মাফ করে দাও। এভাবে দোয়া করার পর তিনি স. তাঁকে বললেন, উঠে দাঁড়াও। হজরত আলী রা. বলেছেন, তারপর থেকে আমি আর পীড়িত হইনি।

রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আবু তালেব একবার রোগাক্রান্ত হলেন। বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার প্রভুপালক সকাশে আমার জন্য দোয়া করো, যাতে আমি সুস্থ হয়ে যাই। তিনি স. দোয়া করলেন— হে আল্লাহ্! আমার প্রিয় খুল্লতাতকে নিরাময় করো। সঙ্গে সঙ্গে আবু তালেব সুস্থ ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হলো কেউ যেনো হঠাৎ তাঁর পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। আবু তালিব বললেন, প্রিয় বৎস! তুমি যে প্রভুপালকের উপাসনা করো, তিনি তোমাকে প্রচুর দান করেন। তুমি যা চাও, তিনি তোমাকে তাই দেন। রসুল স. বললেন, হে খুল্লতাত! আপনি যদি তাঁর ইবাদত করেন, তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি মানেন, তবে আপনিও যা চাইবেন, তিনি আপনাকে তাই দিবেন।

রসূলেপাক স. হজরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করেছিলেন এভাবে— হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করো। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং দান করো তাফসীরের এলেম। বায়হাকী, আবু নাঈম। বোখারী শরীফে আছে 'হে আল্লাহ্! তুমি তাকে কিতাবের (কোরআনের) এলেম দান করো'। বলাবাহুল্য, ওই দোয়ার বরকতেই হজরত ইবনে আব্বাস হয়েছিলেন খয়রুল উম্মা, বাহরুল এলেম, রুঈসুল মুফাস্‌সিরীন, তরজুমানুল কোরআন ইত্যাদি উপাধিধারী।

রসুলে আকরম স. হজরত নাবেগাজা'দী রা. এর দাঁত দেখতে খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন— হে আল্লাহ্! তুমি তাঁর দাঁতের হেফাজত করো। উক্ত সাহাবীর বয়স একশ' বৎসর অতিক্রম করেছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত বৎসরের কিছু বেশী। কিন্তু তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। অন্য সকলের চেয়ে তাঁর দাঁত ছিলো অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন তাঁর কোনো একটি দাঁত পড়ে যেতো, তখন সেখানে আরেকটি দাঁত গজাতো।

একবার হজরত আমর ইবনে আখতাব রা, রসুলেপাক স.কে পানি পান করাবার সময় দেখলেন পানিতে পড়ে আছে একটি চুল। তৎক্ষণাৎ তিনি চুলটি বের করে ফেলে দিলেন। তখন রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন এই বলে— হে আল্লাহ! একে তুমি সুন্দর করে দাও। হজরত আমর ইবনে আখতাবের নিরানব্বই বৎসর বয়স হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর একটিও চুল ও দাড়ি শাদা হয়নি। ইমাম বায়হাকী হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুলেপাক স. এর দাড়ি মুবারক থেকে কুটা জাতীয় কিছু একটা সরিয়ে দিয়েছিলো। রসুল স. বলেছিলেন হে আল্লাহ! তাকে সৌন্দর্য দান করো। এমতো দোয়ার ফলে লোকটির শাদা দাড়ি কালো হয়ে গিয়েছিলো। অন্য এক ইহুদী তাঁর উষ্ট্রী দোহন করে দিয়েছিলো। তিনি স. বলেছিলেন— হে আল্লাহ্! তাকে সৌন্দর্য দান করো। তাতে তারও শাদা চুল কালো হয়ে গিয়েছিলো। লোকটি নিরানব্বই বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলো, কিন্তু বৃদ্ধ হয়নি। এসকল বিবরণ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, কাফেরেরাও তাঁর বরকত ও নেয়ামতের দস্তরখান থেকে বঞ্চিত হয়নি। কাফেরদের হাল যদি এরকম হয়, তবে মুসলমানদের হাল কীরূপ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এ থেকে আরেকটি বিষয়ও প্রতীয়মান হয় যে, বুযুর্গগণের খেদমত এবং সন্তুষ্টি সাধনের মধ্যে থাকে এক প্রকার বিশেষ প্রভাব। কাফেরেরাও তাঁদের সান্নিধ্যের খায়ের বরকত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অর্থাৎ আখেরাতের খায়ের ও বরকত থেকে তারা বঞ্চিত হলেও দুনিয়াতে তারা বঞ্চিত হয় না।

এক ব্যক্তির জন্য রসুল স. দোয়া করেছিলেন এভাবে— হে আল্লাহ্! তুমি এর যৌবন ফিরিয়ে দাও। তার আশি বৎসর বয়স হয়েছিলো, কিন্তু তার একটি চুলও শাদা হয়নি। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ফাতেমাতুজ্ জোহরা রা.

রসুলপাক স. এর দরবারে এলেন। ক্ষুধার তাড়নায় তখন তাঁর চেহারা হয়ে গিয়েছিলো ফ্যাকাশে। রসুল স. তাঁর চেহারা দেখে মর্মাহত হলেন। বক্ষদেশে হাত রেখে বললেন— হে আমার আল্লাহ্! ফাতেমার ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে দাও। তাকে পরিতৃপ্ত করো। হে আল্লাহ্! তাকে আর অনাহারক্লিষ্ট রেখো না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারা হয়ে গেলো রক্তিমাভ। সাইয়্যেদা ফাতেমা জোহরা রা. বলেন, তার পর থেকে আমি আর কখনও ক্ষুধার্ত থাকিনি। ইবনে ইয়াকুব ইসফিরায়িনী তাঁর 'দালায়েলুল আ'জাম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলেপাক স. হজরত ওরওয়া ইবনে আবুল জাআদ বারেকীর জন্য দোয়া করেছিলেন এভাবে— হে আল্লাহ্! এর ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করো। এরপর থেকে তিনি যে পণ্যই ক্রয় করতেন, তার মধ্যে মুনাফা হতো প্রচুর। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের জন্য দোয়া করেছিলেন তাঁর সম্পদে বরকত হওয়ার জন্য। তিনি পরে হয়েছিলেন প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি কোনো প্রস্তরখণ্ড কুড়িয়ে নিলেও মনে হতো এর নিচে হয়তো রয়েছে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য।

মিশরবাসীদের জন্য তিনি স. দুর্ভিক্ষের দোয়া করেছিলেন। ফলে মিশরে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো যে, সেখানকার অধিবাসীরা মৃত জন্তুর চামড়া ও গোশত ভক্ষণ করতে শুরু করেছিলো। উতবা ইবনে আবু লাহাবের ব্যাপারে তিনি স. বলেছিলেন— হে আল্লাহ্! তুমি এর উপর তোমার কুকুরবাহিনীর মধ্যের একটি কুকুরকে প্রবল করে দাও। একটি সুবিদিত বিবরণে এসেছে, কোনো এক ব্যক্তি রসুল স. এর সামনে বাম হাতে আহার শুরু করলো। তিনি স. তাকে ডান হাতে আহার করার হুকুম দিলেন। লোকটি বললো, ডান হাতে আমি আহার করতে পারি না। তিনি স. বললেন, পারবেও না। তার পর থেকে লোকটি আর কোনোদিন তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত ওঠাতে পারতো না।

একদিনের ঘটনা। রসুল স. একটি খেজুর গাছ সামনে রেখে নামাজ শুরু করলেন। এক হতভাগা তাঁর এবং খেজুর গাছের মধ্যখান দিয়ে চলে গেলো। তিনি স. বললেন, হে আল্লাহ্! যে আমার নামাজকে ছিন্ন করলো, তুমি ছিন্ন করে দাও তার পা। লোকটি হয়ে গিয়েছিলো চলচ্ছক্তিহীন। আর কখনও সে দাঁড়াতেও পারেনি। একবার তিনি স. ডেকে পাঠালেন হজরত মুয়াবিয়াকে। তিনি আসতে বিলম্ব করলেন। বলে পাঠালেন, তিনি আহার করছেন। রসুল স. একথা শুনে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তার উদরপূর্তি না করুন। ওই ঘটনার পর থেকে হজরত মুয়াবিয়া কখনও পেট পুরে আহার করতে পারতেন না।

এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত হলো বিজ্ঞ বর্ণনাকারীগণের কিছুসংখ্যক বিবরণ। এগুলো হচ্ছে রসুল স. এর মোজেজা নামক সমুদ্রের একবিন্দু মাত্র। এগুলো ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা। দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাঁর অনুসরণকারী আউলিয়া

কেরাম এবং সুন্নাহায়ে উম্মতেরও রয়েছে যথেষ্ট প্রাপ্য। তাঁর অনুসারীগণেরই যদি এরূপ হাল হয়, তাহলে তাঁর অবস্থা যে কীরূপ হবে তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্‌তায়ালা শানুহু তাঁর হাবীবপাক স. এর সকল দোয়া কবুল করেছেন। এতে সন্দেহ মাত্রই নেই।

এবার আসা যাক ইস্তেগফার সম্পর্কিত আলোচনায়। তিনি স. প্রতিটি মুহূর্তেই ইস্তেগফার করতেন। হজরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সত্তর বার আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে ইস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করি। এক বর্ণনায় এসেছে— সত্তর বারের চেয়ে অধিকবার। আবার একশত বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এক বিবরণে। অবশ্য সংখ্যা নির্ধারণ হাদিসগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি রসুলেপাক স. কে কোনো এক মজলিশে দাঁড়ানোর পূর্বে একশবার ইস্তেগফার পড়তে দেখেছি। তিনি স. পড়তেন— 'আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্‌লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আল হাইউল ক্বাইয়ূম ওয়াতূবু ইলাইহি'। এক বর্ণনায় আছে 'আস্‌তাফিরুল্লাহুল্‌ আ'জীম ওয়াতূবু ইলাইহি'। অপর এক বর্ণনায় আছে, হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, আমরা তাঁর ইস্তেগফার গণনা করতাম। এক মজলিশে তিনি স. একশ বার ইস্তেগফার পাঠ করেছিলেন। বলেছিলেন 'রব্বিগফিরলী ওয়াতুব আ'লায়্যা ইন্‌নাকা আন্‌তাত তাওয়াবুল গফুর'। বোখারী শরীফে হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত আছে, রসুল স. বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইসতেগফার হচ্ছে — আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়া আনা আ'লা আ'হ্‌দিকা ওয়া ওয়াআ'দিকা নাস্‌তাত্ব'তু আউ'যুবিকা মিন শার্‌রি মা সনাআ' আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লায়্যা ওয়া আবূউ বিজাম্‌বী ফাগ্‌ফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুজ্‌ জুনূবা ইল্লা আন্‌তা। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় উক্ত দোয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে, সে সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে চলে যাবে জান্নাতে। আর রাতে পড়ে সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলেও সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আলেমগণ বলেছেন, রসুল স. ইস্তেগফার করতেন তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যেনো তাঁর উম্মত সব সময় তওবা ইস্তেগফার করে। তিনি স. তো ছিলেন মাসুম ও মাগফুর (নিষ্পাপ ও ক্ষমাপ্রাপ্ত)। তাই তাঁর ইস্তেগফার এবং তওবা করার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। অথবা তিনি স. ইস্তেগফার করতেন তাঁর উম্মতের গোনাখাতা মাফের জন্য। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন 'ইন্‌নাহু লাইউগানু আলা ক্বালবী ওয়া ইন্‌নী লাআস্‌তাগফিরুল্লাহ্‌' (নিশ্চয়ই আমার অন্তকরণে মলিনতা ছায়া ফ্যালে, তাই আমি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে ইস্তেগফার করি)। 'ইউগানু' শব্দটির

উৎপত্তি হয়েছে 'গাইনুন' থেকে। অধিকাংশের ধারণা এই যে, এর অর্থ— এক প্রকার সূক্ষ্ম পর্দা, যা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে আসে। দ্বীন ও মিল্লাতের ব্যাপারে চিন্তা, ধর্মপ্রচার, শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা— এ সকল কাজ রসুল স.কে করতেই হতো। ফলে তাঁর আত্মিক দর্শনের মধ্যে পতিত হতো এক প্রকারের অন্যমনস্কতা। নূরের বহিঃপ্রকাশে এবং জিকিরের উত্তাপে নেমে আসতো স্তিমিত ভাব। তাই তিনি স. ইস্তেগফার করতেন। 'পুণ্যবানদের পুণ্যকর্ম নৈকট্য-ধারীদের জন্য গোনাহ'— তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা ছিলো এই রীতি অনুসারে।

কেউ কেউ ধারণা করেন, তিনি স. নৈকট্যের স্তরসমূহে ক্রমাগত উন্নত হতে থাকতেন। প্রতিনিয়ত অবস্থান করতেন আল্লাহ্দর্শনের আনুরূপ্যবিহীন অসীমতায়। বিভোর থাকতেন তাঁর মহিমায় ও জ্যোতিচ্ছটায়। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত হতো পূর্ববর্তী মুহূর্ত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, অধিকতর ফয়েজ বরকতসম্পন্ন। তাই তিনি স. ইস্তেগফার করতেন পূর্বের নিম্নতম স্তরের (মাকামের) কথা ভেবে। শ্রদ্ধেয় সুফীগণ 'ইউগানু' এর অর্থ করেছেন— এমন পর্দা, যা নূরের, গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ্ ছাড়া অপরের) নয়। আল্লামা তাইয়্যেবী তাঁর মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবুল ওয়াক্ত শায়েখ শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী র. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র আত্মা ছিলো সর্বদাই ক্রমোন্নতিমুখী। রফীকে আ'লার (পরম বন্ধুর) সাথে মিলিত হওয়ার বাসনাতপ্ত এবং আলমে মালাকুতের সান্নিধ্যকামী, যা ছিলো তাঁর আসল মাকাম। তাই তিনি উন্নততর মর্যাদালাভের জন্য থাকতেন সদা উদগ্রীব। প্রতিনিয়ত তাঁর কলব থাকতো তাঁর রূহের অনুগামী, আর নফস থাকতো কলবের অনুগামী। কলবের হরকত নফসের হরকতের চেয়ে অধিকদৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকে। কুরবে এলাহীতে (আল্লাহর নৈকট্যে) উরুজের মাকামে অবশ্যই কলব এবং রূহ নফস থেকে আলাদা হয়ে যায়, যা হয় উনসুরী (আগুন-পানি-মাটি-বাতাস) সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণ। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ হেকমত ও সীমাহীন রহমত এই যে, সৃষ্টির পূর্ণতা সাধনের এবং এরশাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব স. এর মধ্যে উনসুরী বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট রেখে দিয়েছেন। তাই উক্ত গাইন বা পর্দাকে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কলবের হরকতের মধ্যে অন্তর্জ্যোতিকে কিছুটা নিষ্প্রভ করবার জন্য, যাতে কলব রূহের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঝুঁকে না পড়ে এবং আলমে কুদসের সঙ্গে পুরোপুরি মিলিত হয়ে না যায়। পূর্ণ শওক এবং ইহজগতের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার কারণে তাঁর কলবের হরকতের মধ্যে যে স্থবিরতা পয়দা হতো, তার কারণেই তিনি স. ইস্তেগফার করতেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিহিত ছিলো আল্লাহ্পাকের হেকমত এবং মুসলিহাত। উম্মতকে পূর্ণতা প্রদানের আগ্রহে তাদের অন্তরোন্নতির জন্যই তিনি স. ইস্তেগফার এবং উযরখাহী করতেন।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আসমায়ীকে একবার 'গাইন' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ স. এর 'গাইন' ছাড়া অন্য কারও অন্তরের 'গাইন' সম্পর্কে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো তবে আমার জানা মতে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু মুস্তফা স. এর কলবের অবস্থা ও সিফত সম্পর্কে কিছু বলার শক্তি আমার নেই। (লেখক বলেন) আসমায়ীর এই কথাটি বড়ই পছন্দনীয় হলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কলবে মুস্তফা স. এর প্রতি আদব-সম্মান বোধ দান করেছেন, যার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া আর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। যে কেউ যা কিছুই বলে থাকুন না কেনো, সকলেই আপন আপন প্রজ্ঞা ও অনুমান অনুসারেই বলেছেন। তাঁর মাকামের খবর যে যা কিছু জানিয়েছেন, তাঁর মাকাম তারও অনেক ঊর্ধ্বে। বিষয়টি মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্নতার) অন্তর্ভূত। আর মুতাশাবিহাতের প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহর।

নবী করীম স. এর ক্বেরাত

রসুলেপাক স. পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন তারতীলের সাথে। প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করতেন স্পষ্টাক্ষরে। মদের (টেনে পড়ার) স্থলে মদ করতেন এবং আয়াতের শেষ প্রান্তে ওয়াকফ করতেন (থেমে যেতেন)। সুতরাং তিনি তেলাওয়াত করতেন এভাবে 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'। এরপর থামতেন। তারপর পাঠ করতেন 'আররহ্মানির রহীম'। এরপর আবার থামতেন। থামতেন 'মালিকিইয়াওমিদ্দীন' বলার পরেও। তিরমিজি। এরকম থেমে যাওয়াকে বলা হয় 'ওয়াকফুন্নবী'। এলমে ক্বেরাতের পণ্ডিতগণ ওয়াকফের কতিপয় কায়দা উদ্ভাবন করেছেন। বাক্য সমাপ্ত হওয়া, পূর্বের বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এসকল ওয়াকফকে ওয়াকফে তাম, ওয়াকফে হাসান ও ওয়াকফে কাফী ইত্যাদি নাম দিয়েছেন। তাজবীদের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি স. যখন অন্য কোনো সুরা পাঠ করতেন, তখন তা-ও তরতীলের সাথে পাঠ করতেন। তেলাওয়াত করতেন অত্যন্ত সুন্দর উচ্চারণে। তাঁর চেয়ে সুন্দর ক্বেরাত আর কারও ছিলো না। তিনি যখন ক্বেরাত পড়তেন, তখন সুরের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। কখনও কখনও তেলাওয়াতের সময় আওয়াজ উচ্চ করতেন। যেমন মক্কাবিজয়ের দিন সুরা ইন্না ফাতাহ্না যখন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন তাতে ঘটেছিলো সৌন্দর্যের সর্বোতমুখী বিকাশ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. বলেছেন, রসুল স. ক্বেরাতের মধ্যে যেখানে তরজী করতেন, সেখানে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতেন। বোখারী। প্রকাশ থাকে যে, রসুলে পাক স. ক্বেরাতের মধ্যে তরজী (প্রলম্বিত লয়ে পাঠ) করতেন তাঁর নিজস্ব ইচ্ছানুসারে। বাধ্য হয়ে অর্থাৎ উটের ঝাকুনির সঙ্গে বাধ্য হয়ে নয়, যেরকম অনেকে মনে করে থাকে।

উটের ঝাকুনির কারণে হয়ে থাকলে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্‌ফাল তা করতেন না এবং একে রসুল স. এর আমলের সাথে সম্পৃক্তও করতেন না। অর্থাৎ 'রসুলকরীম স. ক্বেরাতের মধ্যে তরজী করতেন' এরকম বর্ণনা তিনি করতেন না। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আওয়াজ দ্বারা তোমরা কোরআনকে সুসজ্জিত কোরো। আরও বলেছেন, কোরআনকে যে সুন্দর ও মধুর কণ্ঠে পাঠ না করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তিনি স. আরও জানিয়েছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলের সুন্দর উচ্চারণবিশিষ্ট কোরআন পাঠ যেভাবে শোনেন এবং যে রকম আগ্রহভরে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেন, সেভাবে তিনি আর কোনো কিছুই শোনেন না এবং মনোনিবেশ করেন না। এতে করে একথাটিই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। সাইয়্যেদুনা হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিসের অলংকার আছে। কোরআন মজীদের অলংকার হচ্ছে সুন্দর আওয়াজ। বর্ণিত আছে, এক রাত্রিতে তিনি স. হজরত আবু মুসা আশআরীর ক্বেরাত শুনেছিলেন অত্যন্ত মনযোগের সাথে। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী। তাঁর প্রশংসায় তিনি স. মন্তব্য করেছেন, তাকে নবী দাউদের বংশধরদের মতো কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে। দিনের বেলায় তিনি স. তাঁকে জানালেন, আমি কাল রাতে তোমার কোরআন পাঠ শুনেছি। তখন হজরত আবু মুসা আশআরী বললেন, আফসোস! আমি তো একথা জানতে পারিনি। জানতে পারলে আরও অধিক সুন্দর করে পাঠ করতাম।

সুর করে কোরআন পাঠ করা সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ একে শর্তহীনভাবে জায়েয বলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মত হচ্ছে— মদের ক্ষেত্রে কমবেশী হোক বা হরকতের মধ্যে এশবা পয়দা হোক, বা তা কোনো সুরবিদ্যার কায়দা কানুনের মতো হোক, সর্বাবস্থায় সুর করে কোরআন পাঠ করা যাবে। আবার কেউ কেউ তা শর্তহীনভাবে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই সুর করে কোরআন পাঠ করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে সঠিক মাসআলা হচ্ছে— সুন্দর আওয়াজে সুর করে কোরআন পাঠ করা যাবে, যদি তা হয় স্বাভাবিকতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ কষ্টসাধ্যতা, কৃত্রিমতা, কোনো রকম তাকাল্লুফী বা বানোয়াটী অনভিপ্রেত। স্বাভাবিকভাবে যদি মনের ভাব থেকে সুর উঠে আসে এবং সে সুর যদি হয় সুন্দর উচ্চারণবিশিষ্ট, তবে তা হবে বৈধ, যদিও তার মধ্যে তাযইন ও তাহসীনের আধিক্য থাকে। যেমন হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছিলেন, আমি তো একথা জানতে পারিনি। জানতে পারলে আরো অধিক সুন্দর ও সুসজ্জিত স্বরে পাঠ করতাম। যার মধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রবলতর হয়, সে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সুন্দর করে, সুমিষ্ট স্বরে পাঠ করাটা

তখন তার নিজস্ব ইচ্ছাধীন থাকে না। সে তখন আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভাবের প্রাবল্যের অনুগত হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে একটি প্রকৃতিগত গুন, কৃত্রিম নয়। সওতে আরব বা লাহানে আরব (সুললিতি কণ্ঠ) বলে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে। এটা হচ্ছে এক প্রকারের সুর, সাহাবা কেরাম যার চর্চা করতেন। কোরআনকে এভাবে সুরবিশিষ্ট করা একটি প্রশংসনীয় আমল। কেননা এর মাধ্যমে পাঠকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সুর বিশিষ্ট তেলাওয়াতের বৈধতার আরেকটি দিক আছে। তা হচ্ছে, ক্বেরাতের এলহান বিদ্যার কোনো তরয তরিকায় কোরআন পাঠ করা, যদিও এ দিকটি স্বাভাবিক সুরের দিক নয়। এটা শিল্পের ন্যায় চেষ্টা-মেহনতের দ্বারা অর্জনযোগ্য এবং এর মধ্যে কৃত্রিম সুরের দিকটিও বিদ্যমান। যেমন যুক্ত ও অযুক্ত সুরগত রীতি-নীতি, যা উচ্চারণ ও ধ্বনির আবিষ্কারের কৌশল-কসরৎ থেকে তৈরী। পরিশ্রম ছাড়া এরকম সুর শিক্ষা করা যায় না। সলফে সালেহীন আলেমগণ এ ধরনের সুরের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ্ বলে মনে করেছেন। তাঁরা এভাবে কোরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। সলফে সালেহীনের অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাল, তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, তাঁরা সুরকারদের আরোপিত সুরের প্রতি ছিলেন বীতস্পৃহ। কেননা তা ছিলো কৃত্রিম। আন্তরিকতা ও মহব্বতের সংমিশ্রণ তার মধ্যে ছিলো না। এ প্রকারের পাঠ তাঁরা বর্জন করে চলেছেন। কিন্তু আন্তরিক মহব্বতের সাথে হৃদয়ের আবেগ থেকে উৎসারিত সুন্দর সুরের তেলাওয়াত তাঁরা যে পছন্দ করতেন, তা বলাই বাহুল্য। শরিয়তপ্রবর্তনকারী নবী-রসুলগণ এ ধরনের তেলাওয়াতকে নিষেধ করেননি। বরং তার প্রতি ইতিবাচক ইঙ্গিতই করে গিয়েছেন। তাঁরা নিজেরাই মানুষকে এরকম তেলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ সংবাদটিও দিয়েছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা এ রকম পাঠককে ভালবাসেন। একারণেই তিনি স. এরশাদ করেছেন— যারা সুললিত স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করে না, তারা আমার দলভুক্ত নয়। ইবনে আবী শায়বা হজরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা কোরআন শিক্ষা দাও এবং তা পাঠ করো সুমধুর স্বরে। আর লিপিবদ্ধ করো আমার বাণীসমূহ। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া।

তেলাওয়াত সম্পর্কে রয়েছে একটি বিশেষ ঘটনা। হজরত দাউদ আ. বনী ইসরাইলদেরকে ওয়াজ নসিহত করতে এবং যবুর কিতাব শোনাতে যখন ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাতদিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। স্ত্রীগণের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে দিতেন। পুত্র সুলায়মান নবীকে বলাতেন, বিভিন্ন লোকালয়ে পাহাড় পর্বতে সর্বত্র এ কথা ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ্র নবী দাউদ অমুক দিন সকলকে নিয়ে মজলিশ করবেন এবং তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। তারপর

উন্মুক্ত প্রান্তরে মঞ্চ স্থাপন করা হতো। তার উপর তিনি উপবেশন করে পুত্রকে তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান থাকতে বলতেন। জ্বিন, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী, কীটপতঙ্গ সকলেই সমবেত হতো। সমবেত হতো কুমারী এবং সধবা রমণীরাও। তারা সকলে তাঁর আলোচনা শুনতো। দাউদ নবী আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা-প্রশস্তি বর্ণনার পর তাঁর বক্তব্য শুরু করতেন এবং যবুর কিতাব পাঠ করতেন। তা শ্রবণ করে আল্লাহপ্রেমে আত্মহারা হয়ে একদল লোক মৃত্যুবরণ করতো। তারপর হজরত দাউদ গোনাগারদের লক্ষ্য করে নসিহত শুরু করতেন। তাদের মধ্য থেকেও একদল লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। এভাবে যখন বহু লোকের প্রাণবিয়োগ হয়ে যেতো, তখন হজরত সুলায়মান আরজ করতেন, হে আল্লাহ্র নবী! বহু লোক তো মৃত্যু বরণ করেছে। শ্রবণকারীদের কলিজাতো টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে। একথা শোনার পর তিনিও বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। তারপর তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। হজরত সুলায়মান ঘোষণা দিতেন, যাদের আপনজন ও বন্ধুবান্ধব মৃত্যুবরণ করেছে, তারা যেন তাদের লাশগুলি তালাশ করে নিয়ে যায়। রমণীগণ তক্তা নিয়ে এসে আপন আপন স্বামী-সন্তান বা ভাইদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। পরের দিন হুঁশ ফিরে পেলে তিনি হজরত সুলায়মানকে জিজ্ঞেস করতেন, বনী ইসরাইলদের অবস্থা কী? তিনি জবাব দিতেন, হে আল্লাহ্র নবী! ওমুক ওমুক লোক মরে গিয়েছে। তিনি একে একে তাদের নাম বলতেন। তখন নবী দাউদ স্বীয় হস্তদ্বয় তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডলের উপর মেরে মেরে মোনাজাত করতেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি কি দাউদের উপরে অপ্রসন্ন? আমার উম্মতের ওই মৃত লোকদের সঙ্গে তুমি আমাকেও কেনো শামিল করে নিলে না? তারা তো তোমার প্রেমে ও ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। পরবর্তী মজলিশের পূর্ব পর্যন্ত এমতো অবস্থাতেই কালাতিপাত করতেন তিনি। আবার আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর এমতো অবস্থার পরিবর্তনও হতো।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, বনী ইসরাইলের হাল ছিলো এই উম্মতের হালের চেয়ে অধিকতর পূর্ণ ও উঁচু মানের। তবে সুরের ব্যাপারে হজরত আবু মুসা আশআরীর হাল ছিলো খুবই হৃদয়স্পর্শী। তাই তাঁর সম্পর্কে তিনি স. বলেছেন, তাকে দেওয়া হয়েছে নবী দাউদের বংশধরদের সুরযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র(সুমধুর সুর)। তবে বনী ইসরাইলদের কথিত মৃত্যুবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করা যেতে পারে দুরকমের। যেমন—১. আমরা বলি, এই উম্মতকে এমন শক্তি দান করা হয়েছে যে, তারা সর্বদাই এমন অবস্থাকে আয়ত্ত্ব করতে পারে। তাই তাদের শারীরিক শক্তি নিঃশেষ হয় না। বরং আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে তাদের মধ্যে এক অপরূপ রূহানী শক্তি জন্ম নেয়। এটা এই উম্মতের শক্তির আধিক্য। রূহানী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণেই এমতো যোগ্যতা তাদের লাভ হয়ে থাকে। তাই সেমা শ্রবণ করা এবং না করা

উভয় অবস্থাতেই তারা এরকম অবস্থায় থাকে। বরং অনবরত জিকিরের বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে তাদের একীন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন বলা হয়েছে, যদি পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে একীনই বৃদ্ধি পায়। আসহাবে মাযামীর হওয়া সত্ত্বেও হজরত দাউদ এবং হজরত সুলায়মানের হাল ছিলো তাঁদের উম্মতের অবস্থা থেকে উত্তম। তাই মৃত্যু তাঁদের কাছে ওরকমভাবে আসেনি। আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি ও সাহায্যই তাঁদেরকে সহায়তা করেছিলো। তবে হজরত দাউদ মৃত্যুবরণ না করার প্রতি যে আক্ষেপ করতেন, তা ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তাঁর উম্মতের জন্য স্নেহ, দায়বদ্ধতা এবং বিনয়-নম্রতার প্রকাশ। সুতরাং উম্মতের তুলনায় তাঁর মর্যাদা এ ব্যাপারে কম ছিলো— একথা কল্পনাই করা যায় না।

আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি যে কলব ধারণ করে, সে সম্পর্কে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে কোরআন মজীদের তেলাওয়াত শ্রবণকালে ক্রন্দনরত দেখে বললেন, আমাদের অবস্থাও একদিন এরকম ছিলো, তবে এখন আমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে। সহ্য করার শক্তিকে তিনি বিনয়ার্থে হৃদয়ের কাঠিন্য বলে ব্যক্ত করেছেন। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তাঁর মর্যাদা সুসংরক্ষিত ও সুউচ্চ। অশুভ ও মন্দ বিষয়াবলী থেকে বহু উর্ধ্বে ছিল তাঁর মাকাম। কথিত আছে, হজরত সুহায়ল তস্‌তরী একদিন কোনো এক ব্যক্তির কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন। তাঁর শরীরে শুরু হলো কম্পন। তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসার পর লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী? আপনার হাল তো ইতিপূর্বে এরূপ ছিলো না। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আমার হালের শিথিলতা। লোকেরা বললো, তাহলে দৃঢ়তা কোনটি? তিনি বললেন, দৃঢ়তা হচ্ছে সবকিছু শোষণ করবে, অথচ স্বস্থান রইবে অচঞ্চল ও স্বাভাবিক।

এই উম্মতের মধ্যে বহু লোক কোরআন মজীদের পাঠ শুনে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসায় ও ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরকম মজলিশের বৃত্তান্ত বিরল নয়। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আবু ইসহাক সা'লাবী এ ধরনের আশেক লোকদের নাম-পরিচিতিমূলক কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'নাফহাতুল উন্‌স' নামক পুস্তকেও তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সেমা'র মাসআলা

তেলাওয়াত বিষয়ে আলোচনা শেষে সেমা বিষয়ে যদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়, তবে তা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে না। প্রকাশ থাকে যে, এ মাসআলাটি মতানৈক্যমণ্ডিত। কেউ কেউ বিষয়টিকে বৈধ বলেছেন এবং তার উপরই তাদের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। কেউ কেউ আবার রয়েছেন সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে। তাঁরা বলেন, একাজ আমরা করি না, আবার তা অস্বীকারও করি না। জেনে রাখা উচিত যে, সেমা দ্বারা ইশারা করা

হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী আল্লাজীনা ইয়াস্‌মাউনাল কাওলা ফা ইয়াত্তাবিউনা আহসানাহু' এর দিকে। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন ওয়া ইজা সামিউ' মা উনযিলা ইলার রাসূলি তারা আ'ইউনাহুম তাফীদু মিনাদ্‌ দামই' মিম্মা আ'রাফূ মিনাল হাক্কি' (রসুলের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা যখন তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে)। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে সেমা'র মাসআলাটি এমন একটি বিষয়, যার সঠিকতার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। সেমা (আল্লাহ্‌র প্রেমসঙ্গীত) হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত লাভের একটি উপলক্ষ। কবিতা, কাসীদা, সঙ্গীতশিল্পের তাল-লয়-সুর সম্পর্কে মতানৈক্য তো অবশ্যই আছে। এ ধরনের সেমার মাধ্যমে বাহুল্য বাক্য এবং বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কেউ কেউ সেমা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তারা এ কাজটিকে অন্তর্ভূত করেছেন ফাসেকী ও গোনাহর কাজের মধ্যে। কেউ কেউ আবার একে বলেছেন জায়েয এবং সঠিক। দুই মতাবলম্বীদের মধ্যেই রয়েছে বাড়াবাড়ি (আওয়ারেফ পুস্তকের বর্ণনা এখানেই শেষ)। মোট কথা, মাসআলাটির ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। একটি মত হচ্ছে ফকীহ্‌গণের। তাঁরা কাজটিকে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সাথে অস্বীকার করেন। তাঁরা হঠকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁরা এ কাজকে কবীরা গোনাহর সঙ্গে মিলিত করেন। বলেন, কাজটি কুফুরী, যিন্দিকী ও ধর্মদ্রোহিতা। এটা অবশ্য বাড়াবাড়ি এবং ন্যায়পরায়ণতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই নামান্তর। এ বিষয়টি নিয়ে তাঁদের এতখানি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা উচিত হয়নি। কেননা মাসআলাটি মতোবিরোধমণ্ডিত। তবে হ্যাঁ, এ বিষয়ে মাজহাবের আলেমগণের পক্ষ থেকে হারাম বা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে যে সব দলিল রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মত হচ্ছে হাদিসবেত্তাগণের। তাঁরা বলেন সেমা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সহীহ্‌ কোনো হাদিস, অথবা সুস্পষ্ট নস্‌ নেই। বরং এ প্রসঙ্গে যতগুলি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি হয় মওজু, না হয় মাতউন। কোরআনের আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে, যদিও কোনো কোনো তাফসীরকার এরকম তাফসীর করেছেন, যা সঙ্গীত হারাম হওয়াকে প্রমাণ করে। কিন্তু তাঁদের এ ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যান্য তাফসীরকারগণের বর্ণনাও আছে। সুতরাং যখন সেমা হারাম সাব্যস্ত হয় না, তখন তো তা হালাল বলেই গণ্য হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন উহিল্লা লাকুমুত্তয়্যিবাত' (তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে)। আবার কেউ কেউ বলেন যে, অকাট্য দলিল দ্বারা বিষয়টি যেমন হালাল সাব্যস্ত হয় না, তেমনি প্রমাণিত হয় না হারামও। তৃতীয় মত হচ্ছে— সুফিয়ানে কেরামের। সেমার মাসআলায় তাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন মত ও বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ সেমা পরিহার করেছেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন সেমার অনুরাগী।

তবে তাঁরা এটাও চাইতেন যে, সেমা যেনো কঠোরভাবে পরিহার করা হয়। কেননা তাঁরা উৎকৃষ্টতরকেই গ্রহণ করতেন। সব সময়, সর্বাবস্থায়, সমস্ত কথা ও কাজে সাবধানতা অবলম্বন করাই ছিলো তাঁদের নীতি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মহব্বতের উচ্ছ্বাসে আসক্তা নিমজ্জিত। প্রেমোন্মত্ততা তাঁদেরকে এতোই পরাভূত করে রাখতো যে, তাঁরা গণ্য হতেন আত্মভোলা ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হিসেবে।

সুরের মুর্চ্ছনা যে মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। সুরের সিম্ফনী মানুষের হৃদয়কে করে উদ্বেলিত, বশীভূত। বিষয়টি পরীক্ষিত। এমনকি প্রাণীকুলে এবং অজ্ঞ অবুঝ শিশুদের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা স্বীয় নফসের উপর ক্ষমতাবান, সহিষ্ণু, শরিয়তের বিধান এবং আদবের উপর সুদৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম, তাঁদের পদক্ষেপে বিচ্যুতি আসে না। আহলে শওকদের (আবেগপ্রবণদের) মতো প্রেমোন্মত্ততার প্রাবল্যে তাঁরা স্বস্থানচ্যুত হন না।

কোনো কোনো আরেফ (আল্লাহর পরিচয়ধন্য ব্যক্তি) বলেছেন, সেমা ওই সকল ব্যক্তির জন্য, যারা তাজাল্লিয়াতে সেফাতের আহল এবং ওয়াজদ এর অধিকারী। অর্থাৎ যাদের উপর বিভিন্ন রকমের হাল প্রকাশ পায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সিফতের তাজাল্লি বর্ষিত হয়। কিন্তু যিনি জাতের তাজাল্লিপ্রাপ্ত, তাঁর মাকাম সব চেয়ে উর্ধ্বে। আহলে তরিকতের এ শ্রেণীটি সেমা'র আদব ও শর্ত পর্যালোচনা করেছেন, যা অনুসরণকারী তালেবের (অন্বেষণকারীর) জন্য যথেষ্ট হতে পারে। সে পর্যালোচনা বিধান ও পরিচিতি সমন্বয়ে রচিত। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে রয়েছে দুইটি পৃথক অনুচ্ছেদ। এক অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিশদ প্রমাণ। অপরটিতে রয়েছে এ ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা, তার আদব ও গুরুত্বের বিবরণ। 'আলআমতা বিআহকামিস্‌সেমা' পুস্তকখানির লেখক বলেছেন, সেমা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে ওই সেমা, যা সাধারণ্যে প্রচলিত। এ জাতীয় সেমা পরিবেশন করা হয় সাধারণত মনে আনন্দ সৃষ্টি, কোনো কাজকে সহজসাধ্য করা, বোঝা বহনকে সহজ করা ও হজের দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষেত্রে। এতে কাবাশরীফ এবং যমযমের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। রযমিয়া কবিতা পড়া হয়, যার মধ্যে যুদ্ধ-জেহাদের বর্ণনা থাকে। যেমন হাদাদ বা নসব জাতীয় কবিতা। অথবা বাচ্চাদের মন ভুলানোর জন্য মেয়েরা যা গুনগুন করে গায়, তা। এ ধরনের সেমা মোবাহ, যদি তার মধ্যে কোনো অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কথা না থাকে। এগুলো মানদুব এবং মোস্তাহাব। দ্বিতীয় প্রকার সেমা হচ্ছে এবতেহাল বা সঙ্গীত, যা সঙ্গীত শাস্ত্রের রীতি-নিয়ম অনুসারে গাওয়া হয়। স্বরের মধ্যে এরূপ ওঠা-নামা করা হয়, যাতে মনের মধ্যে আনন্দের ভাব জন্মে। নফস হয় উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। এই দ্বিতীয় প্রকারের সেমা সম্পর্কেই আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। একদল একে মোবাহ (বৈধ)

বলেন। আবার আরেক দল বলেন হারাম। আলেমগণ বলেন, এ ধরনের সেমা সম্পর্কে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের বিখ্যাত ও সুস্পষ্ট উক্তি হচ্ছে– সেমা মাকরুহ (অনভিপ্রেত) যদিও একে হারামও বলা যায়। তাই কাযী আবু তাইয়্যেব ইমাম আবু হানিফার বরাত দিয়ে বলেন, সেমা হারাম। শায়েখ শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ারদী তাঁর 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা সঙ্গীতকে গোনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন। তদ্রূপ কাযী আবু তাইয়্যেব সেমা'র হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমের শা'বী, সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ, নাখয়ী এবং ফাকেহী থেকে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। শায়েখ সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোনো এক ব্যক্তি তাঁর কাছে সঙ্গীতের ব্যাপারে মাসআলা জানতে চাইলে তিনি বললেন, সেমা বা সঙ্গীত হচ্ছে ওই বাতাসের ন্যায়, যা এক কান দিয়া ঢুকে অপর কান দিয়ে বের হয়ে যায়। আলেমগণ বলেন, তাঁর এমতো উক্তি সেমা মোবাহ হওয়ার দিকেই ইশারা করে। কিন্তু কুফা, মদীনা এবং ইরাকের আলেমগণ থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় হারামের।

আলেমগণের একটি দল আবার সেমার বৈধতার পক্ষেই মত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের উক্তিকে মুতলাক রেখেছেন। পুরুষ, নারী এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ আছে কিনা, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। সকলের ক্ষেত্রে সেমার বিধান রেখেছেন সমান। তবে তাঁরা ফেৎনা থেকে সুরক্ষিত থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। আবার কেউ কেউ সেমাকারী পুরুষ হবে কি নারী হবে, অল্পসংখ্যক হবে, না অধিকসংখ্যক হবে, এ বিষয়কে শর্তযুক্ত করেছেন। সেমা'র বৈধতার মতপোষণকারীগণ বলে থাকেন, সাহাবা কেরামের অনেক বড় দল যাঁদের মধ্যে আশারা মুবাশ্শারাও কেউ কেউ রয়েছেন, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, তাঁদের অনুসারীগণ, মুহাদ্দিছগণ এবং আলেমগণের বিরাট অংশ যাঁরা যুহদ, তাকওয়া, এলেম ও ইবাদতে একনিষ্ঠ, তাঁদের থেকে সেমা করা এবং তা শ্রবণ করা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁরা এ বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে এতো অধিক বর্ণনা ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর এ ব্যাপারটিও নিঃসন্দিগ্ধ যে, বিষয়টি নিয়ে দ্বীনের ইমাম এবং আকাবিরগণ মতবিরোধ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. এর সেমাতে মগ্ন হওয়ার ব্যাপারে রয়েছে মুস্তাফীদ্ব ও মশহুর রেওয়ায়েত। তাঁকে যে সকল ফকীহ, হাফেজ এবং ইতিহাসবেত্তাগণ দেখেছেন, তাঁরা তাঁর হাল অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর সেমাতে দোষের কিছু দেখা যায়নি। তাঁর সময়ে তাঁর চাচা হজরত আলী মুর্তযা রা. ছিলেন আমীরুল মুমিনীন। তিনি জামীলা নাম্নী এক সুকণ্ঠী মহিলার ঘরে যেতেন। সে মহিলা কসম করেছিলো যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য তিনি তাঁর ঘরে সেমা গাইবেন না। আর তিনি চাইতেন ওই মহিলা এসে তাঁকে সেমা শুনিয়ে যাবেন।

আর তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দিবেন। কথিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের জনৈক প্রতিবেশী বলেছেন, তিনি যখন গাইতেন তখন তার সঙ্গে বরবত বাজানো হতো।

কথিত আছে, হজরত স্যাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, যিনি তাবেয়ীগণের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ছিলেন তাকওয়া পরহেজগারীতে অনন্যসাধারণ, তিনিও সেমা শ্রবণ করতেন এবং তা থেকে আত্মিক স্বাদ গ্রহণ করতেন। এভাবে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং কাযী শেরাইহ্ ছিলেন শান শওকতওয়ালা ব্যক্তি। তাঁরা তাঁদের বার্ধক্যাবস্থাতেও বাঁদীদের কণ্ঠে সেমা শ্রবণ করতেন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, যিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য তাবেয়ী, তিনিও ক্রীতদাসীদের কাছ থেকে সেমা শ্রবণ করতেন। তারা গাইতো এবং দফও বাজাতো। শায়েখ আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ ছিলেন আলেম, হাফেজ এবং ফকীহ্। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং প্রতাপশালী। এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্যও রয়েছে। তিনিও সেমা শুনতেন এবং তিনি সঙ্গীতের নিয়ম-নীতি সম্বন্ধেও জানতেন। ইব্রাহীম ইবনে সা'দ, যিনি ফেকাহ্শাস্ত্রে এবং হাদিস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে সে যুগের ইমাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনিও তাঁর ছাত্রদেরকে ওই সময় পর্যন্ত হাদিস শোনাতেন না, যতোক্ষণ না তারা তাঁকে সেমা গেয়ে শোনাতো। তিনি হারুনুর রশীদের মজলিশে সেমা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়াও প্রদান করেছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে ইমাম মালেকের মতামত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, আমার জানা আছে, একদিন ইয়ারম কবিলাতে তাঁর দাওয়াত ছিলো। সে কবিলার লোকদের সঙ্গে বরবত বাদ্যযন্ত্র ছিলো। তারা গাইতো এবং নিপুণতা প্রদর্শন করতো। আর ইমাম মালেকের নিকট চারকোণাবিশিষ্ট দফ ছিলো। তা বাজানো হতো এবং গাওয়া হতো। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

'তাযকেরা' পুস্তকের লেখক একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে— একদিন লোকেরা ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সওরীর নিকট সেমার মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে তাঁরা বললেন, সেমা কবীরা গোনাহ নয়, সগীরা গোনাহ্ও নয়। কথিত আছে, ইমাম আবু হানিফার এক প্রতিবেশী ছিলো। সে সর্বদাই রাতে উঠে গান-বাজনা করতো। আর তিনি কান লাগিয়ে তা শুনতেন। এক রাতে তার গানের আওয়াজ শোনা গেলো না। সকালে তিনি তার পরিবারের লোকদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো, রাত্রে সে বাইরে গিয়েছিলো। তখন সিপাহীরা তাকে ধরে নিয়ে জেলখানায় আবদ্ধ করে রেখেছে। একথা শুনে ইমাম সাহেব পাগড়ি পরিধান করে স্থানীয় প্রশাসকের কাছে গেলেন এবং প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে আনার জন্য সুপারিশ করলেন। প্রশাসক জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কী? তিনি বললেন, ওমর। তাঁর কথা শুনে প্রশাসক ওমর

নামের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। ইমাম সাহেব লোকটিকে বললেন, রাত্রিবেলায় তুমি যা করতে তা করতে পারো। ঘটনাটি সেমা বৈধ হওয়ার একটি দলিল। তবে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক অবৈধতার ফতওয়া এসেছে ওই সকল সেমা'র বেলায়, যেগুলো রচিত হয় অশ্লীল ভাষায়। কথিত আছে, একদিন এক ওলীমার দাওয়াতে ইমাম আবু ইউসুফের সামনে গজল বা সংগীতের মাসআলা বর্ণনা করা হলো। তখন তিনি ইমাম আবু হানিফার প্রতিবেশীর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে কথিত আছে, তিনি অধিকাংশ সময় খলিফা হারুনুর রশীদের মজলিশে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মজলিশে গজল ও সংগীতের চর্চা হতো। তিনি তা শ্রবণ করতেন এবং নিজের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াও অনুভব করতেন। ইমাম মালেকের কাছে গজল বা সংগীতের মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার শহরে এমন অনেক আলেমকে পেয়েছি, যাঁরা এর অস্বীকারকারী ছিলেন না। তাঁরা গজলের অনুষ্ঠানে বসতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, এর অস্বীকারকারী তারাই, যারা অন্ধ, মূর্খ, ইরাকী এবং স্বভাবগতভাবে নিরাবেগ। ইমাম গাজ্জালী, ইমাম কুশাইরী, ওস্তাদ আবুল মনসুর এবং কুফফাল প্রমুখ মনীষী থেকেও এর বৈধতার উপর বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, সংগীত বা গজল ফাসেক ও কাফের ব্যক্তিই কেবল শ্রবণ করে থাকে। এর দ্বারা তিনি ওই গজলকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে অশ্লীল ও অপছন্দনীয় বাক্য থাকে। ইমাম শাফেয়ীর মত, যা ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন, তা হচ্ছে তাঁর মাজহাবে গজল বা সংগীত হারাম নয়। আমি তাঁর এ মন্তব্যটি ইমাম শাফেয়ীর গ্রন্থাবলীতে অনেক অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু গজল হারাম হওয়া সম্পর্কে তাঁর কোনো লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ওস্তাদ আবুল মনসুর বাগদাদী বলেছেন, তাঁর মতে সেমা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, পুরুষের সমাবেশ হতে হবে, অথবা হতে হবে স্ত্রীলোক বা বাঁদীদের মজলিশ। অথবা এমন রমণীর সঙ্গে হতে হবে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। আর শুনতে হবে নিজের ঘরে অথবা বিশেষ কোনো বন্ধুর ঘরে। রাস্তা-ঘাটে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে নয়। শরিয়তের খেলাফ কিছু তার মধ্যে থাকতে পারবে না এবং তার মধ্যে অন্তর্ভূত করা যাবে না কোনো অসুন্দর বাক্য। আর সেমার কারণে নামাজের সময় নষ্ট হতে তো পারবেই না।

আবুল মনসুর বাগদাদী ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ী তাঁকে একদিন এমন এক মজলিশে অংশগ্রহণ করার জন্য ডাকলেন, যে মজলিশে এক ব্যক্তি গজল পরিবেশন করছিলো। গজল গাওয়া যখন শেষ হলো, তখন ইমাম শাফেয়ী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি গজল পছন্দ হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি তুমি ঠিক বলে থাকো, তাহলে বলতে হয়, তোমার অনুভূতি স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ গজল পছন্দ হওয়া সঠিক

অনুভূতি ও স্বাভাবিকতার আলামত। আর তা অপছন্দ করা অস্বাভাবিকতা এবং অনুভূতির অতীক্ষ্ণতার পরিচায়ক। এ সকল বিবরণ দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, গজল-সেমা হারাম বা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের কোনো দলিল নেই। যদি থাকতো, তাহলে তবীয়ত বা স্বাভাবিক রুচিবোধের কী কোনো মূল্য হতে পারতো? সুরের প্রভাব যে স্বাভাবিক, এ সম্পর্কে কারও কোনো দ্বিমত নেই। প্রাণীরাও সুরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। মানুষের মতো সংবেদনশীল সৃষ্টি তো পারেই না। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে— আল গিনাউ লাহ্উন মাকরূহুন ইউশ্বিহুল বাতিল (গজল বা গান এক প্রকারের খেলতামাশা যা মাকরুহ এবং তা বাতেলের সাথে সাদৃশ্য রাখে)। আলেমগণ বলেন, ইমাম শাফেয়ী মাকরুহ বলে সম্ভবত একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তা বর্জন করা উত্তম। ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, তাঁর একথায় হারাম বা মাকরুহ তাহরিমী বুঝায় না। এমন কি তিনি যদি শুধু বাতেল বলতেন, তবুও তদ্দারা হারাম বা মাকরুহ সাব্যস্ত হতো না। কেননা বাতেল এর অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ যার মধ্যে কোনো উপকার থাকে না। আর মোবাহ্ও তাই, যার মধ্যে কোনো লাভ থাকে না। ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, যে সকল বর্ণনায় গজলের বিরুদ্ধে কঠোরতা পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে, অশ্লীল ও অসুন্দর বাক্যবিশিষ্ট গজল। সুতরাং হারাম হওয়ার বিধানটি প্রযোজ্য হবে আনুষঙ্গিকতার কারণে। বরং গজল বা সংগীতের সেমা হারাম নয়। সার্বিক আলোচনার সার কথা হচ্ছে, ইমাম শাফেয়ীর কথা ও কাজ পর্যালোচনার পর দেখা যায়, সেমা বৈধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ সম্পর্কে হারাম হওয়ার স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে তো সেমার বৈধতার বর্ণনাই পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সন্তান সালেহের কণ্ঠে গজল শুনেছেন। আবুল আব্বাস ফারগানী বর্ণনা করেন, আমি সালেহ ইবনে ইমাম আহমদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি সেমা পছন্দ করতাম। কিন্তু আমার পিতা মহোদয় তা অপছন্দ করতেন। আমি একবার ইবনে হানাদা থেকে কথা নিলাম, এক রাতে তিনি যেনো আমার ঘরে অবস্থান করেন। কথা অনুসারে তিনি এক রাতে আমার ঘরে এলেন। আমরা যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে, আমার পিতা মহোদয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন ইবনে হানাদা গাইতে শুরু করলেন। এমন সময় আমি ছাদের উপর কেউ চলাচল করছেন বলে অনুমান করলাম। ছাদের উপর যেয়ে দেখি, আমার পিতা মহোদয় চাদর মুড়ি দিয়ে গজল শুনছেন। আর আস্তে আস্তে টহল দিচ্ছেন। মনে হলো যেনো তিনি ওয়াজদ এর অবস্থায় আছেন। এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকেও পাওয়া যায়। এতে করে মনে হয়, তিনি সেমাকে মোবাহ (বৈধ) মনে করতেন। সেমা সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধ যে মতামত পাওয়া যায়, তা ছিলো অপ্রিয়, অসত্য ও অশ্লীল বাক্যসম্বলিত সেমা সম্পর্কে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে একথাও এসেছে যে, তিনি

একবার তাঁর পুত্র সালেহের কণ্ঠে কাওয়ালী শুনলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। তখন তাঁর পুত্র জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! আপনি কি ইতিপূর্বে সঙ্গীতকে অপছন্দ করেননি? মাকরুহ্ মনে করেননি? তখন তিনি বললেন, আমি জানতাম, সকল সঙ্গীতেই অসুন্দর কথা বলা হয়।

শায়েখ দাউদ তায়ী সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি সেমা'র মজলিশে গমন করতেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি যখন গজল ও সেমা শুনতেন তখন উত্তেজনার চোটে তাঁর কোমর সোজা হয়ে যেতো। তিনি ছিলেন হানাফী মাজহাবের একজন বড় আলেম ও ফকীহ্। ছিলেন ইমাম আজমের একজন বিশিষ্ট শিষ্যও।

ফকীহ্ ও আলেম নাসিরউদ্দীন আবুল মুনীর ইসকান্দারী তাঁর ফতওয়ায় বলেছেন, সেমা যদি শর্ত সহকারে তার নিজস্ব মহল এবং নিজস্ব আহলের মধ্যে হয়, তাহলে সহীহ্ হবে। তাঁর এই অভিমতটি আবু বকর ফালাল সাহেব তাঁর 'জামে' পুস্তকে লিখেছেন এবং তাঁর সহযোগী আবদুল আযীয তা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উভয়েই হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। 'আল মুস্তাউয়ির' রচয়িতা হাম্বলী আলেমগণের এক দল থেকে সেমা সম্পর্কে মাসআলা উদ্ধৃত করেছেন, যাঁদের মধ্যে শায়েখ সালেহ্ ও শায়েখ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও রয়েছেন। হাফেজ আবুল ফজল মুকাদ্দেসী প্রমুখ আলেমগণ তা গ্রহণও করেছেন। আবু মোহাম্মদ খুররম তা তাঁর রচনাবলীতে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি সেমার বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। সেখানে লিখেছেন, সেমার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এজমা (ঐকমত্য) ছিলো। তাঁর বিবরণপরম্পরার বর্ণনাকারীগণকে তিনি বলিষ্ঠ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। শায়েখ তাজউদ্দিন আবদুর রহমান ফারাভী শাফেয়ী, যিনি দামেস্কের শায়েখ ও মুফতী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, ইবনে কুতাইবা সেমার উপর আহলে হারামাইনের এজমা আছে বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কুতাইবা অধিকাংশ আহলে ইরাক থেকে এবং ইবনে তাহের তাঁর নিজস্ব সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, যখন তোমরা আহলে মদীনাকে কোনো বিষয়ে এজমা করতে দেখবে, তখন ভাববে, এটা সুন্নত। ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার ইমাম শাফেয়ীকে আহলে মদীনাদের সেমার বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হেজাজের এমন কোনো আলেম সম্পর্কে আমি জানি না, যিনি সেমাকে মাকরুহ মনে করতেন। বরং যাঁরা এর প্রশংসা করেছেন, আমি তাঁদের সম্পর্কে জানি।

আবু ইয়া'লা হাম্বলী বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব মাজেশুন এবং তাঁর অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ সেমার অনুমতি দিয়েছিলেন। হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত আলেম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আমরা ইউসুফ মাজেশুনের কাছে যেতাম। তিনি যখন আমাদেরকে হাদিস শোনাতেন, তখন তাঁর এক প্রতিবেশীর ঘর থেকে

গান-বাজনার আওয়াজ আসতো। আর তিনি ছিলেন এমন একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ, যাঁর বর্ণিত হাদিস সহীহ্ হাদিসের অন্তর্ভূত। মদীনা মুনাওয়ারার মুফতী আবদুল আযীয ইবনে সালামা মাজেশুন বলেছেন, ইউসুফ মাজেশুন থেকে মুহাদ্দিছগণ হাদিসের বর্ণনা গ্রহণ করতেন। ওই হাদিসগুলো বোখারী ও মুসলিম শরীফে অন্তর্ভূত করা হয়েছে। তিনি বরবত বাজানোর অনুমতিও দিতেন। 'নেহায়া' প্রণেতা 'হেদায়া'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে আহনাফ থেকে সেমা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করার পর বলেছেন, কবিতার ছন্দ ঠিক করার এবং জবানকে সুস্পষ্ট করার জন্য গুন গুন করে যে সুর করা হয়, তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। আবার কোনো কোনো আহনাফ বলেন, কেউ যদি একাকী থাকে এবং নির্জনতা বা আতংক দূর কারার জন্য আপন মনে গুন গুন করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসি এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন। 'যখীরা' প্রণেতা আহনাফ থেকে উদৃতি দিয়েছেন যে, কোনো কোনো আহনাফ উরছে সেমা করাকে দুষণীয় মনে করতেন না। কেউ কেউ দুই ঈদের দিন এবং যে কোনো মোবাহ খুশির সময় সেমা করা নির্দোষ বলে মনে করতেন। এ মতটি গ্রহণ করেছেন মুত্তাকী আলেম শায়েখুল ইসলাম আবু মোহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম এবং তাঁর সহযোগী শায়েখ মোহাম্মদ ইবনে দাকীকুলঈদ।

'আমতা' প্রণেতা বলেছেন, সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে ছিলেন বহু ফকীহ মুহাদ্দিছ। তাঁরা ছিলেন এলমে শরিয়তের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রজ্ঞাসম্পন্ন। যেমন ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী, শায়েখ আবু তালেব মক্কী এবং শায়েখ শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী। তাঁরা তাঁদের রচনাবলীতে এমন আলোচনা করেছেন, যা সেমার বৈধতার উপর দলিল। শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী থেকে সকল কুশাইরী আলেম এবং শায়েখ শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী বর্ণনা করেছেন, শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী বলেছেন, সুফিয়ানে কেরামের উপর আল্লাহ্তায়ালার রহমত পতিত হয় তিন সময়ে— ১. খাওয়ার সময়— কেননা তাঁরা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও অনেক সময় খাদ্য গ্রহণ করেন না ২. সোহবত প্রদান এবং কথোপকথনের সময়— কেননা, তাঁরা আম্বিয়া মুরসালীনের মাকামে তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে কথোপকথন করে থাকেন ৩. সেমার সময়— কেননা এ সময় তাঁরা হক তায়ালার ওয়াজদ ও শুহুদের মধ্যে থাকেন। সাহাবা কেরামের আলেমগণের একটি দল এ সম্পর্কে অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সুফিয়ানে কেরাম ও ওলামায়ে কেরাম তাঁদের আপন আপন গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

সেমার ব্যাপারে নসীহত

'আমতা' রচয়িতা সেমার ব্যাপারে তিনটি মত প্রদান করেছেন— হারাম, মাকরুহ এবং মোবাহ। অতঃপর প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি মোবাহ এর দিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মোবাহ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে

সুদীর্ঘ আলোচনাও করেছেন এবং কিতাব, সুন্নাহ্, এজমা ও কিয়াস দ্বারা তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে এই— যেহেতু বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা 'তাগান্নি বিলকুরআন' (সুর করে কোরআন পড়া) বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে, তাই কবিতার ছন্দও সুর করে পড়া বৈধ হবে। আর এজমা সাব্যস্ত করেছেন এভাবে— যেহেতু সুমিষ্ট সুরে কোরআন তেলাওয়াত করলে অন্তরে যওক শওক এবং বিনয়-একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, তাই কবিতা পাঠের মধ্যে এরূপ করলে অন্তরে সে সব ভাবের উদয় হবে। কেননা সুরেলা ও ছন্দময় পাঠ ইবাদত ও মোনাজাতে একাগ্রতা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ততা ও আখেরাতের ব্যাপারে উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। মহব্বতে ইলাহী এবং ইত্তেবায়ে রসুলের অনুপ্রেরণা জাগায়। সুতরাং এটাও জায়েয। আরবদের হুদী, নসব এবং নাশীদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের কবিতার উপর কিয়াস করে কেউ কেউ বলেন, ওই সব কবিতা রচনা করা ও আবৃত্তি করা যেহেতু জায়েয, সুতরাং তার মধ্যে সুর সংযোজন করাও জায়েয। এসব আলোচনা এই পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে যে, গজল সেমা হারাম বা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো অকাট্য নস সাব্যস্ত নেই। যদি থাকতো, তাহলে তা হতো নসের বিরুদ্ধে কিয়াস করা। অথচ এরূপ করার কোনো বিধান নেই। সুতরাং নস্ যেহেতু নেই, কাজেই এক্ষেত্রে কিয়াসের দ্বার উন্মুক্ত। সেমা মোবাহ বলার প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা বলেন, যেহেতু হারাম না হওয়ার ব্যাপারে কোনো নস পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া গেলেও তা বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেনি, সুতরাং তা মোবাহ। এক্ষেত্রে আমি মোবাহ এর প্রবক্তাগণের উদ্বৃতি দিলাম একথা বোঝাতে যে, বিষয়টি একটি মতানৈক্যমণ্ডিত মাসআলা। আর মতানৈক্যমণ্ডিত মাসআলার বিধান হচ্ছে, যে কোনো একটি দিক নিয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, প্রাধান্য দেওয়া এবং বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এ সম্পর্কে কোথাও যদি সময়ের সংশোধন দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন করা উচিত। সাবধানতা ও পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করাই সমীচীন এবং ঝগড়ার ফাঁদে পা দেওয়া অনুচিত। এমতাবস্থায় নিজের অবস্থার নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। যদি নিজের মধ্যে সাবধানতা এবং তাকওয়া পাওয়া যায়, তাহলে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, নিজের বাক্য ও অবস্থার ভাষা যেনো বুযুর্গানে দ্বীনের বিরুদ্ধে তিরস্কার ও দোষারোপমূলক না হয়। তাঁদেরকে গোমরাহ ও ফাসেক ইত্যাদি বলা থেকে যেনো সংযত থাকা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে হবে। যেহেতু এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দলিল প্রমাণ রয়েছে এবং এর তরিকাও ভিন্ন ভিন্ন— পক্ষে-প্রতিপক্ষে দু'দিকেই রয়েছেন আলেম, ফকীহ ও আরেফগণ। সুতরাং এক পক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য পক্ষকে পরাভূত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনোক্রমেই ইনসাফের আঁচল হাতছাড়া করা যাবে না। বৈধতার প্রবক্তাগণেরও বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। আলেমগণের ভাষ্যের অস্বীকার করাও নয় শোভন।

বিশেষ করে ওই সকল মহাজনকে তো মান্য করতেই হবে, যাঁরা বিনয়ী, দিয়ানতদারী ও কল্যাণকামিতার পথের পথিক। 'ওয়ালিকুল্লিন ওজ্হাতুন হুয়া মুওয়াল্লীহা ফাসতাবিকুল খইরাত' (প্রত্যেকের জন্য এক একটি দিক রয়েছে, সে যে দিকেই মুখ ঘোরায়। কাজেই তোমরা নেক কাজে অগ্রগামী হও)। উভয় দলের উচিত তমীয ও তফসীলের তরীকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। সব বিষয়েই মৌনতা ও সাবধানতা প্রশংসনীয়। আবার সব জায়গায় খর্বতা এবং বাড়াবাড়ি দু'টোই নিন্দনীয়। ওয়া বিল্লাহিত্তাওফীক ওয়া মিনহুল ইসমাত।

বাদ্যযন্ত্র

'আমতা' রচয়িতা বাদ্যযন্ত্রের বিধান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বলেছেন, চার মাজহাবের ইমামের নিকটই বাদ্যযন্ত্র হারাম। এতদসত্ত্বেও শাফেয়ী মাজহাবের কোনো কোনো আলেম, আসহাবে জাওয়াহের এবং ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ উপরোক্ত বিধানের বিরুদ্ধে বলেছেন। তাঁরা বাদ্যযন্ত্রের প্রকার নির্ধারণ করেছেন। তবে দফ এর বিধানটি দ্বৈতমতসম্বলিত। কেউ কেউ দফকে সাধারণভাবে মোবাহ্ বলেছেন। কেউ কেউ সাধারণভাবে বলেছেন হারাম। কেউ কেউ আবার ঝনঝনি বিশিষ্ট দফ এবং ঝনঝনি ছাড়া দফের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সঠিক কথা হচ্ছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো মোবাহ্। কেউ কেউ এলানের ক্ষেত্রে দফ বাজানোকে মোস্তাহাব বলেছেন। শাবাতা অর্থাৎ বাঁশির ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। আওদ বা বরবত এক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র, যার মধ্যে অনেকগুলি তার থাকে এবং যার আওয়াজ ওঠানামা করে। এ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। আলেমগণ বলেন, চার মাজহাবেরই বিখ্যাত মত হচ্ছে, বরবত বাজানো এবং তার বাজনা শ্রবণ করা উভয়ই হারাম। আলেমগণের একটি দল অবশ্য এর বৈধতার দিকে গিয়েছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুনেছেন। বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের নিকট গেলেন। দেখলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের সামনে এক বাঁদী বরবত বাজাচ্ছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এর মধ্যে কোনো দোষ আছে বলে মনে করেন না? তিনি বললেন, না। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। আলেমগণ বরবত বাজানো সম্পর্কে উদ্ধৃতি নকল করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, হজরত আলী, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হজরত আমর ইবনে আস এবং হজরত হাস্সান ইবনে ছাবেত থেকে। আর সাহাবী ছাড়া অন্য যাদের থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন, আবদুর রহমান ইবনে হাস্সান, খারেজা ইবনে জায়েদ, যিনি মদীনা মুনাওয়ারার সাতজন ফকীহ্ এর অন্যতম ছিলেন ওস্তাদ আবুল মনসুর জুহুরী থেকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব,

ইবনে আবী রেবাহ্, শা'বী এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল আতিক খলীলী উদ্ধৃতি দিয়েছেন আবদুল আযীয ইবনে মাজেশুন থেকে। তিনি বরবত বাজানোর অনুমতি প্রদান করতেন। ইবনে সেমআলী এরকম বলেছেন তাউস সূত্রে।

ইব্রাহীম ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন তিনি খলিফা হারুনর রশীদের কাছে যেয়ে বললেন, আউদ (বরবত) নিয়ে আসা হোক। খলিফা বললেন, জ্বালানোর আউদ (লাকড়ি) আনাবো, না বাজানোর আউদ (বরবত)? তিনি বললেন, বাজানোর আউদ। অতঃপর খলিফা বরবত বাদ্যযন্ত্র আনালেন। ইব্রাহীম ইবনে সা'দ তা বাজিয়ে শোনালেন এবং বরবত বাজানো যে জায়েয, সে বিষয়ে ফতওয়াও দিলেন। আল্লামা ফাকেহী 'তারিখে মক্কা' নামক গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব সনদে মুসা ইবনে গুররাহ আলজামুহী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন আতা ইবনে আবু রেবাহকে ডাকলেন। তিনি এসে সেখানে কিছু লোককে বরবত বাজাতে এবং সংগীতে রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। লোকেরা তাঁকে দেখে গান বাজনা বন্ধ করে দিলো। তিনি বললেন, তোমরা যদি বরবত না বাজাও, আর যে গাইছিলো সে যদি না গায়, তাহলে আমি এখানে বসবো না। অতঃপর গজল ও বাজনা হলো। তিনি সেখানে বসে তা উপভোগ করলেন।

'আমতা' রচয়িতা বরবত বাদ্যযন্ত্রকে মূলভিত্তি হিসাবে সাব্যস্ত করে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের বিধান কিয়াস করেছেন। বলেছেন, বরবত যন্ত্রের বাজনা কবীরা গোনাহ, না সগীরা এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। হারামের প্রবক্তাগণের মধ্যে শেষ যুগের শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে তা সগীরা গোনাহ্। কথাগুলো বর্ণিত গ্রন্থ থেকে সংকলিত। আর এ সংকলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো সুফী জামাত যদি এ জাতীয় কথার উদ্ধৃতি দেন, তাহলে যেনো তাঁদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয় এবং 'জাহেল' বলে যেনো তাঁদেরকে গালি দেওয়া না হয়। বাড়াবাড়ি যেনো না করা হয় একথা বলে যে, তিনি অসৎ, অথবা পথভ্রষ্ট। এরূপক্ষেত্রে যেনো কাওমের দোষত্রুটি গোপন রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়। জনসাধারণকে ফেৎনা থেকে রক্ষা করার কথা ভাবা উচিত। 'ফালহাক্কুল্ল আহাক্কু আই ইউত্তাবাআ' (সত্যই হচ্ছে সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য)। ওয়াল্লাহু আ'লাম। (গ্রন্থকার নিজের দিকে ইঙ্গীত করে বলছেন) এ দুর্বল ব্যক্তি এ মাসআলাটির ব্যাপারে বিভিন্নস্থানে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানেই বিস্তারিত আলোচনা, প্রতিপক্ষের দাবীর খণ্ডন এবং এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা গ্রহণের নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। হারাম ও মাকরুহের দিকেই আমার ঝোঁক ছিলো। কিন্তু এই গ্রন্থে বিভিন্ন মনীষীর উক্তির উদ্ধৃতি প্রদানের দ্বারা বিষয়টির মোবাহ হওয়ার দিকটিই প্রবল হয়ে গিয়েছে। তার কারণ এই যে, হারাম ও মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি আমার মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত। তাই এ কথা প্রমাণের জন্য কোনো উদ্ধৃতি উপস্থাপনের প্রয়োজন আমি অনুভব করিনি। 'হে আল্লাহ্ আমাদিগকে সত্যকে সত্য রূপেই দেখিয়ে দাও এবং তা অনুসরণ করার তওফীক দাও। আর অসত্যকে দেখাও অসত্যরূপে এবং তা পরিহার করার তওফীক দাও'।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতলোক সেমার বৈধতার দিকে কথা ও কর্মের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছেন এবং যাঁরা তা অস্বীকার করেছেন, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁদের সকলের বক্তব্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবু মাসউদ আনসারী, যাঁকে একজন বদরী সাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়, আর গণ্য করার কারণ এ-ও হতে পারে যে, তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, অথবা বদরেই তাঁর বাসস্থান ছিলো, তিনি একবার অন্য একজন সাহাবীর সঙ্গে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। ওই সাহাবী গাইছিলেন, আর হজরত আবু মাসউদ আনসারী শুনছিলেন। এমন সময় আরেক জন সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর খারাপ লাগলো, তাই আপত্তি করলেন। বললেন, আপনারা দু'জন রসুল স. এর সাহাবী, অথচ আপনারা গান শুনছেন? তিনি বললেন, তোমার যদি মন চায়, তবে তুমিও শুনতে পারো। আমাদের সঙ্গে বসে যেতে পারো। অথবা এখান থেকে চলেও যেতে পারো। আমাদেরকে রসুলুল্লাহ স. সেমার অনুমতি দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিলো একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের। আর বিয়ের অনুষ্ঠানে সেমা করা সকলের মতেই মোবাহ। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর তো এ দু'জনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তো রীতিমতো সেমার অনুরাগী ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়াও ছিলেন অনুরূপ। তাঁদের দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বও ছিলো। একবার হজরত আমীর মুয়াবিয়ার স্ত্রী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরকে বললেন, মুয়াবিয়ার অবস্থা তো জানোই। কিন্তু তুমি কিরূপে তার মতাবলম্বী হলে? আর একদিন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর হজরত মুয়াবিয়ার গৃহে আগমন করলেন। তিনি সেদিন সেখানে অনেকক্ষণ ধরে নামাজ আদায় করলেন। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর স্ত্রীকে বললেন, দ্যাখো, সে কি করছে। এরপর থেকে হজরত মুয়াবিয়ার স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু বলা বন্ধ করে দিলেন।

প্রকৃত অবস্থা এবং মতানৈক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, গান শোনা এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানো প্রাচীন যুগ থেকে ধর্মে উদাসীন, স্বেচ্ছাচারী, ফাসেক, শরাবখোর এবং খেলতামাশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের কাজ ছিলো। সে পরিপ্রেক্ষিতেই সহীহ্ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই মর্মে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, খেলতামাশা স্বরূপ যে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, তা যেনো ধ্বংস করা হয়। আর শরাব পান ও যেনা থেকে মানুষকে দেওয়া হয় বাধা।

মূলতঃ গান মানেই খেলতামাশা। অর্থাৎ তাকে হাসি-তামাশার মধ্যে গণ্য করা যায়। সুতরাং গান থেকে যদি হাসিতামাশা বা নিছক আনন্দ-ফূর্তিকে দূর করে দেওয়া যায়, আর নিষিদ্ধ ও মাকরুহ বিষয়সমূহ সরিয়ে দেওয়া যায়, যা গান বাজনার সাধারণ রীতি, তবে পুণ্যবান মুসলমানগণ এ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। ফাসেকী ও অপছন্দনীয় কাজের মিশ্রণ এবং ফাসেক ও অনাচারী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়াই গজল থেকে আত্মিক স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। অপর এক

দল আলেম দেখলেন, এই গান বাজনা বাধা-বন্ধনহীন, উদ্দাম এবং ফাসেক লোকদের স্বভাব, তাই তাঁরা আশংকা করলেন, গান বাজনার মাধ্যমে মানুষ ওই সকল ফাসেক লোকদের স্বভাব-চরিত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। তাই তাঁরা গান-বাজনা-গজল-সেমা থেকে দূরে সরে রইলেন। গোনাহ'র সম্ভাবনা আছে বলে তাকে ভয়ও করতে লাগলেন। শরিয়তপ্রবর্তক স. যদি এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন, সতর্কবাণী উচ্চারণ করে থাকেন, তাহলে তা হবে খুবই ন্যায়সঙ্গত। মুহাদ্দেছীনে কেরাম বলে থাকেন, শরিয়তপ্রবর্তক থেকে গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কথার দ্বারা নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ব্যাপারে কোনো সহীহ্ হাদিস পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের কথা প্রত্যাখ্যান না করেও এতটুকু বলা চলে যে, এ ব্যাপারে মুহাদ্দেছীনে কেরাম সহীহ্ হাদিসের যে সংজ্ঞা বা পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন, তা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মুহাদ্দেছীনে কেরামের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরাব পান, যেনা করা ইত্যাদির ব্যাপারে যেরূপ নিষিদ্ধতা আছে, গান-বাজনার ব্যাপারে সেরূপ নিষিদ্ধতা নেই। আর আহলে জাওয়াহেরগণ যদি বলে থাকেন যে, এ ব্যাপারে কোনো হাদিসই নেই, তবে তা হবে হঠকারিতামূলক। গান-বাজনার বিষয়টির উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ওই সকল পানপাত্রের মধ্যে, যেগুলির মাধ্যমে মদ্য পান করা হতো। যেমন খাস, ফারকাত, নকীর, দুব্বা ইত্যাদি। মদ্যপান যখন হারাম করে দেওয়া হলো, তখন কিছুকাল পর্যন্ত ওই সব পানপাত্র ব্যাবহার, তার মাধ্যমে অন্য কিছু পান করাও হারাম করে দেওয়া হলো, যেনো মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও অভ্যাস থেকে মদ্যপানের স্মৃতি চিরতরে দূর হয়ে যায়। সবশেষে যখন মানুষের অভ্যাস ও চিন্তা থেকে মদ্যপানের আকর্ষণ চলে গেলো, তখন ওই পানপাত্রগুলো ব্যবহারের নিষিদ্ধতা উঠিয়ে দেওয়া হলো। বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়ে গেলো। তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল মত পোষণ করলেন, এগুলো ব্যবহারের নিষিদ্ধতা এখনো বলবৎ রয়েছে। আর আরেক দল বললেন, এগুলোর ব্যবহার পরবর্তীতে বৈধ করা হয়েছে। গজল, সংগীত ও সেমা'র বিষয়টিও তদ্রূপ। এ বিষয়েও আলেমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। একদল গান-বাজনার পূর্বপ্রচলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, এগুলি পথভ্রষ্ট ও অনাচারীদের কাজ। তাঁরা সাবধানতার দিকটিকেই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় দল বাস্তব অবস্থা এবং গান-গজলের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে তা ভালো বলে বিবেচিত হলে বৈধ হবে বলে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ গান-গজল-সেমার মধ্যে ফাসেকী, অনাচার এবং শরিয়তবিগর্হিত কিছু থাকলে তা হারাম হবে। আর এরূপ না থাকলে তা হবে মোবাহ। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

নিষিদ্ধতার দাবীদার আলেমগণ গান, বাজনা, গজল, সেমা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং কঠোরতার নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যখন গান,

বাজনা, গজল, সেমাকারীদেরকে ফাসেক কাফের যিন্দিক ইত্যাদি বলতে লাগলেন, তখন এর বৈধতার দাবীদারগণ একে বিশেষ নেকীর কাজ বলে সাব্যস্ত করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এহেন কাজে স্বয়ং মশগুল রইলেন এবং অন্যদেরকেও মশগুল করতে প্রায়াস চালালেন। এ নিয়ে দু'পক্ষই একে অপরকে যোগ্য অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করতে লাগলেন। ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার ধার আর ধারলেন না। আদবের রীতি, যা প্রত্যেক জিনিসকে সীমার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়, তার প্রতিও তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। মতানৈক্য করার কারণ তো হচ্ছে, সংগীত, গজল, সেমা এর দ্বারা বাতেন জগতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়— তাঁরা তা অনুভব করেছেন এবং নিজেরা তাতে মত্ত হয়েছেন। আর অপর দল ফকীহগণের জায়েয নাজায়েযের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং স্বস্থানে রয়েছেন অনড়।

শায়েখ ইবনে আরাবী বলেছেন, সংগীতের প্রতিক্রিয়া হয় প্রাণীকুলের আত্মার উপরে। প্রাণীকুলকে আন্দোলিত করাই সংগীতের কাজ। কিন্তু মানবাত্মা এ থেকে পবিত্র। কেননা মানবাত্মা আধ্যাত্মিকতাব আধার। স্থিরতা ও বলিষ্ঠতা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এস্থানে (পৃথিবীতে) এ কথা বলার কারই বা অধিকার আছে যে, সংগীতের প্রতিক্রিয়া মানবাত্মার উপরে হবে না। মানুষও তো অন্যান্য প্রাণীর মতো মহাপ্রকৃতির অংশ। শায়েখ ইবনে আরাবী আরও বলেছেন, কোরআন তেলাওয়াতের প্রতিক্রিয়া যে অন্তর্জগতে পড়ে, তার অনেক আলামত আছে। যেমন সুরসহ পাঠ এবং সুরবিহীন পাঠ উভয়েরই কাজ মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। শুধু সুরের কারণে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা কোরআনের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং তাহচ্ছে সুরের প্রতিক্রিয়া। আর সুর লৌকিকতামুক্ত নয়। অবশ্য সুর কোরআনের অলংকার। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা সুমিষ্ট আওয়াজের মাধ্যমে তোমাদের কোরআন পাঠকে সুসজ্জিত কোরো। বলাবাহুল্য, সুরেলা পাঠ এবং সুরবিহীন পাঠের একইরকম প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তির নিকট নিছক আল্লাহ্‌পাকের জাত ও সিফাতের কাশফ ও শুহুদ আছে, তার বেলায় উভয় অবস্থা সমতুল।

'আল আমতা' রচয়িতা বলেছেন, আরব দেশে সর্বপ্রথম সংগীত চর্চা কে করেছিলো, তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে আবু বেলাল আসকারী বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে প্রথম প্রচলনকারী লোকটির নাম ছিলো তুওয়ায়াস। আর সে সংগীত শুরু করেছিলো এভাবে— যখন ইবনে যোবায়ের কাবাগৃহের মেরামতের কাজ করছিলেন, তখন পারস্য ও রোম থেকে সুকণ্ঠের অধিকারী শ্রমিকেরা সেখানে গান গাইতে শুরু করলো। আরবের লোকেরা তখন গানগুলোকে আরবীতে সংকলন করে নিলো। কাজটি সর্বপ্রথম করেছিলো তুওয়ায়াস। তাকে সায়গুমও বলা হতো, যার অর্থ অমঙ্গল। তাকে এভাবে ডাকার কারণ হচ্ছে— লোকটির জন্ম হয়েছিলো ওই দিন, যে দিন রসুল স. এর মহাতিরোধান ঘটেছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মহাপ্রয়ানের দিন তাকে

দুধ ছাড়ানো হয়েছিলো। হজরত ওমরের মহাপ্রস্থানের দিন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলে। হজরত ওসমানের অন্তিমযাত্রার দিন সে বিবাহ করেছিলো। হজরত আলীর পৃথিবী পরিত্যাগকালে সে হয়েছিলো তার প্রথম সন্তানের জনক। কথিত আছে, রোম ও পারসীয়দের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে আরব দেশে সংগীত বলতে ছিলো এক প্রকারের মিষ্টি সুর। অর্থাৎ মিষ্টি সুরে কোনো কিছু বলাকেই বলা হতো সংগীত। যেমন নসব, নাশীদ, আ'রাব, হুদা, আনতাব ইত্যাদি। এগুলোর সবই মোবাহ। এ ব্যাপারে কারও কোনো মতভেদ নেই। সংগীত বা গজলকে যাঁরা হারাম বলেন, তাঁরা সংগীতবিদ্যার বিভিন্ন নিয়মনীতি বা স্বরলিপি অনুসারে যে সংগীত গাওয়া হয়, তাকেই বুঝিয়ে থাকেন। সাহাবা কেরাম, তাবেঈন এবং সলফে সালেহীনদের থেকে সংগীত করার যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে ওই সংগীত বা গজল, যা সংগীতবিদ্যাসম্ভূত নয়। প্রাচীন যুগ থেকে আরব দেশে নসব, নাশীদ, হুদা ইত্যাদি গাওয়ার প্রচলন ছিলো। তাঁরা তাই গাইতেন। কোনো কোনো সাহাবী, যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি তাঁর বাঁদী থেকে সংগীত শুনেছেন। এমনকি কোনো কোনো গায়িকা থেকেও সংগীত শুনেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ওই সংগীত ছিলো কেবল সুন্দর সুর— সংগীতবিদ্যাসম্ভূত কোনোকিছু নয়।

সেমা, গজল বা সংগীতের বিষয়টি একটি মতানৈক্যমণ্ডিত মাসআলা। এ মাসআলার পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরকে দোষারোপ করা ও ছিদ্রান্বেষণ করা উচিত নয়। প্রত্যেককে আপন আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত। উচিত একথা মনে রাখা যে— তোমাদের মধ্যে শরিয়তে সর্বাধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত কে, তা তোমাদের রবই ভালো জানেন। ওয়াল্লহু আ'লামু বিস্‌সওয়াব। সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আউলিয়ায়িহি আজমাঈন।

সপ্তম প্রকার ঃ পানাহার

পানাহার ইহকালীন জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া ইবাদত-বন্দেগী করা অসম্ভব। তাই ইবাদতকারীদেরকে প্রয়োজন মতো খাদ্যগ্রহণ করতেই হয়। লোভ থেকে দূরে থাকাও অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্য কামনা-বাসনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত যেনো না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. সারা জীবনে কখনও উদরপূর্তি করে আহার করেননি। আতা বলেছেন, পেটভরে আহার করা এমন একটি বেদাত, যা করণে আউয়াল বা সাহাবা কেরামের যুগের পর সৃষ্টি হয়েছিলো। ইমাম নববী এবং ইবনে মাজা এরকমই বর্ণনা করেছেন। হাকেম হজরত মেকদাদ ইবনে মাদিকরবের ওই হাদিসকে সহীহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আদমসন্তান আপন পেটের চেয়ে মন্দ আর কোনো কিছুই পূর্ণ করে না। অথচ

তার জন্য ওই লোকমাটুকুই যথেষ্ট, যা গ্রহণ করলে সে তার মেরুদণ্ডের হাড়কে সোজা রাখতে পাবে। যদি সে অধিক আহার করতেই চায়, তাহলে পেটকে তিনভাগ করে এক ভাগ খাদ্য, আর এক ভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করবে। অবশিষ্ট এক ভাগকে খালি রাখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, মুসলমান এক আঁতে, আর কাফের সাত আঁতে খাবার গ্রহণ করে। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, মানুষের মধ্যে সাতটি আঁত থাকে—১. পাকস্থলী; আর পাকস্থলীর কাছে থাকে আরও তিনটি আঁত। সেগুলি হচ্ছে—২. বাওয়াব, ৩. সায়েম ৪. রাকীক। অন্য তিনটি আঁতের নাম— ৫. আওয়ার ৬. কুলুন এবং ৭. মুস্তাকীম। মুস্তাকীম হচ্ছে মলদ্বারের আঁত। আর এর নিকটেই রয়েছে গুহ্যদ্বার। মুসলমানগণ এক আঁতে, আর কাফেররা সাত আঁতে আহার করে— কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানগণ স্বল্প আহার কবে, আর কাফেরেরা আহার করে অধিক মাত্রায়। প্রকৃতপক্ষে আঁতের সংখ্যা নিরুপণ করা বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা, মুসলমানগণ আহার করে ইবাদতের শক্তিপ্রাপ্তির জন্য। কেননা তারা জানে, আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করা হয় এবং ইবাদতের শক্তি লাভ হয়। অর্থাৎ শরীরপালন করাই পানাহারের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই একজন মুমিন-মুসলমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করে না। যারা করে, তাদের উদ্দেশ্য থাকে শরীরপালন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ। তাদের অবস্থা মুসলমানদের বিপরীত। তবে এক্ষেত্রে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, সকল মুমিন-মুসলমান আর সকল কাফের একরকম নয়। এমন তো হতে পারে যে, একজন মুমিন-মুসলমান তার স্বভাব অনুসারে অথবা শারীরিক কোনো কারণে, কিংবা কোনো ব্যাধির কারণে অধিক খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আবার একজন কাফেরও স্বল্পাহারী হতে পারে পাকস্থলির দূর্বলতার কারণে, অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে, কিংবা ধর্মযাজকদের পদ্ধতিতে সাধনা করার কারণে। আলেমগণ বলেন, যে ব্যক্তির চিন্তাশক্তি প্রবল, সে স্বল্প আহার করে, আর তার মন থাকে কোমল। আর যে ব্যক্তির চিন্তাশক্তি কম, সে আহার করে অধিক। সে হয় কঠিন মনের মানুষ। তাঁরা আরও বলেন, যে ব্যক্তির উদর পূর্ণ থাকে, তার মধ্যে হেকমত ও জ্ঞান সৃষ্টি হয় না। যে ব্যক্তির উদর খাদ্যে পূর্ণ থাকে না, সে পান করে কম এবং তার নিদ্রাও হয় কম। তার আয়ুতে রহমত হয়। আব যে ব্যক্তি বেশী নিদ্রা যায়, তার আয়ুতে বরকত হয় না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লহ স. বলেছেন, ভোজনবিলাসীরা আখেরাতে অভূক্ত থাকবে। মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ কখনও উদর পূর্তি করে আহার করেননি। আর তিনি পরিবার পরিজনের কাছে এলে তাদের কাছে খাবার চাইতেন না। আহারের আকাংখাও প্রকাশ করতেন না। তাঁরা খাবার হাজির করলে তিনি আহার করতেন। আর যা

কিছুই তাঁর সামনে উপস্থিত করা হতো, তাই তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করতেন। যা পান করতে দেওয়া হতো, তাই পান করতেন। বিদ্বানগণ বলেন, উদরপূর্তি করে পানাহার না করার মানে হচ্ছে এমন অধিক আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, যদ্দরুন ইবাদতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শরীরে আসে অলসতা এবং অধিক নিদ্রা। তাই উদরপূর্তি করে আহার করা মাকরুহ্। কখনও কখনও তা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে স্বাভাবিক পরিমাণে পেট ভরে আহার করা মাকরুহ নয়। তার দলিল ওই হাদিস, যা সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— একবার রসুল স. ক্ষুধার্ত অবস্থায় হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে এক আনসারী সাহাবীর ঘরে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি বকরী যবেহ করে মেহমানদারী করলেন। সকলেই আহার করলেন এবং আহার করলেন পেট ভরে। শায়েখ মুহিউদ্দীন বলেন, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, স্বাভাবিক পরিমাণে পেটভরে আহার করা জায়েয। আর যে সকল হাদিস দ্বারা পেটভরে আহার করা মাকরুহ সাব্যস্ত হয়েছে, তার অর্থ হবে— সব সময় পেটভরে আহার করা মাকরুহ।

হজরত আবু হুরায়রা বলেন, রসুল স. এর পরিবারবর্গ কখনও তিনদিন একাধারে পেটভরে আহার করেননি। বোখারী ও মুসলিম। হাদিসখানির দু'টি অর্থ হতে পারে— ১. রসুল স. একাধারে তিনদিন পেট ভরে আহার করেননি। করলেও করেছেন পেট না ভরে। ২. একাধারে তিনি স. তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত থাকতেন। প্রকাশ্য অর্থ হিসেবে দ্বিতীয়টিই গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দিয়ে এরকম বহু রজনী অতিবাহিত হয়ে যেতো, যে রাতগুলোতে খাবার বলতে কিছুই মিলতো না। অথচ তাঁদের খাদ্য ছিলো যবের রুটি। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ স. এর বংশধরগণ একাধারে দু'দিন গমের রুটি দ্বারা পেট পুরে আহার করেননি। সে দু'দিনের মধ্যে একদিনের খাবার হতো খেজুর। জননী আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রসুল স. পৃথিবী থেকে এমতাবস্থায় বিদায় নিয়ে গিয়েছেন যে, একদিনও দু'রকম খাদ্য গ্রহণ করেননি। খেজুর খেলে যবের রুটি খেতেন না। আবার যবের রুটি খেলে খেজুর খেতেন না।

হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালার শপথ! মোহাম্মদের বংশধরগণের কোনো দিন এক সা খাদ্য ঘরে থাকা অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হয়নি। অথচ তাঁর ঘর ছিলো নয়টি। হাসান বসরী বলেছেন, তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ্র দেওয়া রিজিকের অভাব তাঁর ছিলো। বরং তাঁর একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মত যেনো তাঁর এই আদর্শটির অনুসরণ করে। জননী আয়েশা সিদ্দীকা জানিয়েছেন, রসুল স.

বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠের তিনটি জিনিস আমার প্রিয়— ১. সুগন্ধি ২. নারী ৩. আহার্য। প্রথম দু'টির প্রাচুর্য তাঁর ছিলো। কিন্তু তৃতীয়টির ছিলো না। তিরমিজি তাঁর 'শামায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত নোমান ইবনে বশীর বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স.কে দেখেছি, তাঁর জীবদ্দশায় দকল নামক খাবার এতো পরিমাণ থাকতো না, যদ্দ্বারা তিনি পেটভরে আহার করতে পারেন। দকল এমন এক প্রকারের খাবার, যা খেজুরের সঙ্গে অন্য কোনো খাবার মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ওই সময়ের দরিদ্ররা সাধারণত এ রকম খাবার গ্রহণ করতো। জননী আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমরা রসুল স. এর এমন আহলে বাইত, যাদের ঘরে কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত (খাবার তৈরীর জন্য) আগুন জ্বালানো হতো না। তখন খেজুর ও পানি ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো খাবার মিলতো না। আর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, দু' দু'মাস আমাদের এভাবে অতিবাহিত হয়ে যেতো। আমাদের কোনো কোনো আনসারী প্রতিবেশী তখন আমাদের জন্য দুধ পাঠিয়ে দিতো। আর আমরা তা সকলে মিলে পান করতাম। তিনি স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাস্তায় আমার জীবনে এমন দুঃখ-কষ্ট এসেছে, যা অন্য কারও জীবনে আসেনি। আর আল্লাহ্র দ্বীনের পথে আমাকে এতো কষ্ট প্রদান করা হয়েছে, যে কষ্ট অন্য কেউ ভোগ করেনি। নিশ্চয়ই আমার এবং বেলালের দিন-রাত্রি এমনিভাবে অতিবাহিত হতো যে, আমাদের নিকট এমন খাবার থাকতো, যা হতে পারতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর খাবার। বেলাল তার বগলে চেপে যা আনতে পারতো, তাই হতো আমাদের আহার্য। তিরমিজি একথা বর্ণনা করার পর বলেছেন, হাদিসটি যথার্থসূত্রবিশিষ্ট।

কোনো কোনো যুদ্ধে সাহাবা কেরামের অবস্থা এরকম হতো যে, তাঁরা গাছের পাতা-লতা আহার করতেন। এমতাবস্থায় তাঁদের কণ্ঠনালী জখম হয়ে যেতো। তিনি স. কখনও চাপাতি এবং ময়দার রুটি আহার করেননি। তাঁর জামানায় তো ময়দার আটার প্রচলনই ছিলো না। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' প্রণেতা লিখেছেন, রসুল স. ছোট ছোট রুটি আহার করতেন, না আহার করতেন বড় বড় রুটি, সেকথা আমি কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাইনি। কোনো কোনো বর্ণনায় কেবল এসেছে এই কথাটুকু— তোমরা ছোট রুটি বানিয়ো। কেননা ছোট রুটিতে বরকত বেশী। হাদিসটির সূত্রপরম্পরা শিথিল। রসুল স. এর প্রিয় ব্যঞ্জন ছিলো সিরকা। তিনি স. বলেছেন, সিরকা কতইনা উত্তম ব্যঞ্জন।

জেনে রাখা উচিত যে, রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণের জীবনের যে অনটনের কথা উল্লেখ করা হলো, তা সার্বক্ষণিক ছিলো না। আর সকল সাহাবী দরিদ্রও ছিলেন না। আর তাঁদের অনাড়ম্বর আহারাভ্যাস দারিদ্রের কারণেও ছিলো না। তাঁদের ক্ষুৎপিপাসার মূলে ছিলো পৃথিবীপ্রসক্তিহীনতা। আবার উদরপূর্তি করে আহার করাকে তাঁরা অপছন্দও করতেন। একাধারে একমাস পর্যন্ত আহার না

করার বিষয়টি ছিলো পরিস্থিতিগত। তাঁদের এরকম অবস্থা ছিলো হিজরতের পূর্বে। হিজরতের পর তাঁদের জীবনে এসেছিলো স্বচ্ছলতা। মদীনায় এসে তাঁরা পেয়েছিলেন উন্নত আবাস, উত্তম আহার্যসম্ভার, হাদিয়া, বাগ-বাগিচা এবং ফসলের জমি। তাঁদের অনেকেই তাঁদের ধনসম্পদ রসুল স. এর জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। যেমন— হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত তালহা, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)।

একদিন রসুল স. সাহাবীগণকে সম্পদদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতে বললেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর সমস্ত সম্পদ রসুল স. এর খেদমতে হাজির করলেন। হজরত ওমর হাজির করলেন অর্ধেক সম্পদ। তিনি স. জায়শে আসরাত এর সময় ধনী সাহাবীগণকে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করলেন। তখন হজরত ওসমান হাজির করলেন এক হাজার সুসজ্জিত উট। উল্লেখ্য, হজরত ওসমান তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য এক বৎসরের খাদ্য জমা করে রাখতেন। হজরত ওমর একবার হজ্বের সময় একশ উট নিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং সেগুলো তিনি যথাসময়ে কোরবাণী করে তার গোশত দিয়ে নিরন্নদেরকে আহার করিয়েছিলেন। বাহরাইন থেকে একলক্ষ দিরহাম হাদিয়া এসেছিলো। সেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। হাওয়াজেন ও হুনাইন থেকে এসেছিলো অসংখ্য উট-বকরী, স্বর্ণ-রৌপ্য। রসুল স. সেগুলোর সবই বন্টন করে দিয়েছিলেন। মোটকথা, প্রাচুর্য হাতের মুঠোয় এসে পড়লেও তিনি তা অবলীলায় পরিত্যাগ করতেন। পছন্দ করতেন দারিদ্রকে। যেমন হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বোতহা এবং মক্কার পাহাড়সমূহকে আমার জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি তা গ্রহণ করতে সম্মত হইনি। বলেছি, হে আমার প্রভুপালক! আমি যদি পেটভরে আহার করতে পারি, তা হলে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, আর যদি অভুক্ত থাকি, তবে বর্ণনা করবো তোমার প্রশংসা । হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন রসুল স. এবং জিব্রাইল সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এমন সময় এক ভয়ানক আওয়াজ উত্থিত হলো। রসুল স. ভীত হলেন। বললেন, ভ্রাতা জিব্রাইল! এই বিকট আওয়াজটি কিসের? কিয়ামত কি শুরু হয়ে গিয়েছে? জিব্রাইল বললেন, না। আপনার প্রভুপালনকর্তা ইস্রাফীলকে আদেশ করলেন, অবতরণ করো। কুঞ্জিকা গ্রহণ করো। তাই তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি বলছেন, আমি যেনো আপনাকে বলি, তেহামার পাহাড়কে কি আপনার অনুগত করে দিবো? পাহাড়ের পাথরগুলোকে কি পরিণত করে দিবো যমরুদ, ইয়াকুত ও স্বর্ণ-রৌপ্যে? অন্য এক হাদিসে এসেছে, জিব্রাইল বললেন, আপনার প্রভুপ্রতিপালক বলছেন, আপনার মহত্ত্ব-মর্যাদা এবং পুণ্যসমূহ সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও কি আপনার জন্য পাহাড়কে স্বর্ণসম্পদে

রূপান্তরিত করে দিবো? জিব্‌রাইল আরো বললেন, হে রসুলপ্রবর! আপনি কী হতে চান? বাদশা নবী? না বান্দা নবী? অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় তাঁর এক গোলাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি বাদশাহী বেছে নিন, যাতে কিছুদিন আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করতে পারেন। জিব্‌রাইল ইশারা করলেন তার বিপরীত। অর্থাৎ ইঙ্গিতে তিনি বোঝালেন, বিনয়াবনতাই উত্তম। সুতরাং বান্দা নবী হওয়ার অভিপ্রায়কেই তিনি যেনো গ্রহণ করেন।

রসুলেপাক স.কে দরিদ্র বলে বিশেষিত করাটাকে আলেমগণ পছন্দ করেন না। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা ও হালীমী শো'বুল ইমান থেকে উৎকলিত করে বলেছেন, রসুলেপাক স.কে সকল উত্তম গুণ দ্বারা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু যে সকল বিশেষণ দ্বারা দুর্বল, অক্ষম ও মিসকীন বুঝানো হয়, সেগুলো দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। এরূপ বলা যাবে না যে, তিনি ফকীর ছিলেন, তিনি দরিদ্র ছিলেন। কোনো কোনো আলেম তো তাঁর শানে 'যুহুদ' শব্দ ব্যবহার করতেও মানা করেছেন। 'নসরুদ্দার' রচয়িতা মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন তাঁর সামনে একজন বললো, অমুক ব্যক্তি একজন যাহেদ (দুনিয়ার প্রতি অননুরাগী)। তখন তিনি বললেন, তার দুনিয়ার ধন-দৌলত কী পরিমাণ আছে যে, তার মধ্যে থেকে সে অননুরাগী হবে? ঘটনাটি কাযী আয়াযও তাঁর 'শিফা' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। শায়েখ তকীউদ্দীন সুবকী তাঁর 'আসসায়ফুর মাসলুল' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, স্পেনের ফকীহ্‌গণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই মর্মে ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং শূলিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে, যে ব্যক্তি মুনাযারা স্থলে রসুলে পাক স. এর মর্যাদাকে লঘু করবে এবং তাঁকে এতিম বলে আখ্যায়িত করবে এবং এরকম বলবে যে, তাঁর 'যুহুদ' জরুরী ছিলো। ইচ্ছা করে তিনি যুহুদ গ্রহণ করেননি বরং বাধ্য হয়েই তাঁকে যুহুদ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। তিনি যদি ভালো ভালো খাবার পেতেন, তাহলে তাই গ্রহণ করতেন (আল্লাহ্‌পাক এরকম অপবচন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

এক ঘটনায় বলা হয়েছে, এক মিশরী ব্যক্তি অপর একজনকে দোষারূপ করে বললো, তুমি কে? তোমার পিতা তো বকরী চরাতো। অপর ব্যক্তিটি বললো, আমার পিতা যদি বকরী চরিয়ে থাকেন, তাহলে তো নবীও বকরী চরিয়েছেন। এরকম বলার কারণে ওই লোকের উপর তাযীর (শাস্তি) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো আলেমগণের পক্ষ থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই লোককে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। কেননা সে নিজের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে নবী করীম স. এর সম্মান লাঘব করেছিলো। তবে হ্যাঁ, মাসআলা আলোচনার ক্ষেত্রে যদি কেউ বলেন, তিনি স. বকরী চরাতেন, তাহলে তা নাজায়েয হবে না।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের লেখক বদরুদ্দীন যারকাশী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, শেষ যুগের কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, রসুল স. কখনও ধন-সম্পদের ফকীর ছিলেন না। তবে তাঁর প্রকাশ্য অবস্থা ফকীরদের অবস্থা সদৃশ ছিলো। তিনি অন্যান্য মানুষ থেকে অনেক ক্ষেত্রে ধনী ছিলেন। পৃথিবীর সকল বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালাই যথেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলতেন— আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মিসকিনান (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মিসকিনী জিন্দেগী দান করো)। এ প্রার্থনাটির মধ্যে মুরাদদের জন্য চিত্তপ্রশান্তির উপকরণ রয়েছে। এখানে 'মিসকিনী' দ্বারা ওই মিসকিনীকে বুঝানো হয়নি, যা অর্থ-বিত্তের অভাবে হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে একটি কথা বেশ সুবিদিত। তা হচ্ছে রসুলে পাক স. বলেছেন, দারিদ্র আমার অহংকার, আমি এতে গর্ববোধ করি। শায়েখুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হাদিসটি মওজু। আল্লাহ্ই উত্তমরূপে অবগত। ফায়েদা— কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজের পবিত্র পেটে পাথর বাঁধতেন। সাহাবা কেরামও এরকম করতেন। হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন রসুলুল্লাহ্ ক্ষুধা অনুভব করলেন। তখন তিনি স. একখণ্ড পাথর পবিত্র পেটের উপর স্থাপন করে বললেন, শোনো। বহু লোভী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে সম্পদ ভোগ করবে, কিন্তু আখেরাতে তারা থাকবে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ। আরো শোনো। বহুসংখ্যক এমন লোক আছে, যারা নিজের নফসের বাহাদুরী করে, নিজেকে সম্মানিত ভাবে এবং দম্ভপ্রদর্শন করে। অথচ তার নফস তাকে করে অবজ্ঞা। আবার এমন লোকও আছে, যারা নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করে, অথচ নফস তাকে সম্মান করে। ইবনে আবিদ দুনইয়া এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত তালহা থেকে হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রসুলুল্লাহ্‌র কাছে ক্ষুধার অনুযোগ করলাম। আমাদের পেটে বাঁধা পাথর খুলে দেখালাম। তিনি স. তাঁর পবিত্র উদর দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, তাঁর উদরে বাঁধা আছে দু'টি পাথর। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। আবু তালহা বলেছেন, হাদিসখানি আমার জানা নেই। তবে এ ধরনের হাদিস হজরত জাবের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি ছিলো খন্দকের যুদ্ধের সময়ের। হজরত জাবের বলেন, আমি খননকর্মের সময় রসুল স.কে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখলাম। তখন তাঁর পবিত্র পেটের উপর পাথর বাঁধা ছিলো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, আবু হাতেম ইবনে হেব্বান পেটের উপর পাথর বাঁধা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ অস্বীকার করেছেন। বলেছেন বর্ণনাগুলো সঠিক নয়। তিনি সওমে বেসালের হাদিস দ্বারা তাঁর পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। রসুল স. বলেছেন, আমার প্রভুপালক আমাকে পানাহার করান। তিনি বলেন, সওমে বেসালের সময় যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পানাহার করিয়ে থাকেন,

তাহলে তিনি স. ক্ষুধার্ত থাকবেন কেনো? পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনই বা পড়বে কেনো? তিনি আরও বলেন, ক্ষুধার সময় পাথর বাঁধলে ক্ষুধার উপশম হয় না। এতে অন্য কোনো উপকারও নেই। ইবনে হেব্বান বলেন, হাজার (পাথর) শব্দটির 'রা' বর্ণের স্থলে 'যা' হবে। আর 'হাজায' যার অর্থ— কোমরবন্ধনী, ক্ষুধার সময় পেটকে শক্ত করে বাঁধার জন্য যা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকের লেখক বলেন, ক্ষুধার সময় পেটে পাথর বাঁধা সংক্রান্ত হাদিস বিশুদ্ধ। পাথর বাঁধলে ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। ক্ষুধা পেলে পাকস্থলী অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যায়। খাবার গ্রহণ করার পর ওই উত্তাপ খাদ্যদ্রব্যের দিকে ধাবিত হয়। পাকস্থলীতে খাবার না থাকলে ওই উত্তাপ দেহের জলীয় পর্দাগুলোকে দহন করতে থাকে। ওই উত্তাপে শরীর কষ্ট অনুভব করতে থাকে। তখন পেটের উপর ঠাণ্ডা কোনোকিছুর প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর উত্তাপ প্রশমিত হয়। ফলে ক্ষুধা অনুভূত হয় কম। বলা বাহুল্য, রসুল স. ক্ষুধায় কষ্ট সহ্য করতেন সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। মানুষ খাদ্যগ্রহণ করে দৈহিক শক্তি, শারীরিক লাবন্য এবং দেহের বর্ণের চাকচিক্যের জন্য। রসুল স. চাইতেন এর বিপরীত। এটা ছিলো তাঁর একটি বিস্ময়কর মোজেজা। দুনিয়াদার মানুষ তো দেহের বর্ণ, রূপ-লাবন্য ও চাকচিক্য রক্ষার জন্য সদা ব্যস্ত। তাই তারা আকর্ষণীয় ও আস্বাদপূর্ণ আহার্য্য গ্রহণ করে। নরম ও মনোহর পোশাক পরিধান করে। উপবেশন করে গদীযুক্ত ফরাশে। কিন্তু রসুল স. ওই সকলকিছু বর্জন করা সত্ত্বেও ছিলেন শক্তিমান, সুন্দর এবং লাবন্যময়। যবের রুটি, মোটা খসখসে কাপড় এবং শক্ত বিছানা, এগুলোই ছিলো তাঁর আরাম-আয়েশের সামগ্রী। তৎসত্ত্বেও তাঁর শৌর্যবীর্য, সৌন্দর্য ও রূপলাবন্য ছিলো অপরিমেয়। কেউ কেউ বলেন, সাধারণত আরব দেশের লোকের এবং বিশেষত মদীনা শরীফের লোকের অভ্যাস ছিলো, পেট খালি হলে এবং পেট ভিতরের দিকে চেপে বসতে শুরু করলে তাঁরা কষ্টকে লাঘব করার জন্য পেটের উপর পাথর বেঁধে নিতেন। রসুলেপাক স.ও সেরকম করেছিলেন, যাতে করে সাহাবীগণ জানতে পারেন, তাঁর নিকট ক্ষুধা নিবারণের মতো কোনো আহার্য নেই। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' প্রণেতা বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে, রসুল স. এরকম করতেন ইচ্ছা করে, সওয়াব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। কৃতিত্ব প্রকাশার্থে নয়। আল্লাহ্ই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত।

বান্দা মিসকীন (আবদুল হক) বলেন, ইবনে হাব্বান এর উক্তি 'আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সাথীকে সওমে বেসালের সময় পানাহার করাতেন, সুতরাং ক্ষুধা দমনার্থে পেটে পাথর বাঁধার অবকাশ কোথায়' এর উত্তরে বলতে হয়, বিষয়টি তো ছিলো কেবল সওমে বেসালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর সার্বক্ষণিক অবস্থা তো এরকম ছিলো না। তাঁর অবস্থা ছিলো বিভিন্ন রকমের। সুতরাং বুঝতে হবে, রসুল স. এর অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার হেকমত এমনভাবে সংযু ছিলো, যা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

আহার্য সামগ্রী

রসুলেপাক স. কোনো বিশেষ আহার্যবস্তুর প্রতি অতি-অনুরক্ত ছিলেন না। আবার কোনো খাদ্যকে তিনি অপছন্দও করতেন না। সকল হালাল খাদ্য তিনি স. গ্রহণ করতেন। এরকম করতেন তিনি তাঁর উম্মতের সাবলীলতা ও প্রশস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে, বৈরাগ্যের রীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে। তিনি স. মদীনাবাসীদের অভ্যাসের অনুরূপ যা কিছুই ঘরে থাকতো তা দিয়েই পানাহারপর্ব সমাধা করতেন। গোশত, সবজী, ফল, খেজুর যখন যা মিলতো তাই খেতেন। আলেমগণ বলেন, কোনো বিশেষ খাবারকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, সে খাবার যতই পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক ও উন্নতমানের হোক না কেনো। তবে তিনি স. উত্তম খাবার এবং ক্ষুধানিবারক খাবার হিসেবে মিষ্টান্ন ও মধু খুব পছন্দ করতেন। বোখারী ও তিরমিজি।

খাত্তাবী বলেছেন 'হুলুবত্বুন' বলা হয় গাঢ় মিষ্টিজাতীয় খাবারকে। সুতরাং মধুকে 'হুলুবব' বা মিষ্টান্ন বলা যায় না। কখনও কখনও মিষ্টি ফলকেও হলুবব বলা হয়। 'মিষ্টান্ন ও মধু তিনি স. পছন্দ করতেন' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, ওগুলোর প্রতি তাঁর ছিলো অত্যধিক আগ্রহ এবং মনের ঝোঁক। বরং ওগুলো জুটলে তিনি স. আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করতেন এবং যতক্ষণ স্বাদ লাগতো ততক্ষণ খেতেন। তিনি এরকম করতেন একথা বোঝাতে যে, ওগুলো তাঁর পছন্দ। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা ছা'লাবী থেকে ফেকাহ'র অভিধানগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তিনি স. হালুয়া পছন্দ করতেন। হালুয়া ছিলো খেজুর দ্বারা তৈরী এক প্রকার মিষ্টান্ন, যা তৈরী করা হতো দুধের খামীর দ্বারা। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ওসমান জিন্নুরাইনের একটি বাণিজ্যকাফেলা রসুল স. এর কাছে আগমন করলো। তারা মধু এবং আটা নিয়ে এসেছিলো। এক বিবরণে আছে, তাদের সঙ্গে ছিলো আটা, ময়দা, ঘি এবং মধু। তারা তা থেকে কিছু রসুল স. এর খেদমতে পেশ করলো। তিনি স. তাদের জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর ডেগ আনা হলো। চাপিয়ে দেওয়া হলো জ্বলন্ত উনুনে। এভাবে প্রস্তুত করা হলো হালুয়া। তারপর তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, খাও। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. চিনি পছন্দ করতেন এবং তা সদকা হিসেবে মানুষকে দান করতেন। তাহাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার এক আনসারী ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। ক্রীতদাসীরা আমন্ত্রিতজনদের সামনে বাদাম এবং চিনির পাত্র আনলো। রসুল স. এর আগে খাদ্যের দিকে হাত বাড়ানো আদবসম্মত নয় বলে সাহাবীগণ হাত বাড়ালেন না। তিনি স. বললেন, তোমরা এগুলো লুটে নিচ্ছো না কেনো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আপনি তো এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন বিয়ের অনুষ্ঠানে

(আনন্দ প্রকাশার্থে) কোনো বারণ নেই। একথা বলেই তিনি স. উপস্থিত জনদের প্রতি চিনি মেশানো বাদাম ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ সেগুলোকে লুফে নিতে লাগলেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে লুটে নেওয়া অর্থাৎ কড়াকড়ি করে খাওয়া মাকরুহ না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম তাহাবী এই হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মাজহাবও বিষয়টিকে সমর্থন করে। তবে ইমাম বায়হাকী একে সমর্থন করেননি। বরং তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম তাহাবীকে কাড়াকাড়ি করে খাওয়ার প্রবক্তা হিসেবে দোষারূপ করেছেন। বান্দা মিসকীন (গ্রন্থকার) বলেন, হজের কোরবানীর গোশতও কাড়াকাড়ি করে নেওয়ার বিধান রয়েছে। এটিও ইমাম আবু হানিফার মতের স্বপক্ষের একটি দলিল। রসুল স. ছাগলের গোশত খেতেন। তবে তাঁর গরুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টত কিছু জানা যায়নি। তবে এক হাদিসে এসেছে, একবার তিনি স. তাঁর মহাপুণ্যবতী সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে একটি গরু যবেহ করেছিলেন। তাই মনে হয়, তিনি গরুর গোশতও সম্ভবত খেয়েছেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

গোশতের প্রশংসা

গোশতের প্রশংসায় বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, দুনিয়া ও আখেরাতবাসীদের খাবারের সরদার হচ্ছে গোশত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। তবে এর সমর্থনে এসেছে হজরত আলী মুরতযা কর্তৃক বর্ণিত আর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর আহার্যসামগ্রীর অগ্রণী হচ্ছে গোশত, তার পরে চাউল। আবু নাঈম হাদিসখানি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আত্ তিব্বুনবী' গ্রন্থে। গোশত খেলে সত্তর গুণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরকম বলেছেন ইবনে শিহাব জুহুরী। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থেও এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। হজরত আলী বলেছেন, গোশত খেলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং স্বভাব ভালো হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত আহার না করলে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। এরকম বলা হয়েছে 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে। একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত আহার না করা যেমন মন্দ, ঠিক তেমনি মন্দ একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশত আহার করা। উভয় অবস্থায় মন-মানসিকতায় ও স্বভাবে আসে রুক্ষতা।

কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর নিকট অপেক্ষকৃত অধিক পছন্দীয় খাদ্য ছিলো গোশত। তিনি স. বলেছেন, গোশত খেলে শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর দুনিয়ার সকল খাদ্যবস্তু অপেক্ষা গোশত উত্তম। তিনি স. আরো বলেছেন, আমি যদি আমার প্রভুপালনকর্তার নিকট গোশতপ্রার্থনা করি, তবে তিনি আমাকে প্রতিদিন গোশত দান করবেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, গোশত ভক্ষণ করলে জ্ঞান বাড়ে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. এর নিকট পছন্দনীয়

ছিলো সামনের রানের গোশত। একথা জেনেই এক ইহুদী রমণী তাঁকে বকরীর সামনের রানের গোশতে বিষ মিশ্রিত করে খেতে দিয়েছিলো। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. সামনের রানের গোশত পছন্দ করতেন। গোশতের আয়োজন প্রত্যহ হতো না। আর রানের গোশত তাড়াতাড়ি পাক করা যেতো বলেই রানের গোশত তিনি পছন্দ করতেন। তিরমিজী শরীফের এক হাদিসে এসেছে, উৎকৃষ্ট গোশত হচ্ছে পিঠের গোশত। কেউ কেউ বলেছেন, সামনের রানের মাংস রসুল স. এর কাছে অধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হচ্ছে, তা থাকে নাপাকীর স্থান থেকে অধিক দূরে। আর একারণেই তিনি স. গুর্দা পছন্দ করতেন না। কেননা গুর্দা থাকে প্রস্রাবের স্থানের নিকটে। তবে এ সম্পর্কে হাফেজ ইরাকী বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। রসুল স. হাড় থেকে গোশত তাঁর পবিত্র দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতেন। আবার কখনো কখনো খেতেন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে। বোখারী শরীফে এসেছে, রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে ছুরি নিয়ে বকরীর রানের গোশত কেটে কেটে খেয়েছেন। নামাজের সময় হলে যখন আজান দেওয়া হতো, তখন হাতের ছুরি রেখে দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। ওজু করতেন না। অর্থাৎ হাত ধৌত করতেন না। অন্য হাদিসে এসেছে, রসুলে করীম স. বলেছেন, তোমরা গোশত ছুরি দিয়ে কেটে ভক্ষণ কোরো না। কেননা এরকম করে অনারবীয়রা। তোমরা দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ কোরো। কেননা এটা হজমের সহায়ক এবং পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক। আবু দাউদ বলেছেন, হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল সুদৃঢ় নয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, এ হাদিসের পরিপোষকতায় এসেছে হরজত আবু সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজী কর্তৃক উল্লেখিত একটি হাদিস। কোনো কোনো হাদিসে 'তাহাশ' অর্থাৎ দাঁত দ্বারা হাড় থেকে গোশত খাওয়ার বর্ণনা এসেছে। আবার কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, 'কেতে' অর্থাৎ ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়ার বিবরণ। বিদ্বানগণ এর সমাধান দিয়েছেন এভাবে— ছোট হাড় থেকে গোশত খাওয়ার সময় তিনি স. তাঁর দাঁত ব্যবহার করতেন। আর বড় হাড় থেকে খাওয়ার সময় ব্যবহার করতেন ছুরি।

রসুলুল্লাহ্ স. ভূণা গোশত খেতেন। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, একবার আমি ভূণা রান রসুল স. এর সম্মুখে উপস্থিত করলাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন। তারপর নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। ওজু করলেন না। অর্থাৎ হাত ধুলেন না। তিরমিজী। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। রসুল স. 'কাদীদ' অর্থাৎ শুকনো গোশত খেয়েছেন। সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক সাহাবী বলেছেন, একবার আমি রসুল স. এর জন্য বকরী জবেহ করলাম। তখন আমরা ছিলাম মুসাফির। তিনি স. বললেন, গোশত 'এসলাহ' করো। এসলাহ অর্থ কাদীদ বানানো। আমি ওই বকরীর গোশত তাঁকে অল্প অল্প করে আহার করাতাম। এভাবে আমরা

এক সময় পৌঁছে গেলাম মদীনায়। তিনি স. ভুনা কলিজাও খেয়েছেন। মুরগীর গোশতও ভক্ষণ করেছেন। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজী। রসুলুল্লাহ্ স. হিমারে ওয়াহশীর মাংসও খেয়েছেন। হিমারে ওয়াহশীর অন্য নাম গোরখোর বা নীল গাই। বোখারী ও মুসলিম ঃ সফরে ও গৃহে উভয় অবস্থায় তিনি স. উটের মাংস খেয়েছেন। খেয়েছেন খরগোশের মাংস এবং সামুদ্রিক প্রাণী। মুসলিম। তাঁর সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ করার ব্যাপারে ইমামগণের বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে। কারো কারো মতে সামুদ্রিক প্রাণী সাধারণভাবে জায়েয। কারো কারো মতে দন্তবিহীন সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া জায়েয। তবে আমাদের মাজহাবে মাছ ছাড়া অন্য কোনো জলচর প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়।

ছারীদ

রাসুলুল্লাহ্ স. ছারীদ আহার করতেন। রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের শুরুয়ার মধ্যে ফেলে ছারীদ তৈরী করা হয়। আবার গোশতের সঙ্গে মিশিয়েও ছারীদ বানানো যায়। হাদিস শরীফে এসেছে, আহার্যদব্যসমূহের উপর ছারীদের মর্যাদা যেমন, আয়েশার মর্যাদা সকল নারীর উপর তেমনি। আবু দাউদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আহার্যসম্ভারের মধ্যে রসুলে পাক স. এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলো ছারীদে খবুজ ও ছারীদে হায়স। রুটি এবং শুরুয়া দিয়ে ছারীদে খবুজ প্রস্তুত করা হয়। আর খেজুর, ঘি ও রুটি দিয়ে তৈরী করা হয় ছারীদে হায়স। তিনি স. ঘি ও মাখন দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খেয়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। যয়তুন তেল দিয়ে ভিজিয়ে তিনি স. রুটি খেয়েছেন, তারও বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি যে হারীসা বা খিচুড়ি (গম, গোশত ও দুধ মিশিয়ে তেরী করা খাবার) খেয়েছেন, সে সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম বর্ণনাগুলোকে মওজু (জাল) বলে থাকেন। তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন, জিবরাইল আমাকে এত হারীসা আহার করিয়েছেন যে, তাতে করে আমার দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য কোমর মজবুত হয়ে গিয়াছে। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত এক ব্যক্তি মোহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ। তিনি হাদিসটি ওয়াযা করেছেন বলে মনে করা হয়।

কদু ঃ রসুলে আকরম স. কদুর তরকারী খেতেন এবং তা খুব পছন্দ করতেন। কোনো তরকারীর সঙ্গে কদু পাক করা হলে তিনি বাটির কিনারা থেকে কদুর টুকরো খুঁজে বের করে খেতেন। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স.কে এরকম আগ্রহসহকারে কদু খেতে দেখে আমিও কদুর অনুরাগী হয়ে পড়ি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ইমাম নববী বলেছেন, কদুর তরকারী পছন্দ করা মোস্তাহাব। তাছাড়া রসুল স. যা যা পছন্দ করতেন, তা পছন্দ করাও মোস্তাহাব। তিনি স. যবের রুটির সাথে সালাক মিশিয়ে খেতেও খুব পছন্দ করতেন। সালাক আরব

দেশের একটি বহুল প্রচলিত তরকারীর নাম। 'শামায়েলে তিরমিজী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একদিন হজরত ইমাম হাসান, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর হজরত সালমার নিকট গেলেন। হজরত সালমা রসুল স. এর খাদেমা ছিলেন। তাঁরা তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে সালমা! আমাদের জন্য ওই খাবার প্রস্তুত করুন, যা রসুল স. খুব পছন্দ করতেন। হজরত সালমা বললেন, বৎসগণ! ওই খাবার খাইয়ে তো আমি তোমাদেরকে খুশী করতে পারবো না। তোমরা তো খেয়ে থাকো সুস্বাদু ভালো ভালো খাবার। তাঁরা বললেন, না। আপনি ওই খাবারই প্রস্তুত করুন। আমরা অবশ্যই তা পছন্দ করবো। তিনি যবের রুটির কিছু টুকরা পাতিলে রেখে উপরে যয়তুনের তেল, মরিচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু মসলা দিয়ে আহার্য প্রস্তুত করলেন। অতঃপর পাতিলটি তাঁদের সামনে রেখে বললেন, এটাই ওই খাবার, যা রসুল স. অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খেতেন।

লেপটা ঃ রসুলে আকরম স. হারীরা বা লেপটাও আহার করতেন। ওই লেপটা আটা দিয়ে হালকা করে তৈয়ার করা হতো। তাবারী এরকম বলেছেন। জাওহারী বলেছেন, গোশতকে ছোট ছোট টুকরো করে অনেক পানি দিয়ে লেপটা পাকানো হয়। পাকানোর পর গোশতগুলি যখন নরম ও মসৃণ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আটা ঢেলে দেওয়া হয়। এ খাবারের মধ্যে যদি গোশত না থাকে, তবে তাকে বলা হয় আমীদ। কেউ কেউ বলেন, আটাকে গুলে নেওয়ার পর তাকে ছেঁকে নেয়া হয়, যাতে ভুসি দূর হয়ে যায়। তারপর তাকে পাক করা হয়। এ ধরনের আরেকটি খাবার আছে যাকে খারীরা বলা হয়। খারীরা তৈরী করা হয় আটার ভুসি দিয়ে। আবার খাযীরা নামের আরেকটি খাবার আছে, যা বানানো হয় দুধ দিয়ে। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, একবার রসুলে পাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক চাশতের সময় (সকালের দিকে) আমার বাড়িতে এলেন। আমি তাঁদের জন্য খাযীরা প্রস্তুত করলাম। রসুল স. তা আহার করলেন পানি মিশিয়ে।

ফল ঃ রসুলে পাক স. শুকনো, তাজা এবং আধাপাকা খেজুর আহার করতেন। তিনি স. কেবাছ ফলও খেতেন। কেবাছ বলা হয় এরাক বা পিলু গাছের ফলকে, যা খাওয়া যায় কেবল পাকলে। এরাক বা পিলু গাছের ডাল মেসওয়াক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তিনি স. খেজুর গাছের মজ্জা, অর্থাৎ যা আঠালো রসের আকারে গাছ থেকে বের করা হয়, তা খেতেও খুব পছন্দ করতেন। এটিকে আরব দেশে শাহমাতুন নাখল বা খেজুর গাছের চর্বি বলা হয়। পনির খেতেও ভালবাসতেন তিনি। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের দিন তাঁর নিকট পনির আনা হলো। তিনি স. বিসমিল্লাহ্ বলে তা ছুরি দিয়ে কাটলেন। আবু দাউদ। অবশ্য কোনো কোনো ফেকাহশাস্ত্রবিদ এই হাদিস সম্পর্কে বাদানুবাদ করেছেন।

খরবুজা এবং খেজুর একত্রে মিশিয়ে আহার করাও ছিলো তাঁর খুব পছন্দ। খরবুজার প্রশংসায় বেশ কিছু হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র পুস্তিকাও। তবে মুহাদ্দেছীনে কেরাম সেগুলিকে মওজু বলে সাব্যস্ত করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মোহাম্মদ ইবনে আসলাম খরবুজা খেতেনই না। রসুল স. এ ফল খেয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কাকড়ি (শশাজাতীয় ফল) খেজুরের সঙ্গে খেতেন। একবার দেখা গেলো, তাঁর এক হাতে খেজুর এবং অন্য হাতে কাকড়ি। আর তিনি স. এক হাত দিয়ে খেজুর এবং অন্য হাত থেকে কাকড়ি নিয়ে মুখে দিচ্ছেন। এভাবে তিনি স. এক সঙ্গে খরবুজা এবং খেজুর খেতেন। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. খেজুর ও খরবুজা একসাথে মিলিয়ে ভক্ষণ করতেন। বিষয়টি হতো সম্ভবত দু'রকমভাবে— ১. হয়তো উভয়টিই মুখে পুরে দিয়ে চর্বণ করতেন, অথবা কখনও একহাত থেকে একটি, আর অপর হাত থেকে আরেকটি নিয়ে চিবুতেন। দুর্লভ হাদিসসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হাদিস ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন এভাবে— মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমার আম্মাজান আমার মুটিয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, আমি যেনো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাই এবং রসুল স. এর খেদমতে গমন করি। কিন্তু কোনো চিকিৎসাই কাজে লাগছিলো না। একদিন আমি খেজুর ও কাকড়ি একসাথে মিলিয়ে খেলাম। তাতেই কাজ হলো। এরকম বর্ণিত হয়েছে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে। এক্ষেত্রে হাদিসবেত্তাগণের ধারণা এই যে, রসুল স. এর কাকড়ি ও ভিজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো, খেজুরের উত্তাপকে কমিয়ে আনা, কাকড়ির শীতলতা কমানো নয়। অর্থাৎ উত্তাপ ও শীতলতার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি নীতি। হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যা বর্ণনা করেছেন হিশাম। বলেছেন, রসুল স. কাকড়ির সঙ্গে ভিজা খেজুর মিশিয়ে খেতেন, যাতে করে কাকড়ির শীতলতা খেজুরের উষ্ণতার সঙ্গে এবং খেজুরের উষ্ণতা কাকড়ির শীতলতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। কথিত আছে, এটি মিশ্র খাবারের একটি নীতি। আরও বর্ণিত হয়েছে, বতীখকে ভিজা খেজুরের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ার অর্থ— বতীখে আখদার অর্থাৎ কাকড়ি, যা স্বভাবত ঠাণ্ডা। এর অর্থ বতীখে আসগার নয়, যার অর্থ খরবুজা। কেননা খরবুজা গরম। আবার এমনও বলা হয়েছে যে, বতীখে আসগার (খরবুজা) ভিজা খেজুরের তুলনায় একগুণ বেশী ঠাণ্ডা। যদিও মিষ্টতার কারণে এর উচ্চতাপ লোপ পায়। এ মিসকীনের ধারণা, খেজুর এবং বতীখ একটি অপরটির সাথে মিলানোর কারণে

একটির উষ্ণতা অপরটির শীতলতা নষ্ট করে ভারসাম্য আনার যে ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত, তা আসলে একটি বিতর্কিত ব্যাপার। প্রকাশ্য কথা হচ্ছে, ঘটনাটি ছিলো একটি আকস্মিক ব্যাপার। এরকমও তো হতে পারে যে, খরবুজা মিষ্টি ছিলো না, আর কাকড়ি তো মিষ্টিই নয়, সে জন্যই তিনি স. হয়তো ও দু'টো একসাথে মিলিয়ে আহার করেছিলেন, যাতে মিষ্টতা সৃষ্টি হয়। এরকমও বলা হয় যে, তিনি স. যব এবং খেজুর একত্রে মিশিয়ে খেয়েছেন। কেননা যব হচ্ছে শুকনো এবং ঠাণ্ডা, আর খেজুর হচ্ছে গরম এবং আর্দ্র। সেজন্যই ও দু'টো মিলিয়ে খাদ্য তৈরী করা হতো। উদ্দেশ্য থাকতো যবের শীতলতা এবং খেজুরের উষ্ণতা দূর করা। এটি একটি ভালো ব্যবস্থা। ওয়াল্লহু আ'লাম।

খেজুর এবং মাখনও এক সাথে মিশিয়ে আহার করেছেন তিনি স. এবং এরকম করা ছিলো তাঁর পছন্দও। আজও আমাদের দেশে (তৎকালীন ভারতে) এ খাবারের প্রচলন আছে এবং বাজারে এরকম খাদ্য বিক্রিও হয়। খেজুরের উপরে মাখন রাখা হয়। অধিকাংশ সময় ভিজা খেজুরের সাথে মিশিয়ে তা খাওয়া হয়, যাতে মাখনের চর্বি ভিজা খেজুরের আর্দ্রতাকে দূর করে দেয়।

রসুল স. রুটি তরকারী সহযোগে আহার করতেন। সে তরকারী গোশতের হোক, অথবা হোক সবজীর। আবার কখনও খেজুরের তরকারীর সাথে মিশিয়ে আহার করতেন তিনি স.। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. খেজুর এবং যবের রুটির টুকরা মুখে দিয়ে বলতেন, এটা একটা উত্তম খাবার। আবার কখনও রুটি সিরকার সঙ্গে মিশিয়ে আহার করতেন এবং বলতেন, সিরকা বড় উত্তম তরকারী। মুসলিম, খাত্তাবী এবং কাযী আয়ায। বলা হয়ে থাকে, এরকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মধ্যম ধরনের খাবারের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুস্বাদু খাবার পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া। কথা হচ্ছে, রুটির সাথে তরকারী বা সিরকা সহজলভ্য। এগুলির প্রতি মানুষের প্রবৃত্তিগত আকর্ষণও খুব একটা থাকে না। আর প্রবৃত্তিগত আকর্ষণ মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করে দেয় এবং শরীরকেও করে ব্যাধিগ্রস্ত।

ইমাম নববী বলেছেন, প্রশংসা বিশেষ করে সিরকার জন্যই করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে অনেক। তারপর পানাহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং রসনাগত লালসা পরিহার করার কথাও এসেছে অন্যান্য হাদিসে এবং নীতিমালায়। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, সিরকার প্রশংসা করা হয়েছে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যান্য তরকারীর উপর সিরকাকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, যেমন কোনো কোনো সম্মানিত জন মনে করে থাকেন। এই হাদিস প্রকাশ হওয়ার কারণ ছিলো এই---- একদিন রসুল স. ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সামনে শুকনো রুটি আনা হলো। তিনি বললেন, তোমাদের কাছে কোনো তরকারী নেই? তাঁরা বললেন, না। তবে সিরকা আছে। তখন তিনি স.

বললেন, সিরকা কতোই না উত্তম তরকারী। একথার মানে হচ্ছে, খালি খালি রুটি খাওয়ার চেয়ে কোনো তরকারী দিয়ে রুটি খাওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক। তরকারী বা সিরকা রুটিকে ঠিক করে দেয়। তাকে বানিয়ে দেয় নরম, যা স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক। দু'টির মধ্যে যে কোনো একটির দ্বারা তা হয় না। এই হাদিসে দুধ, গোশত, মধু ও শুরুয়ার উপর সিরকার প্রাধান্য ঘোষিত হয়নি। তখন তাঁর সামনে দুধ বা গোশত থাকলে তিনি নিশ্চয় সে বিষয়ে আরও বেশী প্রশংসা করতেন। কাজেই বুঝতে হবে, রসুল স. এর তখনকার মন্তব্যটি ছিলো আয়োজকদের মনোতুষ্টিমূলক। রসুল স. তাঁর নিজের শহরের বিভিন্ন ফলমূল খেতেন। কোনো ফল পরিহার করতেন না। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, তাঁর পবিত্র অভ্যাসটি ছিলো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বড়ই উপকারী। আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন লোকালয়ে বিভিন্ন প্রকারের যে ফল-মূল সৃষ্টি করেন, সেগুলো সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য খুব উপকারী। ওগুলো স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নিরোগ থাকার উপকরণ। ওগুলোর যথাব্যবহার, রোগের ঔষধ ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়। এরকম খুব কম লোকই আছে, যে রোগ ও দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য ফলমূল বর্জন করে। ফলে অনেক দুর্বল ও রোগী মওসুমী ফল ভক্ষণের কারণে রোগ ও ব্যাধিমুক্ত হয়ে যায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। আঙ্গুর মুখে দিয়ে তিনি স. তার দানা মুখের ভিতর ভাংতেন এবং খোসাটি মুখ থেকে ফেলে দিতেন। আর হাত দিয়ে দানা ছিঁড়ে মুখে দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি ভিত্তিহীন।

রসুল স. কিন্তু পিয়াজ খেতেন না। আবার অন্যকে খেতে মানাও করতেন না। তবে এরকম বলতেন যে, কাঁচা পিয়াজ খেয়ে কেউ যেনো মসজিদে না আসে। তাঁর একথার উপরই অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসকে কিয়াস করা হয়। আবু দাউদ শরীফে অবশ্য জননী আয়েশা থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. এর অন্তিম পানাহারের মধ্যে পিয়াজও ছিলো। বলা বাহুল্য, পিয়াজ ভক্ষণ যে জায়েয, তা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই তিনি স. ওরকম করেছিলেন। অথবা ওই পিয়াজ ছিলো আগুনে পাকানো। ফলে তা ছিলো দুর্গন্ধহীন। মাকরুহ তো কাঁচা পিয়াজ খাওয়া। কেননা তা দুর্গন্ধযুক্ত। রসুল স. তাঁর হিজরতের প্রথম দিকে যখন হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে ছিলেন, তখন কখনো পিয়াজের গন্ধযুক্ত কোনো খাদ্য তাঁর সামনে আনা হলে তিনি খেতেন না। সাহাবীগণকে দিয়ে দিতেন। বরং রসুনের বিধানও এরকম। রসুনের বিধান এর চেয়েও কঠিন। ইমাম নববী বলেছেন, পিয়াজ রসুন ও গন্দনা সম্পর্কে রসুল স. এর হুকুম কী ছিলো, তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওগুলো রসুল স. এর উপর হারাম ছিলো। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে, ওগুলো তাঁর জন্য

ছিলো মাকরুহে তানযিহী, মাকরুহে তাহরিমী নয়। সাহাবীগণ একবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! পিয়াজ-রসুন কি আপনার জন্য হারাম? তিনি বললেন, না। আমার উপর হারাম নয়, বরং হারাম সকলের জন্য। তাঁর উপরে পিয়াজ রসুন হারাম ছিলো বলে যারা দাবী করেন, তাঁদের মতে 'না' কথার অর্থ হলো তোমাদের উপর হারাম নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, রসুলেপাক স. এর খাঁটি প্রেমিক যারা, তাদের জন্য পিয়াজভক্ষণকে মাকরুহ মনে করা ওয়াজিব। তাছাড়া প্রত্যেক এমন জিনিসকেও মাকরুহ মনে করা ওয়াজিব, যা তিনি অপছন্দ করতেন। কেননা খাঁটি প্রেমিকের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, প্রিয়জন যা পছন্দ করেন, তাকে প্রিয় মনে করা। আর তিনি যা অপছন্দ করেন, তাকে অপছন্দনীয় ভাবা। যারা এরকম বলেন, তাঁরা ঠিকই বলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

কোনো কোনো সময় রসুলে আকরম স. উম্মতের উপর মেহেরবানী করে রুখসত (সহজসাধ্য) আমল গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালা রুখসত আমলকেও পছন্দ করেন, যে রকম পছন্দ করেন আযীমত (কষ্টসাধ্য) আমলকে। তাই তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে রুখসতেরও। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আলী রসুল স. এর সাহচর্য থেকে দূরে কোথাও গেলেন। সেখানে এক লোকের বাগানে পানি সেঁচার কাজ নিলেন। কাজ শেষে পারিশ্রমিক হিসেবে পেলেন রুটি এবং গন্দনা। ফিরে এসে ওগুলো রসুল স.কে দেখালে তিনি স. নিজে রুটি গ্রহণ করলেন এবং গন্দনা ফিরিয়ে দিলেন হজরত আলীকে। এ ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে 'তারিখে মদীনা' গ্রন্থে।

আহারের সুন্নত নিয়ম

রসুলে আকরম স. তিন আঙ্গুল (বৃদ্ধা, তর্জনী এবং মধ্যমা) দিয়ে আহার করতেন। তিরমিজি এরকম উল্লেখ করেছেন তাঁর 'শামায়েলে তিরমিজি' গ্রন্থে। কেননা এক বা দু' আঙ্গুল ব্যবহার করে খাওয়া অহংকারীদের আলামত। তাছাড়া এমন আহারে তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। এতে করে পাকস্থলি থাকে পরিতৃপ্তিহীন। বিষয়টি বুঝতে পারা যায় দীর্ঘ দিন পর। আবার পাঁচ আঙ্গুলে খানা খাওয়া লোভের আলামত। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার একটি মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খানা খেয়েছেন। পূর্বোক্ত হাদিসের সঙ্গে এই হাদিসের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে এভাবে— তিনি অধিকাংশ সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। তবে কোনো কোনো সময় পাঁচ আঙ্গুলও ব্যবহার করেছেন। তিনি স. আহারের পর আঙ্গুলসমূহ চাটতেন। শেষে রুমাল দ্বারা হাত মুছে ফেলতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আঙ্গুল চাটা এবং থালা পরিষ্কার করে

খাওয়ার বিবরণ এসেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, থালা পরিষ্কার করে আহার করলে থালা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আর চেটে খাওয়ার কারণ হচ্ছে— আহার্যের কোন কণার মধ্যে যে বরকত রয়েছে, তা জানা যায় না। তাই আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত। সকল আঙ্গুল যে একসাথে চাটতে হবে, তা নয়। একটি করে আঙ্গুল জিহ্বায় বা ঠোঁটে লাগিয়ে চাটলেই তা হবে যথেষ্ট। কোনো কোনো সময় তিনি স. শিশু অথবা খাদেমকে দিয়ে তাঁর আঙ্গুল চাটাতেন। আহারের মাঝে আঙ্গুল চেটে খাওয়া মাকরুহ। আহারকালে দস্তর খানে যে খাদ্যকণা পড়ে যায়, তা উঠিয়ে নিয়ে খাওয়াও সওয়াবের কাজ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এতে করে দারিদ্র, শ্বেতী ও কুষ্ট রোগ থেকে বেঁচে থাকা যায়। যে ব্যক্তি এভাবে খাদ্যকণা তুলে খায়, তার সন্তানাদি বোকা হয় না এবং তাকেও সুস্থ্যতা দান করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দস্তরখান থেকে খাদ্যকণা উঠিয়ে নিয়ে খায়, তার সন্তান-সন্তুতি সুন্দর ও কমনীয় হয় এবং তার দারিদ্র দূর হয়ে যায়। এই আমলটি অহংকারকারীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তারা এরকম করাকে অপছন্দ করে। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চিন্তা করে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারা যায় যে, এর মধ্যে অপছন্দ করার মতো কিছু নেই। পড়ে যাওয়া খাদ্যকণা কিংবা হাতে লেগে থাকা খাদ্যবিশেষ তো তারই খাবারের অংশ, যা সে এতক্ষণ ধরে নিজের আঙ্গুল দ্বারা খেয়েছে। সুতরাং আঙ্গুল চেটে খাওয়া, থালা চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং দস্তরখানে পতিত খাদ্যাবশিষ্ট তুলে নিয়ে খাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। সর্বোপরি এরকম করা ছিলো আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ রসুল স. এর পবিত্র অভ্যাস। সুতরাং তাঁর আমলকে অপছন্দ করা তো যাবেই না। আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন। 'মাওয়াহেব' পুস্তকের লেখক লিখেছেন, জনৈক বুজুর্গ বলেছেন, একজন লোক কুলি করে, আবার সে তার আঙ্গুল দিয়ে দাঁতও ঘষে, অথচ একাজকে কেউ ঘৃণা করে না (তাহলে রসুল স. এর এহেন আমল অসুন্দর হবে কেনো?)।

রসুলেপাক স. হেলান দিয়ে খেতেন না। বলতেন আমি তো বান্দা। তাই বান্দার মতো বসি। বান্দা যেভাবে খায়, আমিও সেভাবেই খাই। হেলান দিয়ে খাওয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা কাযী আয়ায বলেছেন, এত্তেকামান, অর্থাৎ টেক লাগিয়ে বসার মানে হচ্ছে, খাওয়ার সময় চার জানু হয়ে খুব জমজমাটভাবে বসা। এ বসাটি ওই রকম— যেমন কোনো জিনিস নিচে রেখে তার উপর হেলান দিয়ে বসা। এভাবে যে বসে, সাধারণত সে বেশী খায় এবং এভাবে যে বসে, তার অহংকার ভাবটিও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু রসুল স. বসতেন পায়ের গোড়ালির উপর। দেখলে মনে হতো, হয়তো বা তিনি এখনই

উঠে দাঁড়াবেন। এটাকে একআ এর তরীকা বলা হয়। হাদিসে উল্লেখিত একআ শব্দের অর্থ এরূপ নয় যে, কোনো দিকে ঝুঁকে বসতে হবে। তত্ত্বজ্ঞগণ এরকমই বলেছেন।

একআর অর্থ পশ্চাদ্দেশ মাটির দিকে করে পায়ের গোছা খাড়া করে পিঠ সোজা করে দুই পায়ের পাতার উপরে বসা। নামাজের মধ্যে এভাবে বসা নিষেধ। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। কাযী আয়াযের ব্যাখ্যাও এরকম। এত্তেকা শব্দের ব্যাখ্যাও এরূপ করেছেন খাত্তাবী তাঁর 'একমাল' পুস্তকে। বলেছেন, এত্তেকা এর ব্যাখ্যায় একদিকে ঝুঁকে বসার কথাই যে বলা হয়েছে, তা নয়। তিনি আরও বলেছেন, সাধারণ লোকের ধারণা মুত্তাকী ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে একদিকে ঝুঁকে খায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এরকম নয়। বরং মুত্তাকী ওই ব্যক্তি, যে তার নিচে বিছানো কোনোকিছুর উপর জমজমাটভাবে বসে। ইবনে জাওজীর নিকট এত্তেকার অর্থ একদিকে ঝুঁকে বসা। কারও কারও মতে এত্তেকার অর্থ কোনোকিছুতে হেলান দিয়ে বসা, তা দেয়াল, বালিশ বা অন্য যে কোনো কিছু হোক। আবার কেউ কেউ এরকমও বলেছেন— হাতের উপর ভর করে বসা। কোনো কোনো হাদিসে এরকম বসার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে কাছীর তাঁর 'নেহায়া' পুস্তকে লিখেছেন, যারা এত্তেকার অর্থ করেছেন একদিকে ঝুঁকে বসা, তাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুকূলে কথা বলেছেন। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, হেলান দিয়ে বসে খাওয়া আহারকারীর জন্য ক্ষতিকর। কেননা এভাবে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলিতে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। পাকস্থলিতে গিয়েও উলটপালট করে। মজবুতভাবে বসে না। পাকস্থলির মুখ খাদ্যগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয় না। পাকস্থলি কোনো একদিকে ঝুঁকে থাকে বলেই এধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এরূপ বসার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। মহাদুর্বৃত্ত ফেরাউন এভাবেই বসতো। এরকম বসা বান্দার দাসত্বের নিয়মের পরিপন্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলেপাক স. বলেছেন, দাস যেভাবে খায়, আমিও খাই সেভাবে। কেউ কেউ বলেছেন, হেলান দিয়ে বসে খাওয়ার নিষিদ্ধতা কেবল রসুল স. এর জন্য বিশিষ্ট ছিলো। কিন্তু সার্বিক কথা হলো, নিয়মটি সাধারণ। তবে শারীরিকভাবে দুর্বল ও অক্ষমদের কথা আলাদা। কেননা 'আয্যরুরাতু তুবীহুল মাহযুরাত' (প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও গ্রহণযোগ্য করে দেয়)।

'সফরুস সায়াদাত' পুস্তকের লেখক বলেছেন, এত্তেকার পাঁচটি অবস্থা আছে। উপরে যে অবস্থাগুলোর কথা উল্লেখ করা হলো, ওগুলোকেও তিনি গণ্য করেছেন। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেছেন, হেলান দিয়ে খাওয়া মাকরুহ বা উত্তম নয় বলে যখন সাব্যস্ত হলো, তখন বলা যেতে পারে, খাওয়ার সময় এ অবস্থায় বসা মোস্তাহাব— উভয় রান খাড়া রেখে পায়ের উপর বসা, অথবা ডান রান খাড়া

রেখে বাম পায়ের উপর বসা। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, রসুল স. আদব ও বিনয় প্রকাশার্থে বাম পায়ের তালুর উপর ডান পা রেখে বসতেন। এ ধরনের আসন আহারের অন্যান্য আসনের চেয়ে অধিকতর উপকারী। কেননা এ অবস্থায় শরীরের সমস্ত অঙ্গ তার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

রসুলেপাক স. যখন খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতেন, তখন বলতেন 'বিসমিল্লাহ্'। উত্তম হচ্ছে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পুরাটাই পাঠ করা। শুধু 'বিসমিল্লাহ্' বললেও চলবে এবং এতে সুন্নতের উদ্দেশ্যও হাসিল হয়ে যাবে। খানা শেষ করার পর তিনি স. আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করতেন। প্রশংসার বাক্যসমূহ হাদিস শরীফে বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে এতোটুকু বললেও চলবে— আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্ব'আ'মানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জ্বাআ'লানা মিনাল্ মুসলিমীন। এরূপ দোয়াও পাঠ করা যেতে পারে— আল্লাহুম্মা আত্ব'আ'মতা ওয়াসাক্বায়তা ওয়ামা গানাইতা ওয়া আক্বনাইতা ওয়া হাদাইতা ওয়া আহ্ইয়াইতা ফালাকাল হামদু আ'লা মা আ'ত্বইতু। তিনি স. ডান হাত দিয়ে আহার করতেন এবং অন্যদেরকেও এরকম করতে বলতেন। আরো বলতেন, বান্দাগণ! আল্লাহ্র নাম লও। ডান হাতে খাও। আর যা তোমার কাছে, তা থেকে খাও। কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী ডান হাতে খানা খাওয়া মোস্তাহাব বলে থাকেন। কিন্তু সার্বিক কথা হচ্ছে, ডান হাতে খানা খাওয়া ওয়াজিব। যেমন মুসলিম শরীফে এসেছে, রসুল স. একবার এক লোককে বাম হাত দিয়ে খেতে দেখলেন। বললেন, ডান হাতে খাও। লোকটি বললো, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি স. বললেন, পারবেও না। তারপর থেকে লোকটি তার ডান হাত আর মুখ পর্যন্ত নিতে পারতো না। ডান হাতে খাওয়া মোস্তাহাব যাঁরা বলেন, তাঁদের দলিল হচ্ছে— রসুল স. বলেছেন, যা তোমার কাছে তা থেকে খাও। এখানে তো ডান বামের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলে তাও ওয়াজিব হয় না। ওয়াজিবের পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁরা এর জবাব দিয়েছেন এভাবে— ডান হাতে না খাওয়া যেহেতু গোনাহ্, সেহেতু ডান হাতে খাওয়া ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন, খানা এক প্রকারের হলে নিকট থেকে নিতে হবে। আর বিভিন্ন প্রকারের হলে দূর থেকে নেওয়াও জায়েয। তাঁরা এ মর্মে একটি হাদিসও বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু হাদিসটি দুর্বল। কেউ যদি বলেন, এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. পাত্র থেকে কদুর টুকরো খুঁজে খুঁজে বের করতেন। এই হাদিস তো 'কাছে থেকে খাও' হাদিসের পরিপন্থী। কেননা বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেছে বেছে খানা নেওয়া যাবে না, যা কাছে আছে তাই নিতে হবে। এর উত্তর দেওয়া যায় এভাবে— বেছে বেছে খানা নেওয়া যাবে না তখন, যখন সহআহারীর অতুষ্টি থাকবে। আর রসুল স.

এর কাছে অতুষ্ট হওয়ার কি কেউ ছিলো? আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি স. তখন একা একা আহার করছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকাশ্য কথা হচ্ছে, হজরত আনাস তখন তাঁর দস্তরখানায় শামিল ছিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. খাবার গ্রহণের পূর্বে তাঁর পবিত্র হাত ধৌত করতেন। হাত ধুয়ে নিতেন আহারের পরেও। এ ব্যাপারে তিনি স. বলেছেন, ওজু করতে হবে আহারের পূর্বেও, পরেও। এখানে ওজু অর্থ হাত মুখ ধোয়া। একটি হাদিসে এসেছে, একবার তাঁর সামনে কিছু আহার্যদ্রব্য উপস্থিত করার পর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক। ওজুর পানি আনতে হবে কি? তিনি স. বললেন, (এভাবে) ওজু করার জন্য আমি আদিষ্ট নই। ওজু তো নামাজের জন্য। এখানে 'ওজু' অর্থ ওই ওজু, যা নামাজ পাঠের জন্য করতে হয়। অর্থাৎ এখানে 'ওজু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শরিয়তসম্মত পারিভাষিক অর্থে, আর ইতোপূর্বে শব্দটি এসেছে আভিধানিক অর্থে, যার অর্থ হাত মুখ পরিষ্কার করা।

রসুলেপাক স. গরম খাবার গ্রহণ করতেন না। হজরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. এর সামনে খাবারের একটি পেয়ালা আনা হলো, যা থেকে তখনও ভাঁপ উঠছিলো— তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে আগুন খাওয়ার জন্য হুকুম করেননি। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. গরম খাওয়া এবং গরম কিছু দিয়ে দাগ দেওয়া অপছন্দ করতেন। বলতেন, ঠাণ্ডা করে খাবার খাও। কেননা তাতে বরকত আছে। গরম খাবারে বরকত নেই। হজরত আসমা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট গরম খাবার আনা হলে তিনি তা সেই সময় পর্যন্ত ঢেকে রেখে দিতেন, যতক্ষণ না তার গরমের তেজ শেষ হয়ে যেতো। হজরত আসমা আরও বলেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, ঠাণ্ডা খাবারের মধ্যে বিরাট বরকত আছে। কাঠের একটি পেয়ালা ছিলো তাঁর, যার মুখে থাকতো লোহার ঢাকনা। হজরত আনাস বলেছেন, আমি ওই পেয়ালাটি দিয়ে তাঁকে পানি, নবীয, মধু— সব ধরনের পানীয় পান করিয়েছি। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আসেম আহ্ওয়াল বলেছেন, আমি রসুল স. এর সেই পেয়ালাটি আনাসের কাছে দেখেছি এবং আমি তাতে পানিও পান করেছি। ততোদিনে পাত্রটি কিঞ্চিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিলো। আনাস পাত্রটিতে চান্দির খোল লাগিয়ে নিয়েছিলেন। পেয়ালাটি ছিলো বেশ বড় এবং উত্তম কাঠের তৈরী। আলেমগণ বলেন, পেয়ালাটি ছিলো ঝাউ কাঠের। তার রঙ ছিলো ঈষৎ হলুদ। ইবনে সিরীন বলেছেন, তার উপর লোহার বেড়ি লাগানো ছিলো। পরে হজরত আনাস চাইলেন লোহার পরিবর্তে তার উপর স্বর্ণের বা রৌপ্যের বেড়ি লাগিয়ে নিবেন। কিন্তু হজরত আবু তালহা তাঁকে একাজ করতে নিষেধ করলেন। বললেন, যেভাবে রসুল স. এটাকে রেখেছিলেন, সেভাবেই রেখে দাও। ইমাম আবু আবদুল্লাহ্

বোখারী বর্ণনা করেছেন, আমি পাত্রটি বসরাতে দেখেছি এবং আমি তাতে পানিও পান করেছি। পেয়ালাটি নযর ইবনে আনাসের বংশধর থেকে আট হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিলো। 'মাওয়াহেব' পুস্তকে এরকমই বলা হয়েছে। তিনি স. কখনও ট্রেতে করে খাবার গ্রহণ করেননি। তিনি স. চাপাতি রুটি খেয়েছেন। তবে তা দস্তরখানে রেখে খেয়েছেন। দস্তরখানাটি ছিলো চামড়ার বা পাতার। এখন পর্যন্ত (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনাকালে) হারামাইন শরীফাইনে খুরমার পাতার দস্তরখান ব্যবহারের প্রচলন আছে। 'হুদা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'মাওয়াহেব' পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনো চিকিৎসক বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চায়, সে যেনো রাতের খাবারের পর একশ কদম হাঁটে। আহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেনো নিদ্রা না যায়। কেননা তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আহারের পর নামাজ পড়া হজম কার্যের সহায়ক।

পানি পান

রসুলেপাক স. মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানি পান করতে পছন্দ করতেন। সাহাবা কেরাম তাঁর জন্য বীরে সাবকা নামক কূপ থেকে পানি এনে দিতেন। বীরে সাবকা ছিলো মদীনা শরীফ থেকে দু'মনযিল অর্থাৎ ছত্রিশ মাইল দূরে। ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানি অন্বেষণ করা যুহুদ (সাধাসিধা জীবনযাপন) এর পরিপন্থী নয়। এটা কোনো বিলাসিতাও নয়। বিলাসিতা কেমন করে হতে পারে? সাইয়্যেদুয্যাহেদীন স. অনাড়ম্বর জীবন যাপনে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই এটাকে গ্রহণ করেছেন। তবে পানির মধ্যে মেশক, গোলাপ মিশ্রিত করে তা সুবাসিত করা অবশ্য বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত এবং তা নিন্দনীয়। ইমাম মালেক এ কাজটিকে মাকরুহ বলেছেন। তিনি তাঁর এক শিষ্যকে একবার বলেছিলেন, বৎস! পানি ঠাণ্ডা করে পান কোরো। ঠাণ্ডা পানি পান করলে অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতার উপলব্ধি আসে। শিষ্য বলেছিলেন, ওই লোক সম্বন্ধে আপনার মতামত কি, যে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য দেয়ালের উপরে পানি রাখলো। অতঃপর তার উপর রৌদ্র এসে গেলো। সে ওই পানি সেখান থেকে সরিয়ে নিলো না। পানিও হয়ে গেলো গরম। শেষে সে ওই গরম পানি পান করলো এবং বললো, ভাইসব আমি আমার প্রবৃত্তির সুখ চাই না। ইমাম মালেক বললেন, লোকটি অভ্যাসের দাস। তাই তার অনুসরণ অনুচিত। বলা হয়ে থাকে, শিষ্যটি ছিলেন শায়েখ সেররী সাকতী। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. মধুর সঙ্গে পানি মিশ্রিত করে পান করতেন এবং সকাল বেলা পানি পান করতেন। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যখন ক্ষুধা অনুভব করতেন তখন খাবার জাতীয় যা কিছু পেতেন তাই খেয়ে নিতেন। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা লিখেছেন, ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, মধু ও পানি মিশিয়ে শরবত পান করলে মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। উন্নতমানের চিকিৎসকগণই কেবল

বিষয়টি অবগত। কেননা মধুর শরবত পান করলে অথবা প্রাতঃরাশে মধু খেলে কাশি কেটে যায়। পাকস্থলির ভার ধুয়ে ফ্যালে এবং পাকস্থলির চটচটেভাব দূর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়। পাকস্থলির ভুক্ত দ্রব্যের বর্জ্যসমূহ দূর করে দেয়, ভারসাম্যের সাথে পাকস্থলিতে উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং তার জড়তা দুর করে। আর ঠান্ডা পানি যেহেতু ঠাণ্ডা, তাই তা পাকস্থলির অপ্রয়োজনীয় গরমকে দূর করে দেয়। এভাবে স্বাস্থ্যের হেফাজত করে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানি পছন্দ করতেন— জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসের অর্থ, তিনি স. পান করতে পছন্দ করতেন মধুর শরবত। অথবা খেজুর বা মনাক্কার শীতল শরবত, বা নবীয। এতে রয়েছে অনেক উপকারিতা। এতে করে শারিরীক শক্তিও বৃদ্ধি হয়।

নাকী ও নাবীয বানানোর পদ্ধতি হচ্ছে— খেজুর বা মনাক্কা কেটে কেটে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এভাবে দু'দিন রাখা হলে তার মিষ্টি ওষ্ঠ দ্বারাই অনুভূত হয়ে থাকে। এ অবস্থার শরবতকেই নাবীয বলা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে পান করলে তাকে বলা হয় নাকী। তবে এর মধ্যে তেজষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করা মাকরুহ। আর যদি এ তেজষ্ক্রিয়ার মধ্যে ঝাঁঝ বা মাদকতা এসে যায়, তাহলে তা হয় হারাম এবং সেটা তখন পরিণত হয় শরাবে।

রসুলেপাক স. দুধ খুব পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন, দুধ একই সঙ্গে খাদ্য এবং পানীয়। আর কোনো দ্রব্যের এমন বৈশিষ্ট্য নেই। তিনি স. আহারের পর দোয়া করতেন 'এ দ্বারা আমার কল্যাণ বাড়িয়ে দাও'। দুধ পান করার পর পাঠ করতেন 'যিদ্‌না মিনহু' তিনি স. বলতেন, তিনটি জিনিস এমন, যা কেউ দান করলে তাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়— ১. দুধ ২. বালিশ এবং ৩. সুগন্ধী তেল। এক হাদিসে তেলের জায়গায় বলা হয়েছে 'খুশবু'। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বেশী প্রসিদ্ধ। রসুল স. কখনও নির্ভেজাল দুধ পান করতেন। আবার কখনও পান করতেন পানি মিশিয়ে। লাচ্ছিও পান করতেন তিনি। কেননা দুধ দোহন করার সময় গরম থাকে। আর ওই সকল দেশে গরম বেশী হওয়ার কারণে তিনি দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে দুধের গরম কমিয়ে নিতেন। অথবা তার কারণ এও হতে পারে যে, ঠাণ্ডা দুধ ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাবের অনুকূল। বোখারী শরীফে হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. তাঁর এক আনসারী সাহাবীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন সাহাবী। অন্য বিবরণে এসেছে, সঙ্গে ছিলেন হজরত আবু বকর। আনসারী তাঁর বাগানে পানি সিঞ্চন করছিলো। তিনি তাঁকে বললেন, তোমার কাছে পুরনো মশকে রাখা রাতের ঠাণ্ডা পানি থাকলে নিয়ে এসো। অন্যথায় আমি এখানকার পানিই পান করবো। আনসারী বললেন, হ্যাঁ আমার কাছে পুরনো মশকে রাখা বাসী পানি আছে। একথা বলে তিনি পেয়ালাতে

করে পানি নিয়ে এলেন এবং তাঁর ঝুপড়িতে রাখা বকরীর দুধ দোহন করে তার মধ্যে মিলিয়ে নিলেন। রসুল স. সে পানি পান করলেন। জেনে রাখা ভালো যে, এই হাদিসে 'কারউন' বলে একটি শব্দ এসেছে, যার অর্থ— পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা, যেমন চতুষ্পদ প্রাণী পানি পান করে। তবে ব্যাখ্যাতাগণ এর অর্থ করেছেন— হাত দ্বারা নিয়ে পানি পান করা, মুখ লাগিয়ে পান করা নয়। এরূপ ব্যাখ্যা প্রদানের কারণস্বরূপ তাঁরা ধারণা করেছেন, কাজটি ছিলো রসুল স. এর উচ্চমর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরা একথা ভেবে দেখেননি যে, তিনি স. আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। সে হিসেবে এরূপ হওয়া কোনো সুদূরপরাহত বিষয় নয়। হতে পারে এরূপভাবে পানি পান করার মধ্যে তিনি কোনোপ্রকার আস্বাদ অনুভব করতেন। আল্লাহ্ই প্রকৃততত্ত্বের পরিজ্ঞাতা। এ ফকীর (শায়েখ আবদুল হক) এক বাগানে এক হাদিসবেত্তার সাহচর্যে ছিলেন। সেখানকার নালায় পানি প্রবাহিত হচ্ছিলো। তিনি সে নালায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন। তখন আমার কাছে এর প্রকৃত রহস্য অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস যখন জানলাম তখন বুঝতে পারলাম, ওই বুজর্গ হাদিসবেত্তা কাজটি করেছিলেন রসুল স. এর অনুসরণার্থে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

রসুল স. আহারের পর পানি পান করতেন না। কারণ, তা হজমে বিলম্ব ঘটায়। তাই খাদ্য হজম হওয়ার কাছাকাছি না গেলে পানি পান করা উচিত নয়। রসুলেপাক স. এর আরেকটি স্বভাব ছিলো, তিনি বসে পানি পান করতেন। মুসলিম। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। মুসলিম শরীফেই হজরত আবু হুরায়রা থেকে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে— তিনি স. বলেছেন, তোমাদের উচিত দাঁড়িয়ে পানি পান না করা। যদি কেউ ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে পানি পান করে, তবে তার উচিত তা বমি করে হলেও পেট থেকে বের করে দেওয়া। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে বালতিতে করে যমযমের পানি আনা হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। হজরত আলীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি তা দিয়ে ওজু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করলেন। একবার হজরত আলী বললেন, মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরুহ মনে করে, অথচ আমি আল্লাহ্র নবীকে এরকম করতে দেখেছি। এখন আমি যেরকম করলাম। উভয় প্রকার হাদিসই বিশুদ্ধ এবং ওগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে এভাবে— দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরুহ তানযীহী। আর রসুল স. দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন, এরকম করা যে জায়েয (সিদ্ধ) তা বুঝানোর জন্য। শরিয়তপ্রবর্তক যিনি, তাঁর জন্য এটা বৈধ যে, তিনি জায়েয বুঝানোর জন্য মাকরুহ কাজও করে দেখাতে পারেন। কেননা

এরকম করা তাঁর উপর ওয়াজিব। অর্থাৎ কাজটি তাঁর জন্য মাকরুহ নয়। আর বমি করে বের করার যে কথা বলা হয়েছে, তা মোস্তাহাব। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পানি পান করবে— এই বিশুদ্ধ এবং সুস্পষ্ট হাদিসের ভিত্তিতে তার জন্য বমি করে পানি বের করে ফেলা মোস্তাহাব। চাই ভুলবশত পান করে থাকুক, অথবা পান করে থাকুক ইচ্ছাপূর্বক। আর হাদিসের মধ্যে ভুলক্রমে কথাটি এ জন্য আনা হয়েছে যে, যে কাজ বর্জন করা মোস্তাহাব, তা একজন মুমিন ব্যক্তি ইচ্ছা করে করতে পাবে না। মালেকী মাজহাবের অনুসারীদের নিকট দাঁড়িয়ে পানি পান করার মধ্যে দুষণীয় কিছু নেই। তাঁরা দলিল উপস্থাপন করে থাকেন হজরত যোবায়ের ইবনে মুতইম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছে, আমি হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি। ইমাম মালেক বলেন, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর ব্যাপাবে আমি জেনেছি, তাঁরা দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা (শায়েখ আবদুল হক) বলেন, হজরত আবু হুরায়রার হাদিসের সনদ দুর্বল। কেউ কেউ বলেছেন, দাঁড়িয়ে পান করার বিধানটি ওজু ও যমযমের পানির জন্য নির্ধারিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এমনও হতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করার নিষিদ্ধতা ওই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত, যে তার সাথীদেরকে পান করায় এবং তাদেবকে পান করানোর পূর্বেই নিজে দ্রুত পান করে নেয়। সে ওই হাদিসের পরিপন্থী কাজ করলো, যেখানে বলা হয়েছে, যে পানি পান করাবে, সে পান করবে সর্বশেষে। কিন্তু এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, নিষেধাজ্ঞাটি ধারণামূলক। কেননা অন্যান্য হাদিসে রয়েছে এর বিরুদ্ধ প্রমাণ। ওজুর পানি দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলি মূলতঃ জায়েযবোধক। আর দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদিসগুলো মোস্তাহাব অর্থবহ। অর্থাৎ বসে পান করা উত্তম। হাদিসের ব্যাখ্যায় এমন শব্দও এসেছে, যার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে পান করার নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ স্বাস্থ্যবিধিবিষয়ক। অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য করেই রসুল স. ওরকম বলেছেন। মোট কথা, হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম বলা যে, দাঁড়িয়ে পান করা যেনো কারো অভ্যাসে পরিণত না হয়। তবে হঠাৎ কখনও কেউ এরকম করলে তা একেবারে অবৈধ হবে না। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা একদিন দেখলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পানি পান করছে। তিনি বললেন, বমি করে ফেলে দাও। লোকটি বললো, কেনো? তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে বিড়াল পানি পান করুক, তা-কি তুমি পছন্দ করবে? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমার সঙ্গে যে পানি পান করেছে সে বিড়ালের চেয়েও নিকৃষ্ট— সে হচ্ছে শয়তান।

রসুলেপাক স. তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন এতে পরিতৃপ্তি আসে। এটি একটি পছন্দনীয় আমল এবং নিরাময়দানকারী। প্রতি নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় মুখ থেকে পেয়ালা পৃথক করতেন এবং নতুন নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন। তিনি পানপাত্রে ফুঁক দিতে নিষেধ করতেন। পাত্র যখন মুখের নিকটে আনতেন, তখন পাঠ করতেন— বিসমিল্লাহ্। আর যখন পৃথক করতেন তখন বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এরূপ করতেন তিনি তিনবার। এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথম শ্বাস গ্রহণের সময় তিনি স. পড়তেন 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআ'লাহু আযবান ফুরাতান বিরহ্মাতিন ওয়ালাম ইয়াজ্আ'লাহু মিলজ্বান আও যাজান বিযুনূবিনা'। তিনি স. আরো বলেছেন, চুমুক দিয়ে পানি পান কোরো। ঢক ঢক করে পান কোরো না। তাঁর এ কথায় বুঝা যায়, পানপাত্র মুখের বেশী ভিতরে ঢুকিয়ে পানি পান করা ঠিক নয়, সাধারণত মানুষ যেরকম করে থাকে। মনে রাখতে হবে, চুমুকদান কর্মটি যেনো ঠোঁট দ্বারা হয়ে থাকে। আবার মুখ থেকে পানপাত্রটি বেশী দূরেও রাখা যাবে না। তাহলে তো পান করাই সম্ভব হবে না। রসুলেপাক স. মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য খুব পিড়াপিড়ি করতেন। বারংবার খাওয়ার জন্য বলতেন। একবার এক ব্যক্তিকে দুধ পান করানোর পরেও বার বার বলছিলেন 'আরও পান করো, আরও পান করো'। এমনকি এক পর্যায়ে লোকটি বললো, সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি আপনাকে সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, এর অধিক পান করার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি স. যখন কোনো দলকে খাওয়াতেন, তখন নিজে সকলের শেষে খেতেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে মিলিত হতেন শেষ বৈঠকে। হাদিস শরীফে এসেছে, এক সঙ্গে খেতে বসলে তোমরা সকলের আগে হাত গুটিয়ে নিয়ো না, পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেও। এতে করে সাথীরা লজ্জা পেতে পারে। তাদের মধ্যে কারো হয়তো আরো আহারের প্রয়োজন থাকতে পারে। তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি তাঁর সঙ্গের লোককেও সাথে নিয়ে যেতেন। দাওয়াতকারীকে বলতেন আমার সঙ্গে ইনিও আছেন। এখন তুমি ইচ্ছা করলে এঁকে চলে যেতে বলতে পারো। আল হাদিস।

বয়োজ্যেষ্ঠ ও ধর্মীয় নেতাগণের সঙ্গে তাঁদের সেবক ও অনুসারীরা থাকেন এবং এরূপ থাকা বৈধ। বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এরূপস্থলে দাওয়াতকারীকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া উচিত এবং উচিত তার অনুমতি নেওয়া।

রসুলেপাক স. কোনো দলের সঙ্গে আহার করলে তাদের জন্য দোয়ায়ে খায়ের না করে সেখান থেকে উঠে আসতেন না। দোয়া করতেন এভাবে— আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাক্তাহুম ওয়াগ্ ফিরলাহুম ওয়ার্ হামহুম।

অষ্টম প্রকার ঃ পোশাক পরিচ্ছদ

রসুলে আকরম স. পরিচ্ছদের ব্যাপারে বড়লোকী এবং আতিশয্য দেখাতেন না। স্বাভাবিকভাবে যখন যা পেতেন, তাই পরিধান করতেন। সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ কোনো পোশাক অন্বেষণ করতেন না। কোনো বিশেষ অবস্থায় উন্নতমানের পোশাক-পরিচ্ছদের আকাংখাও করতেন না। আবার নিকৃষ্টমানের পোশাকও ব্যবহার করতেন না। ঘরে যা থাকতো এবং যা পেতেন তাই পরিধান করতেন। প্রয়োজন যাতে পূর্ণ হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। অধিকাংশ সময় শক্ত ও মোটা কাপড়ের চাদর, পিরহান এবং লুঙ্গি পরিধান করতেন। কখনও কখনও শালও পরিধান করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি যে চাদরটি পরিধান করতেন, তার মধ্যে কয়েকটি তালি লাগানো ছিলো। তিনি বলতেন, আমি বান্দা তাই বান্দার মতো পরিচ্ছদ ব্যবহার করি। বোখারী, মুসলিম। অনারব সম্রাটের কাছ থেকে উন্নতমানের পোশাক হাদিয়া হিসেবে পেলে তাদের মনোতুষ্টির জন্য তা পরিধান করতেন বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তা শরীর থেকে খুলে ফেলতেন এবং অন্যকে দান করে দিতেন। দানের ক্ষেত্রে সহৃদয়তা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা রক্ষা করতেন। জাঁকজমকপূর্ণ বস্ত্র পরিধান করা এবং তা নিয়ে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করা সম্মানার্হ ব্যক্তিদের সম্মানানুকুল নয়। এরকম করে রমণীরা। পরিধেয় বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা, মধ্যম মানের বস্ত্র পরিধান করা এবং সর্বসাধারণসদৃশ হওয়া প্রশংসনীয় এবং ব্যক্তিত্বসম্মত ব্যাপার। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিকট মুমিনদের অধিকতর পছন্দনীয় সৌন্দর্য হচ্ছে, পরিধেয় পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অল্পে পরিতুষ্ট থাকা। তিনি স. ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় অপছন্দ করতেন। একবার তিনি স. খুব ময়লা কাপড় পরিহিত এক লোককে দেখে বললেন, ওর কি কিছুই নেই? সে তার কাপড় তো পরিষ্কার করে নিতে পারে? আর একবার মাথার চুল উসকো খুসকো এবং অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রধারী এক লোককে দেখে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোকও আছে? 'এমন' বলে তিনি বুঝিয়ে ছিলেন শয়তানকে।

'সফরুস সায়াদাত' গ্রন্থে রয়েছে, রসুল স. পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে প্রদর্শনপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর পরে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ হয়েছে পোশাকবিলাসী। আবার কেউ কেউ হয়েছে শক্ত ও মোটা পোশাক পরিধানে হঠকারী। দু'টো প্রথাই নবুওয়াতী পদ্ধতির পরিপন্থী। মধ্যমমানের জীবনযাত্রা এবং অনাড়ম্বর ও লৌকিকতাবিহীন জীবনযাপনই প্রশংসনীয়। অবশ্য পরবর্তী যুগের আলেম, যাহেদ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তিবর্গ অনাড়ম্বরভাবেই জীবনযাপন করে গিয়াছেন। হাদিস শরীফেও এধরনের জীবনযাপনের ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ জীবনযাপন

ইমানের অঙ্গ। আবার সুসজ্জিত ও সুন্দর জীবনযাপন এবং পরিচ্ছন্ন পরিধেয় ধারনের ব্যাপারেও হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলেপাক স. আত্মপ্রদর্শন ও আত্মম্ভরিতার নিন্দা করতেন। একবার সাহাবা কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! মানুষ তো চায় তার কাপড়-চোপড় এবং পাদুকা উন্নতমানের হোক, তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কিন্তু অহংকার পছন্দ করেন না। অহংকার অর্থ অবাধ্যাচরণ। মোট কথা, বেশ-ভূষা সুন্দর হওয়ার নাম অহংকার নয়। অহংকার হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্যাচরণ। অন্য এক হাদিসে এসেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা পাক সাফ। আর পাক সাফ থাকাই তাঁর পছন্দ। জনৈক সাহাবী বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. আমাকে একবার কমদামী কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি কি বিত্তবান? আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে অনেক দিয়েছেন। উট, বকরী সবই আছে আমার। তিনি স. বললেন, তাহলে তো তোমার শরীরে আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো উচিত। তাঁর এমতো শুভবচনের অর্থ— তোমরা যারা বিত্তবান, তারা বিত্তবানদের মতো পরিচ্ছদ পরিধান করো এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন সম্পদ দিয়েছেন, তখন তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তোমাকে ধন দিয়েছেন, তখন তোমার উচিত তোমার দেহে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ ঘটানো। অবিন্যস্ত কেশবিশিষ্ট কাউকে দেখলে তিনি বলতেন, লোকটি কি এমন কিছু পায় না, যার দ্বারা সে তার চুলগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে পারে। অপরিস্কার পরিচ্ছদধারী কাউকে দেখলে বলতেন, লোকটি কি এমন কিছু পায় না, যার দ্বারা সে তার পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে নিতে পারে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা পছন্দ করেন, তাঁর বান্দার উপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব প্রতিফলিত হোক। সুতরাং এমতো বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে হতে হবে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য— কৃতজ্ঞতাবোধের বহিঃপ্রকাশ। 'লেবাসুত্তাকওয়া' (আল্লাহ্‌ভীতির পোশাক) দ্বারা সেই অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের কথাটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন হে মানুষ! আমি তোমাদের উপর এমন পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের আবরণীয় স্থানসমূহ আচ্ছাদিত করে এবং তোমাদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং অবতীর্ণ করেছি তাকওয়ার পোশাক'। সুতরাং মানুষের উচিত তার বাহির ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা। হৃদয় ও রসনাকে করা সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধতার আকর। শরীরকে পাক রাখতে হবে। পরিষ্কার করতে হবে বগল ও নাভির নিচের পশম। খতনা করা, হাত পায়ের নখ কাটাও বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্ত। এটা ফিতরতের দাবী। ফিতরত অর্থ শুদ্ধ ও সুস্থ স্বভাব। আর ফিতরত

পূর্ববর্তী নবীগণেরও সুন্নত। ফিতরতের আমলসমূহের মূল ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত। উত্তম পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মপ্রদর্শন, আত্মম্ভরিতা, চাকচিক্য জাহির, নফসের প্রতাপ প্রকাশ, দরিদ্র জনতার উপর প্রাধান্য বিস্তার ও তাদের অন্তরকে আহত করা, তাহলে তা হবে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। যেমন মুনাফিকদের নিন্দায় বলা হয়েছে— 'যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদের দেহ দেখে তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে' হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও বৈভব দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম মুসলিম থেকে। কোনো কোনো বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক অবয়ব ও আমল দেখেন না, দেখেন তোমাদের হৃদয় ও হৃদয়জ উদ্দেশ্য।

সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ও সাজসজ্জা করার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রদর্শন, জ্ঞানের মহিমা প্রকাশ, ধর্মের সম্মান ও সৌন্দর্য বিকীরণ এবং ধর্মীয় বিধানের অনুসরণ, তবে তা হবে প্রশংসনীয়। তাই দেখা যায়, অনেক আলেম, যাহেদ ও আবেদ উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের পোশাক পরিধান করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের নিয়ত ভালো ছিলো। রসুল স. বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন। জুমা ও দুই ঈদের দিন সাজসজ্জা করতেন। এসকল দিনের জন্য আলাদা পোশাক সংরক্ষণ করে রাখতেন। আলেমগণ বলেন, বিশেষ দিনে বিশেষ পোশাক পরিধান করা, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র সঞ্চালন, জাঁকজমক পূর্ণ পোশাকের মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্য যদি থাকে, তাহলে তা হবে কাফেরদের অন্তর্জ্বালার কারণ এবং তা হবে প্রশংসনীয়ও।

কোনো কোনো মহৎব্যক্তি উন্নতমানের পোশাক পরিধান করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, অভাবী লোকেরা যেনো তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং প্রার্থী হয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার সুযোগ পায়। এরকম নিয়তে দামী পোশাক পরিধান করা প্রশংসনীয় কাজ। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য এর বিপরীত আচরণ নিন্দার্হ। অর্থাৎ কৃপণতার কারণে অভাবী মানুষের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য যদি ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরে যদি কোনো বিত্তবান নিজের দূরবস্থা জাহির করে, অথবা এরকম করে অন্যের কাছে কিছু পাওয়ার আশায়, তবে তা হবে নিন্দনীয়। আবার পৃথিবীর বিত্তবৈভবের প্রতি নিরাসক্তি এবং অল্পে তুষ্টির কারণে যদি কেউ বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ বর্জন করে, তাহলে তা হবে প্রশংসনীয়। উপরোক্ত নিয়তগুলোর কোনোকিছুই যদি না থাকে, তাহলে তা নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কোনোটাই হবে না। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, নামী-দামী পোশাক মূলতঃ অবৈধ নয়। কিন্তু এরকম পোশাক পরার পিছনে কী উদ্দেশ্য বিদ্যমান এবং সে উদ্দেশ্য নিন্দার্হ, না প্রশংসার্হ— সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অভিমত রয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শাযালিয়া তরিকার পীরানে কেরাম পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। অথচ তাঁরা ছিলেন সুন্নতের এবং সলফে সালেহীনের একনিষ্ঠ অনুগামী। সলফে সালেহীন তো পরিধান করতেন অসুন্দর ও জীর্ণ বসন। এর কারণ কী? প্রশ্নটির সমাধানার্থে কোনো কোনো আরেফ বলেছেন, সলফে সালেহীন যখন দেখলেন, উদাসীন এবং পৃথিবীপ্রসক্ত লোকেরা পোশাকবিলাসী হয়ে পড়েছে, বিত্তবৈভব নিয়ে প্রদর্শন করছে দম্ভ এবং এ নিয়ে তারা বেশ মগ্ন, তখন ওই মহৎ ব্যক্তিবর্গ তাদের বিরুদ্ধাচরণার্থে জীর্ণ বসন পরিধান করতে শুরু করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো, উদাসীন লোকেরা যাকে মূল্যবান মনে করে, তাকে নগণ্য ও তুচ্ছ সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্‌তায়ালা ওগুলোর নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতা সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন— 'যে সব জিনিসের প্রতি এ সব গাফেলরা এতো লালায়িত, তারা এগুলি থেকে অমুখাপেক্ষী। তারা এ সব লোভনীয় জিনিসের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও উদাসীন'। এখানে 'তারা' অর্থ আল্লাহ্‌প্রেমিকেরা। তাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়ামতরূপে যা পেতেন, তার শুকরিয়া আদায় করতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা দিলো বিভ্রাট। মানুষ হয়ে গেলো ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন। হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেলো তাদের। কেউ আবার জীর্ণ বস্ত্র পরে ধর্মের নামে শুরু করলো ভণ্ডামী। অবস্থা বিপরীত হয়ে গেলো। যে তরিকা ছিলো তরকে দুনিয়ার, তা-ই হয়ে গেলো দুনিয়া অন্বেষণের মাধ্যম। তাই কোনো কোনো মুহাক্কিক তরীকতপন্থী, যেমন শাযালিয়া তরিকার মাশায়েখ ও তাঁদের অনুসারীরা পূর্বের নিয়ম ছেড়ে দিলেন। তাঁরা পুরাতন ও জীর্ণ পোশাক বর্জন করলেন। তাঁরা এ নিয়ম (পুরাতন জীর্ণ পোশাক পরা) পরিত্যাগের বিষয়টিকে হেকমত ও হকীকতের দৃষ্টিতে সলফে সালেহীনের অনুরূপই মনে করলেন, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা ছিলো সলফে সালেহীনের অভ্যাসের পরিপন্থী।

শাযালিয়া তরিকার ওস্তাদ আবুল হাসান বলেছেন, জীর্ণ বস্ত্র পরিধানকারীদের কেউ যদি প্রশ্নের অবতারণা করে, আমরা কেনো তাদের মতো পোশাক পরি না, তবে আমাদের সুন্দর পোশাকই তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয় যে— আলহামদু লিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। কেননা আমরা কারো মুখাপেক্ষী নই। পক্ষান্তরে তাদের পোশাকই একথা জানিয়ে দেয় যে, তারা অভাবগ্রস্ত ও অভাব মোচনের ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ তারা যেনো কিছু চায়। শাযালিয়া তরিকাপন্থীদের এই কাজ হেকমতের গণ্ডির ভিতরে নিতান্তই অর্থপূর্ণ এবং শুভউদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এখন আমরা আলোচনা করবো রসুল স. এর বিভিন্ন পোশাক-আশাক নিয়ে। যেমন— পাগড়ি।

রসুলেপাক স. এর পাগড়ি মুবারক এতো ভারী ও বড় ছিলো না যে, মাথায় ভার মনে হতো। আবার এতো ছোট ও হালকাও ছিলো না যে, মাথার মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে যেতো। বর্ণিত আছে, পাগড়ি মুবারক শরয়ী গজের চৌদ্দ গজ অতিক্রম করতো না। আবার কখনও শরয়ী গজের সাত গজও হতো। আর শরয়ী গজ বলা হয় এক হাতকে, যা হাতের মধ্যমাঙ্গুলি থেকে কনুই পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ দু'বিঘত (চব্বিশ আঙ্গুলের সমপরিমাণ)। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্' কালেমা শরীফে রয়েছে চব্বিশটি অক্ষর। চব্বিশ অক্ষরের গণনা অনুসারে চব্বিশ আঙ্গুলে হয় এক হাত। আর এই মাপকেই বলা হয় শরয়ী গজ। তবে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন হাউস মাপার ক্ষেত্রে গজ বলতে কাপড় মাপার গজকেও ধরা হয়ে থাকে। এ গজটি অবশ্য সব জাতি এবং সব কালেই প্রচলিত ছিলো, যা তিন ফুট বা ছত্রিশ ইঞ্চিতে হয়ে থাকে। অবশ্য এ মাপ পাগড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। ওয়াল্লহু আ'লাম। আলেমগণ বলেন, নির্দিষ্ট মাপের কিছু কমবেশী হলে তা ক্ষমাযোগ্য।

এক হাদিসে এসেছে, পাগড়ি হচ্ছে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্যকারী। তা হচ্ছে ওই পাগড়ি, যা শামলা (পুচ্ছ)বিশিষ্ট। হাদিসের বর্ণনা দ্বারা একথাই বুঝা যায়। অথবা শামলা বলা হয় পাগড়ির এক প্রান্তকে, যা দু'কাঁধের মধ্যখান দিয়ে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রসুলে আকরম স. এর একটি পাগড়ির নাম ছিলো 'সাহাব'। তাঁর ঘোড়া, কাপড়, বাহনের প্রাণী— সবকিছুরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিলো। ওগুলোর বর্ণনা এই পুস্তকের শেষাংশে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। তিনি স. পাগড়ির নিচে মাথায় লেগে থাকে এমন টুপি পরিধান করতেন। ওই টুপি মাথায় নিচু হয়ে লেগে থাকতো, রাজমুকুটের মতো উঁচু হয়ে থাকতো না। তাঁর টুপি ছিলো শাদা। তিনি স. বলেছেন, আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা। বাক্যটির অর্থ হতে পারে দু'রকম— ১. আমাদের পাগড়ির নিচে টুপি থাকে, আর তাদের পাগড়ির নিচে টুপি থাকে না ২. তারা পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করে। তবে প্রথম অর্থটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা কাফেরেরাও পাগড়ি পরে। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা।

রসুলেপাক স. যখন পাগড়ি পরিধান করতেন, তখন সদল করতেন। অর্থাৎ পাগড়ির প্রান্তদেশ ঝুলিয়ে দিতেন। এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি তাঁর 'শামায়েল' গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— নিশ্চয়ই তিনি পাগড়ির প্রান্ত দু'কাঁধের মধ্যখানে ঝুলিয়ে

দিতেন। এই ঝুলিয়ে দেওয়া প্রান্তকে যাওয়াবা অথবা শামলা বলা হয়। একে আরো বলা হয়— পাগড়ির সুন্নত। হজরত ইবনে ওমর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. পাগড়ি বাঁধার সময় তদবীর করতেন, অর্থাৎ গোল করে বাঁধতেন। পাগড়ির মধ্যভাগ মাথায় পেচিয়ে নিতেন এবং পাগড়ির এক প্রান্ত পাগড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন, আর অপর প্রান্তটি ঝুলিয়ে দিতেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আমর ইবনে হারীছ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুল স.কে মিম্বরের উপর কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, যার একটি প্রান্ত দু'কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলানো ছিলো। হজরত জাবের রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে গমন করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ি। এই হাদিসে শামলার উল্লেখ নেই। এতে করে বুঝা যায়, শামলা সব স্থানে সর্বদা থাকতো না। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কাবিজয়ের দিন যখন রসুল স. মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিলো শিরস্ত্রাণ। আলেমগণ বলেন, মক্কাবিজয়ের দিন তাঁর শরীর ছিলো অস্ত্রসজ্জিত এবং তাঁর মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি ছিলো না। রসুলেপাক স. বিভিন্ন স্থানে সেখানকার উপযোগী পোশাক পরিধান করতেন। বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে কোনো কোনো আলেম বর্ণনা করেছেন, তিনি স. সেদিন শিরস্ত্রাণের উপর পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। কাযী আয়ায বলেছেন, তিনি স. যখন মক্কায় প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মস্তকে ছিলো শিরস্ত্রাণ। আর প্রবেশ করার পর তিনি স. কালো পাগড়ির উপর শিরস্ত্রাণ বেঁধেছিলেন। একথার প্রমাণ রয়েছে হজরত আমর ইবনে হারীছের বর্ণনায়। তিনি বলেন, রসুলেপাক স. তখন খুতবা দিয়েছিলেন, আর তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ি। খুতবা দিয়েছিলেন তিনি কাবাগৃহের দরজার উপর দাঁড়িয়ে, যখন বিজয় সমাপ্ত হয়েছিলো। ইবনে আরাবী বলেন, প্রথম সমাধানটির তুলনায় পরবর্তী সমাধানটি বেশী সুস্পষ্ট। এর বিস্তারিত বর্ণনা 'মক্কাবিজয়' অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেছেন, রসুল স. আমার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। তখন আমার পিঠের দিকে দু'কাঁধের মধ্যখানে পাগড়ির প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে এসেছিলো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায়।

বিদ্বানগণ বলেন, পাগড়ির শামলা কমপক্ষে চার আঙুল হতে হবে। আর তা লম্বা হতে পারবে কোমরের অর্ধেক পর্যন্ত। এর অধিক হলে তা হবে হারাম ও মাকরুহ। আর শামলার জায়গায় তাহকীক করার কথাটিও বর্ণিত হয়েছে। তাহকীক হচ্ছে পাগড়ির শামলাটি বাম দিক দিয়ে মস্তক থেকে চিবুকের দিকে বের করে দিয়ে অপর প্রান্তটি ডান দিক দিয়ে পাগড়ির সঙ্গে আড়াআড়ি মিলিয়ে

নেওয়া। তাঁরা আরো বলেন, তাহকীক বা শামলা ব্যতীত পাগড়ি বাঁধা মাকরুহ হবে, যখন পাগড়িকে ধরা হবে সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। আর যদি মাকরুহকে ধরা হয় মাকরুহে তানযিহী, তবে তার অর্থ হবে— উত্তমতা বর্জন (অর্থাৎ শামলা বা তাহকীক বর্জন উত্তমতাবিরোধী)।

জামা ও লুঙ্গি

রসুলেপাক স. এর জামা মুবারকের আস্তিন কবজি পর্যন্ত লম্বা হতো। এর চেয়ে বেশী লম্বা হওয়া দ্রুত হস্তসঞ্চালন এবং কোনোকিছু সহজে ধরার অন্তরায়। আবার এর চেয়ে কম হলে ঠাণ্ডা ও গরম থেকে হাতকে বাঁচানো যায় না। রসুলেপাক স. এর সকল কাজ ছিলো অর্থবহ এবং হেকমতপূর্ণ, যার ভিত্তি ছিলো ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের উপর। সে পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জামা ও চাদর হতো নিসফে সাক পর্যন্ত লম্বা। আর তিনি স. লুঙ্গি কখনও টাখনুর নিচে পরিধান করতেন না। এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে এসেছে বহুবচনার্থক শব্দ 'আনসাফ'। আর 'নিসফ' যে ঠিক ঠিক অর্ধেক বা মাঝামাঝি, তা নয়। কম বা বেশীও হতে পারে। তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেন, একবার রসুল স. দেখলেন, আমার লুঙ্গি টাখনুর নিচে চলে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে ইবনে ওমর! যে কাপড় মৃত্তিকা স্পর্শ করে, তা দোজখে যাবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে চলে যায়, তা দোজখে যাবে। হুকুমটি প্রযোজ্য কেবল পুরুষের বেলায়। মেয়েদের জন্য এর চেয়ে লম্বা করা এবং ঝুলিয়ে দেওয়া জায়েয। একবার হজরত উম্মে সালমা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মেয়েরা কী করবে? তিনি বললেন, এক বিঘত বাড়িয়ে দিতে পারে। হজরত উম্মে সালমা বললেন, তার পরও তো পা বের হয়ে থাকে। তাহলে এক হাত বাড়িয়ে নেই? বিধানটি লুঙ্গি ও জামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকাশ থাকে যে, কাপড়ের আঁচল যমীন স্পর্শ করা রমণীদের জন্য জায়েয।

জেনে রাখা উচিত যে, এসবাল কেবল মাত্র লুঙ্গির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। বরং পাগড়ি ও জামার ক্ষেত্রেও বিধানটি প্রয়োগযোগ্য। যেমন হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, এসবাল করতে হয় লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ির বেলায়, যে ব্যক্তি এগুলি অহংকারের নিয়তে ঝুলিয়ে পরবে। আল হাদিস। তবে অধিকাংশ হাদিসে এসেছে, লুঙ্গিতে এসবাল হয়ে থাকে এর ব্যবহার যেহেতু বেশী হয়ে থাকে, তাই। আবার এসবাল শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় ছাওব (কাপড়) শব্দটির সাথে। তবে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রাপ্ত ধারণাটি পাগড়ির ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। পাগড়ির ক্ষেত্রে এসবাল যদি মানা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে শামলাকে সীমাতিরিক্ত লম্বা করে দেয়া। আর জামার বেলায় ধরা হলে বুঝতে হবে— জামার আস্তিন লম্বা করে দেওয়া। যেমন হেজাযবাসীদের অভ্যাস। এসব

কিছুও এসবালের মধ্যে পরিগণিত। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা ইবনে কাইয়ুমের বরাত দিয়ে বলেছেন, থলের মতো লম্বা আস্তিন, আর মিনারের মতো উঁচু পাগড়ি বাঁধার রেওয়াজ নতুন তৈরী। নবী করীম স. এরকম করেননি। তাঁর কোনো সাহাবীও এরকম করেননি। সুতরাং তা সুন্নতের পরিপন্থী, আত্ম-গরিমা ও আত্মহংকারমূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জ্ঞানবান ও দিব্যজ্ঞানধারীগণের নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, এরকম অপ-রেওয়াজ অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অপচয় হচ্ছে শরিয়তবিরুদ্ধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন হিসেবে যদি চালু হয়ে যায়, তবে সেগুলোর কথা ভিন্ন। কিন্তু তা কখনো অহমিকা প্রকাশক হতে পারবে না। কেননা অহমিকা সর্বাবস্থায় হারাম।

কাযী আয়ায বলেছেন, যা স্বাভাবিকতার অধিক, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাধারণ লম্বা ও চওড়ার চেয়ে বেশী, তা মাকরুহ। পোশাক লম্বা ও চওড়া হওয়ার ক্ষেত্রে হারাম ও মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে উপরোল্লেখিত আলেমগণের উক্তি সুস্পষ্ট। তবে এসব ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক চিহ্নের কথা বলাতে বৈধতার দিকেই ইশারা করা হয়েছে বলে মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এধরনের লোককে মাযুর (নিরুপায়) হিসেবেই পরিগণিত করা হয়েছে। হারামাইন শরীফাইনের কোনো কোনো জ্ঞানপ্রবীণকে এরূপ বলতে শোনা গেছে যে, লেবাসের এরূপ মাপ ও অলংকরণ আমাদের শেআর বা জাতীয় চিহ্ন হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছে (তাঁদের জামা নিসফে সাক ছেড়ে টাখনু পর্যন্ত লম্বা হয় এবং পাগড়ির পরিবর্তে মাথার উপর রুমাল রেখে দেওয়া হয়। আর তার উপর শেমাল বাঁধা হয়)। এরূপ না করা হলে আমাদেরকে সনাক্ত করা যাবে না এবং আমাদের ইয্যত-সম্মান শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁদের এরূপ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে, এরকম শেআর বা জাতীয় চিহ্ন আবিষ্কার করা হলো কেনো, যা সুন্নতের খেলাফ? ওয়াল্লহু আ'লাম।

মোট কথা, লুঙ্গি ইত্যাদি লম্বা করা, এসবাল করা এবং তা হারাম বা মাকরুহ হওয়া সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা এসেছে তা ধর্তব্য হবে তখন, যখন এসবালটি করা হবে দর্প-দাপট প্রকাশার্থে। যেখানে এরূপ করা হবে না, যেমন ওজরবশত, অথবা অন্য কোনো কারণে, তখন তা হবে মাকরুহ, হারাম হবে না। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অভ্যাস এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, তাঁর লুঙ্গি নিচে ঝুলে যেতো এবং তা এসবালেরই পর্যায়ে পড়ে। যখন এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার লুঙ্গির অবস্থা তো এরকম। এখন আমি কী করবো? তিনি স. বললেন, তুমি ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকারী।

জেনে রাখা উচিত যে, এখানে 'ইযার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ লুঙ্গি। আজমীগণ ইযার বলতে যা বুঝায়, আরবগণ তাকে বলে সিরওয়াল বা

পাজামা। এখানে ইযার বলে পাজামাকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে লুঙ্গিকে। তবে রসুলেপাক স. পাজামা পরিধান করেছেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো আলেম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, রসুল স. কখনোই পাজামা পরিধান করেননি। আবার আবু ইয়া'লা মুসেলী তাঁর 'মসনদ' পুস্তকে শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হুরায়রা বলেছেন, আমি একদিন রসুল স. এর সঙ্গে বাজারে গেলাম। তিনি বাজার থেকে চার দিরহাম দিয়ে একটি পাজামা ক্রয় করলেন। বাজারে ছিলো একজন দিরহাম ওজনকারী। তিনি স. তাকে বললেন, তুমি দিরহামগুলি ঠিক ঠিক ওজন করে দাও। সে বললো, এমন কথা তো আমি কখনও শুনিনি! আমি বললাম, তোমার জন্য আফসোস, তুমি কি জানো না যে, ইনি আমাদের নবী। একথা শুনে লোকটি তার নিক্তি ছেড়ে দিয়ে রসুল স. এর হস্ত চুম্বন করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু তিনি স. তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, থামো। এরকম তো করে আজমীরা তাদের বাদশাহদের সঙ্গে। আমি বাদশাহ নই। আমি তোমাদের মধ্যের একজন। একথা বলে রসুল স. পাজামাটি নিয়ে নিলেন। আমি চাইছিলাম, পাজামাটি আমি উঠিয়ে নিবো। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি বললেন, মাল বহন করার অধিকার বেশী মালিকের। তবে সে দুর্বল হলে অথবা অন্য কোনো কারণে অক্ষম হয়ে গেলে অন্যের উচিত হবে তাকে মাল বহনে সহায়তা করা। হজরত আবু হুরায়রা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি পাজামাটি কি নিজে পরিধান করার জন্য ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি গৃহবাসকালে ও সফরে সবসময় এটা পরিধান করবো। কেননা আবরণীয় অঙ্গ আবৃত করার ব্যাপারে আমাকে খুব তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর আমি এ ছাড়া অধিক আবরণযোগ্য আর অন্য কোনো পোশাক দেখি না। হাদিসটি আরো অনেক মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকল সূত্রই শিথিল। তবে তিনি স. যে পাজামা ক্রয় করেছেন, সে ব্যাপারে বিশুদ্ধ বিবরণ রয়েছে। 'হেদায়া' পুস্তকে আছে, রসুল স. তা নিজে পরিধান করার জন্যই ক্রয় করেছিলেন। এরকম বিবরণও এসেছে যে, তিনি স. তা নিজে পরিধান করেছেন এবং তাঁর অনুমতি পেয়ে সাহাবীগণও পরিধান করেছেন। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

রসুলেপাক স. এর প্রিয় পোশাক ছিলো কামীয বা জামা, যদিও তিনি বেশী পরিধান করতেন চাদর ও লুঙ্গি। তবে জামা পরিধান করাই ছিলো তাঁর কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর জামা মুবারক সুতির ছিলো এবং তার আস্তিন ও দামন (আঁচল বা নিচের অংশ) ছিলো সংকীর্ণ। তাঁর জামার মধ্যে ঘুণ্ডি লাগানো ছিলো। মুহাদ্দেছীনে কেরাম ও আরবদেশসমূহের সকলের কাছেই একথা সুবিদিত যে, রসুলেপাক স. এর জামার

বুক পকেট ছিলো। আর এটা জামার একটি সুন্নত। মাওয়ারাউন্নাহার ও ভারতবর্ষে কাঁধের দু'দিকে ঘুণ্ডি লাগানো যে জামা প্রচলিত, আরব দেশে তা প্রচলিত মহিলাদের মধ্যে। আরব দেশের জামায় বুকের উপর ঘুণ্ডি লাগানো থাকে। আর অনারব শহরে ব্যবহৃত হয় এর বিপরীত।

একটি ঘটনা

একদিন আমি হেরেম শরীফে আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের দেশের রীতি অনুযায়ী তার জামার দু'কাঁধে ঘুণ্ডি লাগানো ছিলো। একজন আরব দেশীয় আলেম তার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে সাঈয়েদ! কী দেখছেন? তিনি বললেন, এ লোকটির কি লজ্জা হয় না? সে যে মেয়েদের মতো পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্র হেরেমে বসে আছে।

মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি একবার রসুলেপাক স. এর দরবারে তাঁর অনুসরণের উদ্দেশ্যে গমন করলাম। দেখলাম, তাঁর জামার ঘুণ্ডি খোলা। আমি তাঁর জামার পকেটের দিক থেকে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম। তিরমিজি। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, হাদিসটি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুল স. এর জামা মুবারকে পকেট ছিলো। বিষয়টি যাঁর জানা নেই, তিনি তার বিপরীত কথাই বলবেন। রসুলেপাক স. এর চাদর মুবারকের দৈর্ঘ্য ছিলো শরিয়তী চার গজ, অর্থাৎ চার হাত এবং তার প্রস্থ ছিলো আড়াই হাত। হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি একবার রসুল স. এর দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। আর লুঙ্গিটি নড়াচড়া করছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর লুঙ্গি সামনের দিকে কিছুটা ঝুলে থাকতো, আর পিছন দিকে থাকতো কিছুটা উঁচু। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি রসুলেপাক স.কে নাভির নিচে (সংলগ্ন অবস্থায়) লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর নাভি মুবারক দেখা যেতো। আবার আমি হজরত ইবনে ওমরকে নাভির উপর লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি। হজরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা আশআরী বলেন, শবে মারকাতে উম্মতজননী আয়েশা সিদ্দীকা আমাদেরকে রসুলেপাক স. এর লুঙ্গি ও চাদর বের করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, রসুলুল্লহ স. এই কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই প্রস্থান করেছেন। হজরত আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আয়েশার নিকট রসুল স. এর জুব্বা মুবারক ছিলো। তাঁর ইন্তেকালের পর সে জুব্বা আমি নিয়ে নেই এবং রোগমুক্তির জন্য আমি তা ধৌত করে মানুষকে পানি পান করাই।

রসুলেপাক স. সংকীর্ণ আস্তিনের রুমি জুব্বাও পরিধান করতেন। ওজুর সময় বাহু আস্তিনের ভিতর থেকে বের করে আস্তিনদয় কাঁধের উপর অথবা পিঠের উপর রাখতেন। তারপর হাত ধৌত করতেন। এরকম করতেন সফর অবস্থায়। কেননা ভ্রমণ কালেই তিনি সংকীর্ণ পোশাক পরিধান করতেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. হেররা পরতে ভালোবাসতেন। হেররা হলো এক প্রকারের চাদর, যাতে লাল রঙের ডোরা থাকে। হজরত জাবের ইবনে সামুরা বলেন, আমি একবার এক চাঁদনী রাতে রসুল স.কে দেখলাম। তখন তাঁর শরীরে ছিলো লাল রঙের এক জোড়া কাপড়। ওই সময় আমি কখনও তাঁর দিকে, আবার কখনও চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকি। তখন আমার মনে হয়, রসুল স. চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর। হজরত বারা ইবনে আজীব বলেন, আমি ওরকম কাউকে দেখিনি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এমন কোনোকিছুকে দেখিনি, যা রসুল স. এর চেয়ে অধিক সুন্দর, যখন তিনি লাল জোড়াকাপড় পরিধান করেন। এক বিবরণে এসেছে, কুঞ্চিত বাবরিচুলবিশিষ্ট লাল জোড়াকাপড় পরিহিত কোনো ব্যক্তিকে রসুল স. এর চেয়ে সুন্দর কখনও দেখিনি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হুলিয়া মুবারকের বর্ণনায়। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. দুই ঈদ ও জুমার নামাজে লাল হুল্লা পরিধান করতেন। হুল্লা হচ্ছে জোড়া কাপড়, অর্থাৎ চাদর ও লুঙ্গি। হুল্লা বলা হয় দু'প্রস্থ কাপড়কে। অথবা ওই কাপড়কে, যার দু'টি আস্তর থাকে। আর হামরা বা আহমার বলা হয় ওই কাপড়কে, যার মধ্যে লাল রঙের ডোরা থাকে। যেমন আজকাল আমাদের দেশেও দেখা যায়। এ ধরনের চাদরকেই বুরদে ইয়ামানী বলা হয়। কেননা তখনকার বুরদে ইয়ামানীতে লাল রঙের ডোরা ছিলো। এ কথার অর্থ এই নয় যে, চাদরের সবটুকু লাল ছিলো। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ লাল কাপড় (পুরুষদের জন্য) পরিধান করা নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেন, একবার রসুল স. আমার দেহে লাল রঙের পোশাক দেখে বললেন, এ হচ্ছে কাফেরদের পোশাক। এরকম পোশাক পরিধান কোরো না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেন, একবার আমি রসুলুল্লাহ স. এর দরবারে হাজির হলাম। তখন আমার পরনে ছিলো লাল রঙের পোশাক। তিনি স. বললেন, তুমি এটা কোথেকে পেয়েছো? আমি বললাম, এটা আমার স্ত্রী আমার জন্য তৈরী করেছে। তিনি বললেন, এটাকে জ্বালিয়ে দাও। বুরদে ইয়ামানী হাদিস থেকে কারও মনে এমতো খটকা সৃষ্টি হতে পারে যে, লাল পোশাক পরিধান করা তো জায়েয। কিন্তু ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। লাল বলতে ওই হাদিসে বুঝানো হয়েছে লাল ডোরা হওয়া। ঠিক তদ্রূপ সবুজ রঙের ব্যাপারে হজরত আসমা বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.কে দেখেছি, তিনি সবুজ রঙের দু'টি চাদর পরিহিত ছিলেন। আতা ইবনে আবু ইয়া'লার বর্ণনায় এসেছে, আমার পিতা বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স.কে সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় তওয়াফ করতে দেখেছি। এখানেও সবুজ চাদর অর্থ ওই চাদর, যার মধ্যে ছিলো সবুজ ডোরা কাটা, যদিও এক্ষেত্রে নিরেট সবুজ হওয়ারও

সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আরব দেশে সবুজ বলতে সবুজ ডোরা কাটা এবং হলুদ বলতে হলুদ ডোরা কাটা হওয়াই প্রচলিত। কোনো কোনো লোক মনে করে হুলা অর্থ রেশমী বস্ত্র। তাদের এ ধারণাটিও ভুল।

'মাওয়াহেব' প্রণেতা ইমাম নববী সূত্রে লাল রঙের ব্যাপারে আলেমগণের মতানৈক্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাহাবা, তাবেঈন এবং তাঁদের পরে আলেমগণের একটি দল লাল রঙের পোশাক ব্যবহার করাকে মোবাহ বলেছেন। ইমাম নববী বলেছেন, এই অভিমতের সপক্ষে ছিলেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক। কিন্তু ইমাম মালেক এ কথাও বলেছেন যে, লাল রঙ ছাড়া অন্য রঙ উত্তম। এক বর্ণনায় এসেছে, লাল রঙের পোশাক ঘরে পরিধান করা জায়েয। মহফিল বা বাজারে পরিধান করা মাকরুহ। এরকম বলেছেন উক্ত ইমামগণ। এক দল অভিমত পোষণ করেন, লাল রঙের পোশাক পরিধান করা মাকরুহে তানযিহী। তাঁদের মতে নিষিদ্ধ অর্থ এখানে মাকরুহ তানযিহী কেননা রসুল স. লাল রঙের জোড়া চাদর পরিধান করেছেন। এর উত্তর পূর্বেই দেয়া হয়েছে যে, সে চাদর নিরেট লাল ছিলো না, বরং লাল রঙের ডোরা কাটা ছিলো। কেউ কেউ আবার লাল রঙের পোশাক পরিধান করার নিষিদ্ধতার বিষয়টিকে হজ ও ওমরার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এটিও একটি বাড়াবাড়ি। কেননা বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করার কোনো প্রমাণ নেই। হানাফী মাজহাবেও এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে মাকরুহে তাহরিমী। এরকম পোশাক পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েয, কিন্তু তা সম্পন্ন হবে মাকরুহের সাথে। প্রখ্যাত হানাফী আলেম শায়েখ কাসেম তাহক্বীক্ব করে বলেছেন, রঙ হিসেবে লাল রঙের পোশাক মাকরুহ— চাই তাতে হলুদ রঙ মিশ্রিত থাক, অথবা না থাক।

'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেছেন, ইমাম বায়হাকী তাঁর 'মারেফাতে সুনান' পুস্তকে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী এক লোককে জাফরান রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছিলেন এবং হলুদ রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করাকে মোবাহ বলেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছি এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমি এমন কোনো একজন লোককেও পাইনি, যে হলুদ রঙ পরিধান করার ব্যাপারে রসুল স. থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তবে হজরত আলীর ওই বচনখানি স্বতন্ত্র, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাকে এরকম করতে নিষেধ করেছেন। তবে আমি বলি না যে, এ বিষয়ে তোমাদেরকেও মানা করা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, নিঃসন্দেহে এ ধরণের হাদিস নিষিদ্ধতা প্রমাণকারী। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ওটা হচ্ছে কাফেরদের

পোশাক। তারপর ইমাম বায়হাকী আরও কতিপয় হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সকল হাদিস যদি ইমাম শাফেয়ীর কাছে পৌঁছতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় হলুদ কাপড় পরিধান নিষেধ— এ নীতির অনুসারী হয়ে যেতেন। তারপর ইমাম বায়হাকী তাঁর নিজ সূত্রে বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী একথা বলেছেন এবং তা যে বিশুদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, আমার কথার পরে যদি কোনো সহীহ্ হাদিস পাওয়া যায়, তবে তোমরা ওই হাদিসের উপর আমল কোরো এবং আমার কথা বর্জন কোরো। বায়হাকী বলেন, ইমাম শাফেয়ী জাফরানী রঙের ব্যাপারে সুন্নতের অনুসরণ করেছেন (অর্থাৎ তা সুন্নতের খেলাফ) তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে উক্ত জাফরানী রঙ ধুয়ে ফেলতে বলেছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে তো হলুদ রঙের ব্যাপারে তা আরও বেশী প্রযোজ্য হবে। সুতরাং জানা গেলো, হলুদ ও জাফরানী রঙের কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আবার হাদিস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. জাফরানী রঙ থেকে দূরে থাকতে হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন এর বিপরীত। বলেছেন, রসুল স. জাফরানী রঙ দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করেছেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, জাফরানী রঙ দ্বারা তিনি তাঁর বস্ত্রাবলী রাঙাতেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর জামা ও পাগড়িতে রঙ লাগাতেন। এরকম বর্ণনা করেছেন দিময়িয়াতী। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর পরিচ্ছদ জাফরান দ্বারা রঙিন করতেন— এমনকি পাগড়িও। হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম, হজরত ইবনে সালামা এবং হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। আলেমগণ বলেন, এসকল হাদিস নিষিদ্ধকারী হাদিসসমূহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী নয়। অথবা তাঁরা বলেছেন, এ সকল হাদিসের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব জানেন কেবল আল্লাহ্।

রসুলে আকরম স. শাদা পোশাক পরিধান করতে বেশী পছন্দ করতেন। বলতেন, সুন্দরতম পোশাক হচ্ছে শাদা পোশাক। জীবিতদের পোশাক এবং মৃতদের কাফন শাদাই হওয়া উচিত। কখনো কখনো তিনি কালো কম্বলও পরিধান করতেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. প্রাতঃকালে কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে বাইরে যেতেন। আর পাগড়ি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মক্কাবিজয়ের দিন তিনি যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ি। তাই কালো পাগড়ি পরিধান করা মোস্তাহাব। হানাফী মাজহাবের মতও তাই। রসুল স. পশমী কাপড়ও পরিধান করেছেন। তবে চাদর পরিধান করার ক্ষেত্রে তাদলীস করা মাকরুহ। তাদলীস হচ্ছে, চাদর পরিধান করার সময় চাদরের দুপার্শ্ব দু'কাঁধের উপর জড়িয়ে রাখা। ইবনে কাইয়ুম জাওজী আবার এরকম করাকে মাকরুহ বলেছেন। কেননা এভাবে চাদর পরিধান

করার ব্যাপারে রসুল স. থেকে কোনো বর্ণনা নেই। সাহাবীগণ থেকেও নেই। বরং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, দাজ্জালের সাথে সত্তর হাজার ইসপাহানের ইহুদী আবির্ভূত হবে, যারা কাঁধে চাদর তাদলীস করবে। একদিন হজরত আনাস একদল লোককে চাদর তাদলীস করে পরিধান করতে দেখে বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! তোমরা দেখছি ইহুদীদের মতো চাদর পরিধান করেছো। আবু দাউদ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, যদি কেউ কোনো কাওমের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তবে সে হবে তাদেরই দলভুক্ত। তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অবশ্য হিজরতের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. তখন চাদর পেঁচিয়ে গায়ে দিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অবশ্য তার কারণ ছিলো, নিজেকে ভালোভাবে আড়াল করা, যাতে মানুষ তাঁকে চিনতে না পারে। এভাবে চাদর গায়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিলো না।

ইবনে কাইয়ূম জাওজীর বর্ণনায় রসুল স. চাদর তাদলীস করে পরিধান করেছেন বলে উল্লেখ নেই— কথাটি ভুল। কেননা আলেমগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. ওভাবে চাদর পরিধান করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। তাঁর অভ্যাস ওরকম ছিলো না— এমন কোনো বর্ণনাও নেই। বরং হজরত সাহাল ইবনে সাঈদীর বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. অধিকাংশ সময় চাদর পেঁচিয়ে পরিধান করতেন। বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ঈমান' গ্রন্থে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বায়হাকীর উক্ত গ্রন্থ এবং ইবনে সা'দের 'তবাকাত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. অধিকাংশ সময় চাদর পেঁচিয়ে গায়ে দিতেন। এই হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস ইবনে কাইয়ূমের উক্তি খণ্ডনকারী। হজরত কুররা ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, আমি একবার রসুল স.কে একটি ফেৎনা প্রসঙ্গে বলতে শুনলাম— ওই ফেৎনাটি অতিশীঘ্র প্রকাশ পাবে। এমন সময় একজন লোক চাদর পেঁচিয়ে নিজেকে আড়াল করে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি স. তাঁকে দেখে বললেন, সেইদিন এই লোকটি হেদায়েতের উপর থাকবে। একথা শোনার পর আমি লোকটিকে দেখার জন্য দাঁড়ালাম। দেখলাম, লোকটি হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান। সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন, আবদুল আলা বলেন, আমি ইমাম হাসান ইবনে আলীকে মাথার উপর চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নামাজ পড়তে দেখেছি। ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, সুলায়মান ইবনে মুগীরা বলেছেন, আমি হজরত ইমাম হাসানকে চাদরে আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখেছি। ইবনে কাইয়ূম ইহুদীদের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে তখন, যখন চাদর পেঁচানো কর্মটি সাব্যস্ত হবে ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে। নিঃসন্দেহে এ কালে তাদের

নিয়ম-নীতি বদলে গিয়েছে। সুতরাং এখন এ কাজটি সাধারণভাবে জায়েযের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। শায়েখ ইয্যুদ্দীন আবদুস সালাম বলেছেন, যে অভ্যাস মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে, তা পরিত্যাগ করা বেআদবী। বলা হয়েছে, হজরত আনাসের চাদরের ব্যাপারে রসুল স. সমালোচনা করেছিলেন চাদরের রঙের কারণে। তখন তাঁর চাদরের রঙ ছিলো হলুদ। এ সকল আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে। বড় বড় মাশায়েখ থেকে কথিত আছে, তাঁরা চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত হতেন। 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থে রয়েছে, গউসুল আজম শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী চাদর পেঁচিয়ে পরতেন। খুব সম্ভব ইবনে কাইয়্যুম জাওজী অস্বীকার করণার্থেই একথা বলেছেন। কেননা তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা শায়েখ আবদুল কাদের জীলানীর বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন। এর আলামত তাঁর শরীর মুবারকেও প্রকাশিত ছিলো। দেহ মুবারকের স্পর্শধন্য ছিলো বলে তাঁর কাপড় চোপড় কখনো ময়লা হতো না। তাঁর দেহে ও বস্ত্রে উকুনও জন্মাতো না। তাঁর পবিত্র দেহে কখনও মাছি বসতো না। হাদিস শরীফসমূহে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম আহমদ তাঁর 'মসনদ' এবং তিরমিজি তাঁর 'শামায়েল' গ্রন্থে হজরত আয়েশা থেকে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তার সাথে উপরোক্ত বর্ণনার দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে একবার প্রশ্ন করা হলো, রসুলেপাক স. যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন কী করতেন? তিনি বলেছিলেন, রসুলেপাক স. তখন তাঁর কাপড়ে উকুন খুঁজতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন, অথবা তাঁর পাদুকা সেলাই করতেন। এর সমাধানে আলেমগণ বলেছেন, সম্ভবত অন্য কারও শরীর থেকে তাঁর শরীরে উকুন এসে থাকবে, তাঁর পবিত্র দেহে উকুন হতো না। অথবা উত্তর এরকমও হতে পারে যে, 'ইউফ্লী' অর্থ ময়লা কুটা ফেলে দেওয়া। অথবা ওই পিপীলিকা কাপড় বা শরীর থেকে ফেলে দেওয়া, যা মাটি থেকে মানুষের শরীরে উঠে। মোট কথা, এদ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, রসুলেপাক স. তাঁর কাপড় ও শরীরের ব্যাপারে যত্নবান থাকতেন। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। এ মিসকীনের (গ্রন্থকারের) মস্তিকে এই ধারণাটিই স্থান লাভ করেছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে— তাঁর প্রতি অপার সম্মান ও ভক্তির কারণে উকুন তাঁকে কষ্ট দিতো না। একথার দ্বারা অবশ্য কষ্ট না দেওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু উকুন না থাকাতো প্রমাণিত হয় না। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, মালযুমকে নফী করা দ্বারা লাযেম এর নফীর দিকেই ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে উকুনের কষ্ট না দেওয়া দ্বারা উকুন না থাকাই বুঝানো হয়েছে।

আঙটি

রসুলেপাক স. এর আঙটি ছিলো। তিনি তা পরিধানও করতেন। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. এর আঙটি ছিলো রৌপ্যের। আঙটিটি তিনি ব্যবহার করতেন। তারপর তা ব্যবহার করতেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তারপর হজরত ওমর। তারপর হজরত ওসমান। হজরত ওসমানের পর এক সময় তা বিরে রীসে পড়ে যায়। রীস একটি কূপের নাম, যা ছিলো মসজিদে কোবার সন্নিকটে। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, আঙটিটি হজরত মুআইকিবের হাত থেকে বিরে রীসে পড়ে গিয়েছিলো। হজরত মুআইকিব ছিলেন হজরত ওসমানের খাদেম। তিনিও সাহাবী ছিলেন। বর্ণিত আছে, কূপে পড়ে যাবার পর উক্ত আঙটিটি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। কূপের পানি ফেলে দিয়ে কূপ পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছিলো। তবুও কাজ হয়নি। আলেমগণ বলেন, আঙটিখানি ছিলো রহস্যময়। ওই আঙটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলো দেশ ও জাতির শৃংখলার বিষয়টি, হজরত সুলায়মানের আঙটি যেমন ছিলো। আঙটি হারিয়ে যাওয়ার পর তাঁর রাজ্যে নেমে এসেছিলো বিভেদ ও স্থবিরতা। আর রসুলুল্লাহ্ স. এর আঙটি হারিয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন ফেৎনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো, যা শুরু হয়েছিলো হজরত ওসমানের শাহাদতের মাধ্যমে। কিন্তু ফেৎনার শেষ এখনো হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ফেৎনা এবং খুন-খারাবী চলতেই থাকবে।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, নবী করীম স. এর আঙটি ছিলো রূপার, যার মাঝখানে বসানো ছিলো হাবশী পাথর। 'হাবশী' এর কয়েকটি অর্থ হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হাবশী মানে কালো পাথর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই পাথর যা হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) উৎপন্ন হয়। আবার কারো কারো অভিমত, আঙটি নির্মাতা ছিলো হাবশার অধিবাসী। রসুলেপাক স. এর আঙটির রঙ বা ঝালাইকৃত অংশ থাকতো তাঁর হাতের ভিতরের দিকে।

এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. একবার এক ব্যক্তির হাতে লোহার আঙটি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি তোমার হাতে দোজখীদের অলংকার দেখতে পাচ্ছি যে? তারপর বললেন, তুমি রূপার আঙটি তৈরী করে নাও এবং তা এক মিছকাল, অর্থাৎ সাড়ে তিন মাশার অধিক কোরো না। এক বর্ণনায় এসেছে, পুরাপুরি তিন মাশা কোরো না। আরেক ব্যক্তি একবার তাঁর কাছে এলো হাতে পিতলের আঙটি পরে, যে পিতল দ্বারা মূর্তি নির্মিত হয়। পিতল যেহেতু স্বর্ণের মতো দেখতে, তাই আরবের লোকেরা তাকে বলে শিবহ। রসুল স. দেখে বললেন, মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি যে? কী হলো আমার? সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আঙটিটি তার হাত থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তিরমিজির হাদিসে এসেছে, 'মিন সাফরিন' কথাটি। 'সাফর' এর অর্থ পিতল। সুতরাং রাং ও পিতলের আঙটি ব্যবহার করা

মাকরুহ। তবে লোহার আঙটি ব্যবহার করা যে জায়েয, সে কথা বোখারী ও মুসলিমের হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, স্বামীর কাছে স্বেচ্ছাসমর্পিতা এক নারীকে লক্ষ্য করে রসুল স. বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বামীর কাছে একটি লোহার আঙটি হলেও চাও। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা লোহার আঙটি পরিধান করা যদি জায়েয প্রমাণ করা হয়, তাহলে তা ঠিক হবে না। কেননা হাদিসটির সূত্রপরম্পরা শিথিল। তাছাড়া এর দ্বারা তা পরিধান করা যে জায়েয, তা-ও বুঝা যায় না। বরং এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে মহর হিসেবে অল্প ও তুচ্ছ জিনিসও স্ত্রীর প্রাপ্য। 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে হজরত মুআইকিব থেকে উৎকৃষ্ট সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর লোহার আঙটির উপর রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়া ছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

স্বর্ণের আঙটি সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত বারা ইবনে আজীব ও হজরত আবু হুরায়রা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. স্বর্ণের আঙটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. একবার স্বর্ণের আঙটি বানিয়ে পরলেন। সাহাবীগণও তাই করলেন। এমতাবস্থায় একদিন তিনি স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে হাত থেকে আঙটিটি খুলে ফেলে দিলেন। সাহাবীগণও তাঁর অনুকরণ করলেন। তখন তিনি স. স্বর্ণের আঙটি তৈরী করতে নিষেধ করে দিলেন। চার ইমাম ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত এরকমই। কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণ স্বর্ণের আঙটি রাখতেন। কিন্তু হাদিসগুলো দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। বোখারী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন— হজরত আবু উবায়েদ ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। মৃত্যুর সময় তাঁর হাত থেকে স্বর্ণের আঙটিটি খুলে নেওয়া হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় স্বর্ণের আঙটি খুলে ফেলার পর কোনো সাহাবীই তা কুড়িয়ে নেননি। কেউ কেউ বলেছিলেন, তোমরা আঙটি কুড়িয়ে নিচ্ছো না কেনো? তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, আল্লাহ্র রসুল যা হারাম করেছেন, তা আমরা উঠিয়ে নিতে পারি না। তাঁরা কাজটিকে মাকরুহ মনে করতেন।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, তোমরা আকীকের আঙটি পরিধান কোরো, আর ডান হাতই সৌন্দর্যের জন্য বেশী উপযোগী। এক বর্ণনায় এসেছে, আকীকের আঙটি পরিধান কোরো। কেননা তা অভাব দূর করে। হজরত আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, তা বরকতময়। হজরত ফাতেমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, যে আকীকের আঙটি পরিধান করবে, সে কল্যাণ দেখতে পাবে। আরও অনেক হাদিসে আকীক পাথরের আঙটির ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। তবে আলেমগণ বলেন, রসুলেপাক স. আকীক ব্যবহার করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, হলুদ ইয়াকুত পাথর ব্যবহার করলে প্লেগ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে এ হাদিসের সূত্রপরম্পরা দুর্বল।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর আঙটি রূপার ছিলো এবং তার নাগিনাও রূপার ছিলো। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর আঙটি রূপার ছিলো, আর নাগিনা ছিলো হাবশী পাথরের, যেমন ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আলেমগণ বলেন, এমনও হতে পারে যে, তাঁর আঙটি ছিলো দু'টি। একটি পরতেন, আবার কখনও পরতেন অপরটি। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর আঙটিতে 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্' নকশা করা ছিলো। তিনি অন্যান্যদের এরকম করতে নিষেধ করেছেন। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আঙটির নকশাটি ছিলো তিন লাইনবিশিষ্ট। এক লাইনে 'মুহাম্মাদ', দ্বিতীয় লাইনে 'রসুল' আর তৃতীয় লাইনে 'আল্লাহ্'। ফতহুল বারী গ্রন্থে রয়েছে, লেখাটি ছিলো এরকম— 'মুহাম্মদ', এর উপরে 'রসুল', মধ্যে 'আল্লাহ্'। আবার কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, 'আল্লাহ্' শব্দটি ছিলো উপরে, 'মুহাম্মাদ' নিচে এবং 'রসুল' মধ্যখানে। আমি কিন্তু কোনো হাদিসে এরকম পাইনি। বরং বোখারীর বর্ণনা এর বিপরীত। সেখানে বলা হয়েছে প্রথম লাইনে 'মুহাম্মদ' দ্বিতীয় লাইনে 'রসুল' আর তৃতীয় লাইনে 'আল্লাহ্'। 'মাওয়াহেব' প্রণেতাও এরকম বলেছেন। উভয় হাতে আঙটি ধারণ করা যায়— এ মর্মে অধিকাংশ খবর ও আছারে বর্ণনা এসেছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, ডান বা বাম, যে কোনো হাতে আঙটি পরিধান করা জায়েয। তবে কোন হাতে ব্যবহার করা উত্তম, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, বাম হাতে ব্যবহার করা উত্তম। ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেছেন। আর সালেহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমার মতে বাম হাতে আঙটি পরিধান করা উত্তম। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতও তাই। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এই আঙ্গুলে আঙটি পরিধান করতেন। একথা বলে তিনি বাম হাতের কণিষ্ঠাঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বাম হাতে আঙটি পরিধান করতেন। কোনো কোনো হাফেজে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ সাধারণত বাম হাতে আঙটি পরিধান করতেন। আবার কোনো কোনো আলেম ডান হাতে আঙটি পরিধান করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মত পোষণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর। তাঁরা রসুলেপাক স. ডান হাতে আঙটি পরিধান করেছেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন। সে জন্য কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, রসুল স. কখনও বাম হাতে, আবার কখনও ডান হাতে আঙটি পরিধান করেছেন। আর তাঁরা এরকমও বলেন যে, বাম হাতে পরিধান করতেন তিনি শেষের দিকে। অর্থাৎ ডান হাতে পরিধান করার বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে। তবে কথাটি সঠিক কিনা,

সে ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কোনোকিছুর স্মারক হিসেবে তিনি স. তাঁর আঙটিতে কখনও কখনও চিহ্ন বেঁধে রাখতেন, যাতে ভুলে না যান।

দুই বা ততোধিক আঙটি ব্যবহার করা মাকরুহ, বিশেষ করে রূপার আঙটি। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেন, হাদিসসমূহের ভাষ্য দৃষ্টে মাকরুহ বলেই মনে হয়— তবে হারাম নয়। আসলে আঙটি পরিধান করার বিষয়টিই মতভেদময়। অধিকাংশ বিদ্বান কাজটিকে মোবাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আঙটি পরিধান করা মাকরুহ হবে না, অর্থাৎ জায়েয হবে— অধিকাংশ আলেমই এরূপ মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পুরুষদের জন্য অলংকার হিসেবে আঙটি পরিধান করা মাকরুহ। আবার কেউ কেউ এটাকে সাধারণভাবেই মাকরুহ বলেছেন। তবে রাজা, বাদশাহ্ বা শাসকদের জন্য আঙটি ব্যবহার করা মাকরুহ নয়। হাদিস শরীফে এরূপ বর্ণনাই এসেছে। রসুল স.ও আঙটি বানিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যেই। যখন তিনি স. সে সময়ের পারস্য, রোম ও আবিসিনিয়ার অধিপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ করতে চাইলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, সিলমোহর ব্যতীত তারা কোনো চিঠি গ্রহণ করবে না। তখনই তিনি আঙটি বানিয়ে তার মধ্যে 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' নকশা করিয়ে নিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার আঙটি পরিধান করাকে সাধারণভাবে মাকরুহ বলেছেন। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে ওই সকল হাদিস উপস্থাপন করেন, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আঙটি বানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা পরিধান করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, কিছুদিন পরিধান করেছিলেন। তারপর খুলে রেখে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

মোজা

রসুলেপাক স. মোজা পরিধান করেছেন। আর তাঁর মোজার উপর মসেহ করার বর্ণনা বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরায়দা বলেছেন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী রসুলেপাক স. এর জন্য শাদা ও কালো দু'জোড়া মোজা নজরানা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পরিধান করতেন এবং তার উপর মসেহ করতেন। হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, দাহিয়াতুল কালবী রসুল স. এর জন্য দু'টি মোজা পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পরিধান করেছেন।

পাদুকা

রসুলেপাক স. পাদুকা পরিধান করতেন। পা যদি সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে, তাহলে তাকে মোজা বলা হয়। আর তা না হলে তাকে বলে পাদুকা। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুলেপাক স. এর পাদুকার ফিতা ছিলো

দু'টি। ফিতা দু'টি মিলিত হয়ে দু'আঙ্গুলের মধ্যখানে থাকতো। তিরমিজি তাঁর 'শামায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর পাদুকার দু'টি ফিতা ছিলো, যা ছিলো দু'স্তরবিশিষ্ট। হজরত আবু হুরায়রা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুতা পরিধান করতে চায়, তাহলে সে যেনো ডান পা থেকে আরম্ভ করে। আর খোলার সময় যেনো খোলে বাম পা থেকে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. এক জুতা পরিধান করে চলতে বারণ করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, এটি একটি অস্বাভাবিক কাজ এবং এতে করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এতে করে কোনো রোগেরও সৃষ্টি হতে পারে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. ঘরের ভিতরে এক জুতাও পরিধান করেছেন। তিনি স. সম্ভবত কোনো জিনিস উঠানোর জন্য ওরকম করে থাকতেন। অথবা দূরত্ব কম ছিলো বলে তিনি এমন করেছিলেন। কিংবা একদিকের পায়ে ধূলি মিশ্রিত হওয়ার আশংকা ছিলো, তাই হয়তো এক পায়ে জুতা পরিধান করেছেন। তাছাড়া এক জুতা পরিধান করা যে জায়েয, তা বুঝানোর জন্যও হয়তো তিনি ওরকম করে থাকতে পারেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে আবু দাউদ ও তিরমিজি থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

কোনো কোনো আলেম তাঁর পবিত্র পাদুকার আকৃতি ও নকশা সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোতে তাঁরা তাঁর পাদুকার বরকত, উপকারিতা এবং ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ব্যাথাযুক্ত স্থানে নালাইন শরীফের নকশা স্থাপন করলে ব্যাথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সঙ্গে রাখলে চোর ডাকাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। শয়তানের ধোকা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। হিংসুকের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। রাস্তার দূরত্ব সহজেই অতিক্রম করা যায়। নালাইন শরীফের প্রশংসা ও ফযীলত সম্পর্কে বহু কবিতাও রচিত হয়েছে।

শয্যা

রসুলেপাক স. এর পবিত্র শয্যা সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, তাঁর শয্যা ছিলো চামড়ার। তার ভিতরে ছিলো খেজুর গাছের ছাল। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, একবার আমার নিকট এক আনসারী মহিলা এসে রসুল স. এর বিছানা মুবারক দেখলো, যা ছিলো দু'স্তরবিশিষ্ট চটের তৈরী। তারপর সেই মহিলা পশম ভর্তি একটি বিছানা পাঠিয়ে দিলো। রসুল স. যখন তাঁর আগের বিছানাটি দেখতে পেলেন না, তখন জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! এটা কী? বললাম, হে আল্লাহ্‌র

রসুল! অমুক আনসারী মহিলা এসে আপনার বিছানা দেখার পর এটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, আয়েশা! বিছানাটি ফিরিয়ে দাও। আমি চাইলে আল্লাহ্ আমার কাছে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় হাজির করে দিতেন। অর্থাৎ আমার এই বিচানাই কাম্য, যা আমার ধ্যান-সাধনার অনুকূল। এ বিছানা দারিদ্র ও অভাবের প্রতীক নয়। বরং প্রভুপালনকর্তার মহব্বত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমি এটাকে গ্রহণ করেছি। ইমাম আহমদ তাঁর 'মসনদ' পুস্তকে, ইবনে হেব্বান তাঁর 'সহীহ্' কিতাবে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর ফারুক রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন চাটাইয়ের উপর আরাম করছিলেন। তাঁর পবিত্র দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিলো। সে দাগ দেখে হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি নরম বিছানা গ্রহণ করতেন। তিনি স. বললেন, দুনিয়া থেকে আমি কী গ্রহণ করবো? আমার এবং দুনিয়ার উপমা এরকম— যেমন এক পথিক উত্তাপের মধ্যে পথ চলছে। পথিমধ্যে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কিছু সময় সে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে রইলো। তারপর আবার উঠে যাত্রা শুরু করলো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার আমি রসুলেপাক স. সকাশে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি গরম একটি কুঠুরীতে চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে আছেন, আর চাটাইয়ের চিহ্ন লেগে আছে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে। আমি এ অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি জেগে উঠে বললেন, আবদুল্লাহ্! কাঁদছো কেনো? আমি বললাম, কায়সার ও কিসরা (রোম ও পারস্যের সম্রাট) রেশমের ফরাশে শয়ন করে, আর আপনি চাটাইয়ের উপর। তিনি স. বললেন, আবদুল্লাহ্! কেঁদো না। তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখেরাত। এই হাদিসের বক্তব্য হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বর্ণনায় আরও অধিক বিস্তারিতভাবে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যখন তিনি চাটাইয়ের উপর বিশ্রাম করছিলেন, তখন তাঁর গৃহকোণে এক সা পরিমাণ যব পড়ে রয়েছিলো। আর দেয়ালে লটকানো ছিলো একখণ্ড চামড়া। এ দৃশ্য দেখে আমার চোখ থেকে পানি পড়তে শুরু করলো। রসুল স. বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! ক্রন্দন করছো কেনো! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! কাঁদবো না কেনো? কায়সার ও কিসরা নয়নাভিরাম উদ্যানস্থিত ঝর্ণাধারা পার্শ্বে স্বর্ণের পালংকে রেশমের বিছানায় শয়ন করে, আর আপনি আল্লাহ্র নবী হয়ে শুয়ে আছেন চাটাইয়ের উপর। তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি একথা জেনে প্রীত নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখেরাত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, চাটাইয়ের উপর অল্প কিছু মাটি পড়ে ছিলো। আর তাঁর মাথার নিচে ছিলো চটের বা খেজুরের ছালভর্তি বালিশ। তখন তিনি স. বলেছিলেন, তারা ওই সম্প্রদায়, যাদেরকে দুনিয়ার ভালো ভালো জিনিস দ্রুত

দেওয়া হয়েছে, আর আমরা ওই সম্প্রদায়, যাদেরকে ভালো ভালো জিনিস দেওয়া হবে বিলম্বে, আখেরাতে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. এর জন্য যদি বিছানা করে দেওয়া হতো, তবে তিনি তার উপর বিশ্রাম করতেন। অন্যথায় মাটিতেই শুয়ে পড়তেন।

নবম প্রকার— বিবাহবিষয়ক আলোচনা

এখন আমরা আলোচনা করবো রসুলে আকরম স. এর বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে। জেনে রাখা উচিত যে, বিবাহ অর্থাৎ শরীরের অধিকার পরিপূরণ স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম। বীর্য দেহে আবদ্ধ করে রাখা এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তা দেহ থেকে বের না করাকে অভ্যাসে পরিণত করা শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ। এতে করে শিরা শুকিয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। যেমন কুচিন্তা, উন্মাদনা, মৃগী রোগ ইত্যাদি। তবে দৈহিক সম্ভোগের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে; শারীরিক সামর্থ্য ও স্বভাবের ভারসাম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং স্ত্রীগমন মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না। যার কামশক্তি বেশী, তার জন্য সহবাস বর্জন একটি ক্ষতিকর বিষয়। রসুলেপাক স. এর শারীরিক শক্তি ছিলো অন্যের চেয়ে বেশী। তাউস এবং মুজাহিদ থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স.কে চল্লিশ জন পুরুষের সমান শারীরিক শক্তি দেওয়া হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে বেহেশতী চল্লিশজন পুরুষের চেয়ে বেশী পানাহার এবং স্ত্রী সহবাসের শক্তি দান করা হয়েছিলো। ইমাম আহমদ ও নাসায়ীর একটি সুপরিণত বর্ণনায় এসেছে, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, বেহেশতবাসী পুরুষকে দুনিয়ার একশ পুরুষের সমান ভোজনক্ষমতা, দৈহিক শক্তি এবং স্ত্রীসহবাসের সামর্থ্য দেওয়া হবে। সাফওয়ান ইবনে সুলায়ম থেকে এক সুপরিণত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একদিন জিবরাইল এক ডেগ রান্না করা খাবার নিয়ে এলেন এবং আমি তা থেকে কিছু খেয়ে নিলাম। এভাবে আমাকে চল্লিশজন পুরুষের সমান সহবাসক্ষমতা দেওয়া হলো। কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, ওই ডেগটিতে ছিলো 'হারীসা'। হারীসা অর্থ খিচুড়ি। অবশ্য মুহাদ্দেছীনে কেরাম হাদিসটিকে মওজু বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহ কোরো, কেননা যার স্ত্রীসংখ্যা বেশী, সে সর্বোত্তম। এমতো উক্তির দ্বারা তিনি রসুল স. এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন— এরকমও হতে পারে। অথবা সাধারণভাবে একথা সকলের জন্য প্রযোজ্য। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এই হাদিসের মাধ্যমে রসুলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণের সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। বান্দা মিসকীন (গ্রন্থকার) বলেন, এদ্বারা সমস্ত উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, আরববাসী পুরুষরা সহবাসের শক্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বীরত্ব প্রকাশ করতেন। বিষয়টি সর্বজনসমর্থিত।

অধিক বিবাহ উত্তম। এ বিষয়ে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, রসুলেপাক স. স্বয়ং কাজটিকে গৌরবান্বিত করেছেন। অধিক বিবাহের সীমা নির্ধারণ করেছেন চারজন স্বাধীনা রমণী পর্যন্ত। কাজটিকে মোবাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুল স. এর আকাঙ্খিত রমণীগণকে তাঁর জন্য হালাল না করা পর্যন্ত তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। সহধর্মিনীগণের জন্য তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিলো তীব্র ভালোবাসা। এমর্মে তিনি স. বলেছেন, আমি পানাহার পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু স্ত্রীগমন পরিহার করতে পারি না। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে চারটি বিষয়ে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে— ১. দানশীলতা, ২. অধিক সহবাসক্ষমতা, ৩. বীরত্ব এবং ৪. কঠিন বাস্তবতা। তিবরানী। এতে করে বুঝা যায়, স্ত্রী সহবাসে সমর্থ হওয়া হচ্ছে মানবীয় পূর্ণতা।

হজরত ইব্রাহীম খলিল আ. এর পত্নী হজরত সারা ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। হজরত হাজেরাও তাঁর পত্নী ছিলেন। তিনি হজরত হাজেরার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বুরাকে সওয়ার হয়ে শাম দেশ থেকে চলে আসতেন। কেননা তিনি তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাঁর বিরহ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নবী দাউদের নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিলেন। তারপরও তাঁর অন্তরে এমতো সদিচ্ছা জেগেছিলো যে, তিনি স্ত্রীগণের সংখ্যা একশ' পূর্ণ করবেন। নবী সুলায়মানেরও নিরানব্বইজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁদের সকলের কাছেই নিয়মিত গমন করতেন। তাঁর শরীরে একশ পুরুষের শক্তি ছিলো। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর তিনশত স্ত্রী ও এক হাজার ক্রীতদাসী ছিলো। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। এসকল বিবরণ দৃষ্টে যেনো এমন ধারণা না হয় যে, হজরত সুলায়মান আ. রসুলে করীম স. অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী ছিলেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর মর্যাদার ধারে কাছেও হজরত সুলায়মান নন। প্রয়োজন মিটে যায়, এমন অবস্থাকেই তিনি স. যথেষ্ট মনে করতেন। অপর দিকে হজরত সুলায়মান ছিলেন একাধারে নবী ও সম্রাট। তাঁকে এমন রাজত্ব দেওয়া হয়েছিলো, যা তাঁর পরবর্তী কাউকেই দেওয়া হয়নি। তাই বুঝতে হবে, স্ত্রীসংখ্যার আধিক্য ছিলো তাঁর রাজমহিমার অঙ্গ। আর নবী করীম স. এর নবুওয়াত এবং জীবন ছিলো ইবাদতপ্রধান। তাই তিনি দরবেশীর জিন্দেগী গ্রহণ করেছিলেন।

সহবাসশক্তি ছিলো রসুল স. এর অন্যতম একটি মোজেজা। তিনি এক রাতে তাঁর সকল পত্নীর সঙ্গে মিলিত হতে পারতেন। তাঁর বিবিগণের সংখ্যা ছিলো এগারো। এক বর্ণনানুসারে তাঁরা ছিলেন নয়জন। অত্যধিক পরিমাণে জৈবিক শক্তি থাকার কারণেই তিনি সওমে বেসাল করতেন এবং ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতেন। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে তা থেকে শারীরিক বলশক্তি অর্জনের নিয়মটি রসুল স. এর জন্য বিধিবদ্ধ ছিলো না। তাছাড়া তাঁর

দৈহিক সৌন্দর্য, দেহবর্ণের আভা, শোভা ও নূরের চমক— সাধারণভাবে সুস্বাদু খাবার গ্রহণ, কোমল পরিচ্ছদ ধারণ এবং সুন্দর শয্যাগ্রহণের কারণে ছিলো না। অর্থাৎ তাঁর কোনোকিছুই নিরেট পৃথিবীসম্পৃক্ত ছিলো না। এতদসত্ত্বেও পার্থিব দৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। সুতরাং বুঝতে হবে তাঁর সৌন্দর্য, সামর্থ্য সবকিছুই মোজেজা। অবশ্য কোনো কোনো নবী ছিলেন চিরকুমার। বিবাহবিহীন। আবার কারো কারো স্ত্রী ছিলো অল্পসংখ্যক। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ কোনো হেকমতের কারণেই হয়তো ওরকম হয়েছিলো। সে কারণে রসুলেপাক স. এর অধিক বিবাহের বিষয়টিকে দোষ হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবেই না। এরকম অপধারণা থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাইতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে অন্যের তুলনায় তাঁর এই বিশেষত্বটি, তাঁর ফযীলত ও কামালাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোনো কোনো বিশুদ্ধ সাধক, যারা অজ্ঞতা ও বৈরাগ্যের কারণে এ বিষয়ে সুন্দর আকীদার বিপরীত পথে চলে, তারা বিষয়টিকে কেবল জৈবিক আস্বাদন বলে মনে করে থাকে। তারা অনুধাবন করতে পারে না যে, এর মধ্যে এমন ভেদ, রহস্য ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে, যা অন্য কোনো কিছুতে নেই। রসুলেপাক স. এর কার্যাবলী যে সুন্দর, তাঁর রুচি যে অত্যধিক সূক্ষ্ম ও পবিত্র, তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর এই অধিক স্ত্রী গ্রহণ।

বিবাহ ও সহবাসের মধ্যে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান উপকারিতা হচ্ছে উত্তম বংশধারা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবজাতির ক্রমধারার নিশ্চিত করা। এ ধারা ওই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ অনুমোদন করেন। তাছাড়া জৈবিক চাহিদা পূরণ, আস্বাদ গ্রহণ, দেহসম্ভোগজনিত পরিতৃপ্তি ইত্যাদি আল্লাহ্র নেয়ামত। আর এটি এমন একটি নেয়ামত, যা বেহেশতেও থাকবে। তবে সেখানকার সহবাস হবে বংশবৃদ্ধি এবং বীর্যস্খলন বিবর্জিত।

বিবাহ দ্বারা আরও অনেক উপকার সাধিত হয়। যেমন— দৃষ্টি প্রখর হয়। শুক্র নিষ্ক্রমণ হওয়ার ফলে ক্ষতিকর অনেক কিছু দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। নারী ও পুরুষ নফসের গোনাহ থেকে রক্ষা পায়। বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা তৈরী হয়। বিশেষ করে স্বামী আরেকটি ফায়দা লাভ করতে সক্ষম হয়। তা হচ্ছে— স্ত্রীর হক আদায় করতে গিয়ে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয় এবং স্ত্রীর অসদাচরণ ও অসৌজন্যমূলক কথা-বার্তায় স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। এগুলো বড়ই পুণ্যের কাজ। এর জন্য সওয়াব পাওয়া যায় অনেক। এ সকল প্রাপ্তিতে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন আমাদের প্রিয়তম রসুল। এভাবেই তিনি পরিপূর্ণ হয়েছিলেন ইবাদতে। হানাফী মাজহাব মতে অবিবাহিত থাকার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। রসুলেপাক স. তাঁর উম্মতকে এ

বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। বলেছেন, তোমরা মহব্বতকারিনী ও বেশী সন্তানদানকারিনী রমণীদেরকে বিবাহ কোরো, যেনো আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করতে পারি। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, আমি স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করি তাদের প্রতি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং এই আশায় যে, আল্লাহ্ যেনো আমাকে এমন সন্তান দান করেন, যাকে নিয়ে রসুল স. কিয়ামতের দিন গর্ব করতে পারেন।

রসুলেপাক স. ওই ব্যক্তিকে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা রোজা যৌনশক্তি অবদমনকারী এবং বংশ নির্মূলকারী। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সওয়াবের দিক দিয়ে রোজার চেয়ে বিবাহ বড়। কেননা রসুল স. ওই ব্যক্তিকে রোজা রাখতে বলেছেন, যে বিবাহ করতে অসমর্থ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যাবৃদ্ধিই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে তা অবশ্যই রোজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। রসুলেপাক স. বলেছেন, ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্য অর্থ বিবাহবর্জন। বিবাহবর্জন যদি উত্তম হতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ধর্ম, যা সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাতে বিবাহবর্জনকে শরিয়তসম্মত করা হতো।

রসুলেপাক স. এর অধিক বিবাহের কারণ

অধিক বিবাহ রসুল স. এর জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিলো। এবং এতে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যও নিহিত ছিলো। আর তন্মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের ইসলামী বিধানসমূহের প্রচার। আর একটি কারণ ছিলো, তাঁর মহাপুণ্যবতী সহধর্মিনীগণ যেনো তাঁর পবিত্র জীবনের সকল দিক সম্পর্কে অবহিত হয়ে অন্যকে তা জানাতে পারেন, যা পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর একান্ত সন্নিধানে আসতে পেরেছিলেন তাঁদের পিতা অথবা পিতৃব্যের মৃত্যুর পর। যেমন সাইয়্যেদা উম্মে সাফিয়া এবং হজরত উম্মে হাবীবা। তাঁদের পিতা রসুলুল্লাহ্ স. এর দুশমন ছিলো। তাঁরা যদি রসুলুল্লাহ্ স. এর জীবনসঙ্গিনী না হতে পারতেন, তবে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিতই হতে পারতেন না। ফলে মানবীয় স্বভাবের চাহিদা অনুসারে তাঁরা তাঁদের আপন আপন পিতা ও নিকটজনদের প্রতিই আকৃষ্ট থাকতেন। সুতরাং স্ত্রীগণের আধিক্য ছিলো রসুলেপাক স. এর মোজেজা এবং জাহেরী ও বাতেনী পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ।

একটি প্রশ্ন ঃ হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমাদের পৃথিবীর তিনটি জিনিস আমার প্রিয়— নামাজ, নারী ও সৌগন্ধ। এ ব্যাপারে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'এহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে, আল্লামা যমখশরী তাঁর 'তাফসীরে কাশ্শাফে'র সুরা আল ইমরানের ব্যাখ্যায়। বিভিন্ন ফিকাহ'র পুস্তকেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নামাজ তো দুনিয়ার বিষয়

নয়। তাহলে নামাজের কথা বলা হলো কেনো? উত্তরে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এই হাদিসের সনদ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়েছে যে উক্ত হাদিসের মতনে 'ছালাছা' (তিনটি) শব্দটির উল্লেখ নেই। সুতরাং এ নিয়ে আর কোনো দ্বন্দ্ব রইলো না। আবার অধিকাংশ সনদে 'ফিদ্দুনইয়া' শব্দটিও নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তিরোহিত। আমি এই হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি মৎপ্রণীত মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে। সেখানে বিষয়টি বিশদভাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বিশ্রাম ও নিদ্রা

রসুলে আকরম স. এর নিদ্রা ছিলো পরিমিত। তিনি প্রয়োজনের অধিক ঘুমাতেন না। আবার প্রয়োজনের অধিক নিজেকে নির্ঘুমও রাখতেন না। বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি রসুল স.কে ঘুমন্ত দেখতে চাইতো, সে তাঁকে ঘুমন্তই দেখতো। আর যে চাইতো তাকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে, সে তাঁকে নামাজরত অবস্থাতেই দেখতে পেতো। একথার তাৎপর্য হচ্ছে— তিনি নফল নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অন্যান্য ইবাদতেও মশগুল থাকতেন। আবার নিদ্রাও যেতেন। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো, তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তারপর উঠে নামাজ পড়তেন। নামাজ পড়ার পর আবার নিদ্রা যেতেন। এভাবে তিনি কয়েকবার নিদ্রা যেতেন এবং কয়েকবার জাগ্রত হতেন।

রসুলেপাক স. ডান পাশে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করতেন। ডান হাতের তালুর উপর গণ্ডদেশ রাখতেন। অপর হাতটি মাথার উপর রেখে শয়ন করতেন, যাতে করে নামাজের জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়া যায়। রসুল স. শয়নকালে ডান কাতে প্রথমে শয়ন করতেন— এ বর্ণনাটি বিখ্যাত। এর কারণ এই যে, ডান পাশে শয়ন করলে বাম পাশে কলব ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। বাম পাশে শয়ন করলে কলবে চাপ পড়ে, ফলে ঘুম হয় অতিগভীর। ডান পাশে শয়ন করলে অতিগভীর ঘুম থেকে বেঁচে থাকা যায়। দেহ অবশ্য অতিরিক্ত আরামই চায়। আবার অধিক নিদ্রা খাদ্যদ্রব্য হজমেরও সহায়ক। কিন্তু ডান পাশে শয়ন করলে নামাজের জন্য গাত্রোত্থান সহজ হয়। তাই শারীরিক সুস্থতা রক্ষার্থে চিকিৎসকগণ, বাম পাশে শয়ন করার পক্ষপাতী। কিন্তু যারা কলবের সুস্থতা এবং প্রকৃত জীবনের প্রত্যাশী, তারা ডান পাশে শয়ন করার পক্ষপাতী। মুত্তাকীগণ এরকম করে থাকেন। আর এ সূক্ষ্ম বিষয়টি জানেন কেবল তাঁরাই। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা লিখেছেন, বর্ণিত কারণটি পর্যালোচনাসাপেক্ষ। কেননা রসুল স. এর পবিত্র কলব তো কখনও নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতো না— ডান পাশে শয়ন করলেও, বাম পাশে শয়ন করলেও। কলবের জাগ্রত থাকার বিষয়টি ছিলো তাঁর জন্য বিরতিহীন। উপরোক্ত কারণটি প্রযোজ্য হতে পারে তো কেবল ওই ব্যক্তির বেলায়, যার কলব

নিদ্রাচ্ছন্ন হয়। কাজেই ডান পাশে শয়ন করার কারণ বরকত হাসিল করা— এরকম বলাই শ্রেয়। কেননা এটা ছিলো রসুলে পাক স. এর পবিত্র স্বভাব। তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সব কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করেন। অথবা ডান পাশে শয়ন করেন তিনি তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে যে, এরকম না করলে কলব নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একথা বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলবের জাগ্রত ও সতর্ক থাকা ছিলো রসুলেপাক স. এর ইচ্ছাধীন ব্যাপার এবং তা ছিলো কলবের স্বভাবসুলভ অস্থিরতা থেকে অনেক শক্তিশালী। বাম পার্শ্বে শয়ন করলে ওই অস্থিরতা কমে যায় এবং আলস্য আসে। শরীরধর্ম তখন বড় হয়ে ওঠে। স্মর্তব্য, কোনো কোনো বস্তুর প্রভাব কোনো কোনো সময় তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে প্রবেশ করতো। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁর কলবের জাগ্রতাবস্থা ছিলো সার্বক্ষণিক। বিশেষ করে বর্ণিত আকারে তা হতো অধিকতর। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা প্রমুখ সম্ভবত এরকমই বলতে চেয়েছেন।

রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু কলব ঘুমায় না। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো বিতির পড়ার পূর্বেই ঘুমিয়ে যান। তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, কলব ঘুমায় না। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, কলব যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন নিদ্রাকালেও সে জাগ্রত থাকে এবং দেহ নিঃসাড় হয়ে পড়লেও সে থাকে সবল ও সজাগ। রসুল স. এর অবস্থা এরকমই ছিলো। তিনি ছাড়া ওই ব্যক্তির মধ্যেও আল্লাহ্তায়ালা এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করে দেন, যিনি তাঁর আনুগত্য এবং মহব্বত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। কথিত আছে, 'মাওয়াহেব' রচয়িতা নিজেও ছিলেন একজন মারেফত ও হাকীকতধারী বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, আমার কলব ঘুমায় না। প্রকাশ থাকে যে, 'মাওয়াহেব' রচয়িতা যে আউলিয়া কেরামের জন্য মহব্বতে ইলাহী এবং রসুলেপাক স. এর আনুগত্যের উপর কলবের জীবন্ত ও জাগ্রত থাকার বিষয়টিকে অপরিহার্য করেছেন, সে ব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না হওয়াই উচিত, যদিও রসুলপাক স. এবং অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য। এ বিষয়ে সমালোচনা ও কথাবার্তা বলা এবং অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যাপ্রদান আমার কাছে অপছন্দনীয়। বাস্তবিকই যদি এরূপ অবস্থা কারও বেলায় সত্য হয়, তবুও কিন্তু তার উপরে শরিয়তের বিধান সর্বসাধারণের মতোই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নিদ্রা রসুল স. এর ওজুভঙ্গের কারণ না হলেও এ বিধান তার উপরে প্রযোজ্য হবে না। নিদ্রা গেলেও ওজু অটুট থাকার বিশেষত্বটি কেবল রসুল স. এর জন্যই সুনির্দিষ্ট। জনশ্রুতি রয়েছে যে, রেসালতের সন্নিকটবর্তী সময়ের কোনো কোনো সুফীসাধক তাদের বেলায়েতের দাবী হিসেবে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ওজু ব্যতীতই নামাজ

পড়তে শুরু করেছিলো এবং তারা দাবী করতো, এ মাসআলাটির বিষয়ে তারা সম্যক অবহিত। অথচ তাদের এমতো বচন ও আচরণ ছিলো মূর্খতামণ্ডিত। কিয়াসের শর্ত হচ্ছে কিয়াসকৃত বিষয়টি মনসুখ আলাই এর বিধানের সঙ্গে বিশিষ্ট হতে পারবে না। তারা 'লা ইয়ানামু ক্বালবী' হাদিসটির উপর যে 'লাইলাতুত্ তা'রীস' এর হাদিসের তাআরুস হয়েছে, সেকথা জানে না। 'লাইলাতুত্ তা'রীস' এর ঘটনা এরকম— একবার মরুভূমিতে ফজরের নামাজ না পড়া অবস্থায় সূর্য উঠে গিয়েছিলো। সূর্য উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তখন রসুলেপাক স. এবং তার সৈন্য বাহিনীর কেউই জাগ্রত হতে পারেননি। এ থেকে এই প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছে যে, কলব যদি জাগ্রতই থাকে, তাহলে সূর্য উঠে যাওয়ার কথা তিনি জানতে পারলেন না কেনো? ইমাম নববী এ সমস্যার দু'টি জবাব দিয়েছেন—১. কলব কেবল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়েরই অনুভূতি লাভ করে থাকে। জৈবিক আরাম, কষ্ট ও যন্ত্রণার অনুভূতি তার নেই। ওগুলো হচ্ছে বাহ্যিক অঙ্গের কাজ। যেমন চোখ দেখতে পায়, সূর্যের উদয় ও অস্ত অবলোকন করে। কিন্তু তখন সেখানে তো চক্ষু ঘুমিয়েছিলো, যদিও কলব ছিলো জাগ্রত। কলব তো তখন জাগ্রত ছিলোই, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত বলে সে সূর্যোদয় দেখতে পায়নি। ২. রসুলেপাক স. এর দু'রকম অবস্থা হতো। যেমন— এক. তাঁর কলব জাগ্রত থাকতো এবং এ অবস্থা থাকতো তাঁর অধিকাংশ সময় জুড়ে। দুই. কচিৎ কখনো তাঁর অন্তর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। 'লাইলাতুত্ তা'রীসে' শেষোক্ত অবস্থাই হয়েছিলো। ইমাম নববী বলেছেন, প্রথম উত্তরটি বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়টি দুর্বল। মোট কথা, পছন্দনীয় মত হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র কলব সর্বদাই জাগ্রত থাকতো, কখনোই নিদ্রাভিভূত হতো না। হাদিসের বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো লোক এখন পর্যন্ত এই মর্মে মতানৈক্য করে থাকে যে, সূর্যোদয় দেখা যদিও চোখের কাজ, কিন্তু কলব তো তা অনুধাবন করতে পারে। এতোটুকু তো তার বুঝতে পারা উচিত যে, সময় অনেক হয়ে গিয়েছে। কেননা ফজর শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টি সুদীর্ঘ। সুতরাং তা গোপন থাকে কেমন করে? অবশ্য এমতাবস্থাকে গোপন বলতে পারে কেবল ওই ব্যক্তি যে নিদ্রাচ্ছন্ন। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এধরনের সুদৃঢ় জ্ঞানের দাবীর বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, রসুল স. এর পবিত্র কলব তখন ওহীর গভীরে নিমজ্জিত ছিলো। ওহীতে নিমজ্জিত থাকা, আর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকা— নিশ্চয় এক কথা নয়। ওহীর মধ্যে নিমজ্জিত তো হতেন তিনি তাঁর জাগ্রত অবস্থাতেও। আর এরকম হওয়াই ছিলো তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার উপযোগী, যেমন নামাজে সহু হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ বলে থাকেন। এ বিষয়টিও তদ্রূপ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীগণ বলেন, রসুলেপাক স. যখন নিদ্রায়

বিভোর থাকতেন, তখন আমরা তাঁকে জাগাতাম না। কারণ আমরা জানতাম না, তিনি কোন অবস্থায় এবং কোন মাকামে রয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিদ্রা, নামাজ ও ভুলে যাওয়ার বিষয়টি এমন ছিলো না যে, তখন তাঁর জ্যোতির্ময় কলব নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। বরং ওরকম হতো তাঁর অবস্থান্তরের সময়, অথবা ওই ঘটনাগুলো ঘটেছিলো তাঁর উন্নততর স্তরোন্নতির কারণে। ওগুলো যেনো আমাদের জন্য সুন্নতে পরিণত হয়ে যায়, তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলের দ্বারা ওগুলো করিয়েছিলেন। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা কাযী আবু বকর আরাবী মালেকী থেকে এরকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো কোনো সুফি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণ এই ছিলো যে, তিনি তখন নিজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। সকলকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন হজরত বেলালের উপর। অবশ্য এরূপ মন্তব্যও সঠিক নয়। কেননা তখন হজরত বেলালকে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থেই। আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার তো প্রশ্নই আসে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের 'লা ইয়ানামু' (ঘুমায় না) কথাটির অর্থ— ওজু ভঙ্গ হওয়ার অবস্থা আমার নিকট গোপন থাকে না। অর্থাৎ আমি নিদ্রায় এমনভাবে বিভোর হয়ে যাই না যে, আমার ওজু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে আমি টের পাই না। 'লা ইয়ানামু' এর এরূপ ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা ওজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে টের পাওয়ার বিষয়টি জাগ্রত থাকার সঙ্গে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। কিন্তু এরূপ হওয়া সুদূর পরাহত। কেননা 'আমার চক্ষু নিদ্রা যায়, কিন্তু হৃদয় জাগ্রত থাকে' কথাটি তিনি স. বলেছিলেন হজরত আয়েশার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে। প্রশ্নটি ছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যে বিতির নামাজ পড়ার পূর্বেই নিদ্রা যান? প্রশ্নটিতে ওজু ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার উল্লেখ নেই। বরং প্রশ্নটি ছিলো একটি সাধারণ প্রশ্ন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা যেসব কথাবার্তা বলো, আমি তার সবই শুনতে পাই। এর সঠিক উত্তর তা-ই, যা দিয়েছেন শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী।

রসুলেপাক স. উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। সুনানে আবু দাউদ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার এক স্থানে গমনকালে এক লোককে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে পদাঘাত করে বললেন, ওঠো, ওঠো। এভাবে তো শোয় দোজখীরা। 'মাওয়াহেব' এর লেখক বলেছেন, চিত হয়ে শয়ন করা খুবই খারাপ, আর নিম্নমুখী হয়ে অধোবদনে শয়ন করা অত্যধিক খারাপ। তবে এরকম বলা হয়ে থাকে যে, নিদ্রা যাওয়ার উদ্দেশ্য না করে কেবল আরাম করার জন্য চিত হয়ে শয়ন করা দুষণীয় নয়। ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'এহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, শয়ন করার অবস্থা চারটি— ১. চিত হয়ে শয়ন করা।

কেউ কেউ চিত হয়ে শুয়ে আকাশের তারকা দেখে ফাল নির্ণয় করে ২. ডান কাতে শয়ন করা এভাবে শোয় রাত জাগা ইবাদতকারীরা ৩. বাম কাতে শয়ন। এভাবে শোয় ভোজনবিলাসীরা তাদের খাবার হজম করা এবং আরাম পাওয়ার জন্য। ৪. উপুড় হয়ে শয়ন। উপুড় হয়ে শোয় হতভাগ্য এবং নির্বোধেরা।

রসুলেপাক স. কখনও ফরাশের উপর শয়ন করতেন। আবার শয়ন করতেন কখনও চামড়ার উপর। কখনও চটের উপর, আবার কখনও শুধু মাটির উপর। তাঁর ফরাশ ছিলো চামড়ার, যার ভিতরে খেজুর গাছের ছাল ভরা থাকতো।

এতক্ষণ ধরে রসুল স. এর আহার-বিহার, পোশাক-আশাক এবং শয্যাগ্রহণ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থ থেকে। এ সম্পর্কে আরো ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে 'সফরুস সায়াদাত' গ্রন্থে এবং মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাপুস্তকে। এখানে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ।

আলহামদু লিল্লাহি আ'লা জালিক।

জীবনালেখ্য

প্রথম অধ্যায়

মহাআবির্ভাব : এ এক চিরন্তন বাস্তবতা যে, নূরে মোহাম্মদী স. হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির প্রথম, সমস্ত কায়েনাতের ওসিলা, বিশ্বজগত এবং হজরত আদম সৃষ্টির মাধ্যম। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। একথার অর্থ— উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সবকিছুই তাঁর নূর থেকে সৃষ্ট। তাঁর পবিত্র জাওহার থেকে সৃষ্টি হয়েছে রূহসমূহ, আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, ইনসান, জিন, আসমান, জমিন, সাগর, পাহাড় এবং বিশ্বজগতের সমস্তকিছু। এ সকল কিছুর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে তাঁর ওসিলায়। সেই হাকীকতের বর্ণনায় আহলে আলেমগণ বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বর্ণনা পেশ করেছেন।

হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন। তবে এই হাদিস মুহাক্কিক এবং মুহাদ্দিছগণের মতে সহীহ্ এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর 'আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন' হাদিসটির অর্থ মুহাদ্দিসগণ করেছেন এভাবে— আরশ ও পানি সৃষ্টির পরে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন কলম। যেমন এক হাদিসে এসেছে, তখন আরশ ছিলো পানির উপর। আবার কোনো কোনো হাদিসের ব্যাখ্যায় এরকম এসেছে যে, পানি সৃষ্টি হয়েছিলো আরশের পূর্বে। হাদিস শরীফে আরো এসেছে, যখন কলম সৃষ্টির পর আল্লাহ্তায়ালা তাকে

বললেন, লেখ। তখন কলম বললো, কী লিখবো? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, কলম সৃষ্টির পূর্বেও কিছু সৃষ্টি বিদ্যমান ছিলো।

আলেমগণ বলেন, আরশ, কুরসী এবং রূহসমূহ সৃষ্টির পূর্বে রসুলেপাক স. এর নূর প্রকাশ্য জগতে এসেছিলো। 'মা কানা' কথাটির অর্থ হতে পারে এখানে, নূরে মোহাম্মদীর হাল ও সিফতসমূহ। কেননা সমগ্র জগতের মধ্যে নূরে মোহাম্মদীর অগ্রগণ্যতা সুসাব্যস্ত। আর 'মা ইয়াকুনু' এর অর্থ হবে পৃথিবীতে পরবর্তীতে প্রকাশিতব্য সকলকিছু। আলমে জহুর বা বাহ্যিক জগতে রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত প্রমাণিত ছিলো। যেমন তিনি বলেছেন, আমি ওই সময়ও নবী ছিলাম, যখন আদম আত্মা ও দেহের মাঝামাঝিতে ছিলেন। অপর এক হাদিসে আছে, নিশ্চয়ই আমি আবদুল্লাহ্ এবং শেষ নবী। আমি ওই সময়ও ছিলাম, যখন আদম ছিলেন কাদা-মাটিতে। মানুষের মুখে মুখে বিখ্যাত 'এবং আদম তখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন' কথাটি মুহাদ্দিছগণের নিকট বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। তবে অর্থের দিক দিয়ে কথাটি সহীহ্ হাদিসের মতোই। সার্বিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, হজরত আদম আ. এর সৃষ্টির পূর্বেই নবী করীম স. এর নবুওয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। যদিও আল্লাহ্তায়ালার এলেমে সকল নবীর নবুওয়াতই সুসাব্যস্ত ছিলো, তবুও রসুল স. এর নবুওয়াত ফেরেশতাকুল ও আত্মাসমূহের কাছে প্রকাশিত ও জ্ঞাত ছিলো। অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াত ছিলো তাদের কাছে গোপন। বরং এমন কথাও আলেমগণ বলেন যে, রসুলেপাক স. এর পবিত্রতম রূহ ওই জগতে সকল নবীর রূহের তরবিয়ত করতেন এবং আল্লাহ্প্রদত্ত এলেমসমূহ তাঁদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। যেমন তিনি পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় সকল মানুষের তথা বনী আদমের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি স. কার্যতঃ এ জগতের বাইরেও নবী ছিলেন। এমনটি নয় যে, তিনি তখন কেবল আল্লাহ্র এলেমের মধ্যে নবী ছিলেন। হতে পারে 'নাহনুস সাবিকুনাল আখিরুন' (আমিই সর্বাগ্র এবং আমিই সর্বশেষ) এর তাৎপর্যটি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। কেউ কেউ বলেন, অঙ্গীকার দিবসেও তিনি উক্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন, যদিও তাঁর সৃষ্টি ও নির্গমন ও আদম বংশভূত হওয়া হজরত আদমের দেহে আত্মা ফুঁকে দেয়ার পরই সাব্যস্ত হয়েছে। অধিকাংশ হাদিসে একথাই বিবৃত। তবে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে রসুল স. এর যাররা নির্গমন অন্যান্য সকল মানুষের যাররা নির্গমনের অগ্রে ছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হাদিস শরীফে এসেছে, যখন নূরে মুস্তফা স. সৃষ্টি করা হলো এবং তাঁর নূর থেকে সকল নবীর নূরসমূহ বের করা হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা নূরে মুস্তফা স.কে বললেন, ওই নূরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তিনি তা-ই করলেন। ফলে তাঁর নূর সকল নূরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো। অন্যান্য নূর হয়ে গেলো ম্লান।

তারা নিবেদন করলো, হে আমাদের প্রভুপালক! এ কার নূর, যা আমাদের সকলের নূরকে ম্লান করে দিলো? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, এ নূর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র। তোমরা যদি তার উপর ইমান আনো, তবে আমি তোমাদেরকে নবী বানাবো। সকলেই সমস্বরে বললো, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমরা তাঁর উপর এবং তাঁর নবুওয়াতের উপর ইমান আনলাম। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি তোমাদের একথার সাক্ষী রইলাম। এদিকে ইঙ্গিত করেই কোরআন মজীদের এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যখন নবীগণের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন— আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করবো'। এই আয়াতের তাফসীর তাঁর ফযীলতসমূহের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুতরাং রসুলে আকরম স. ছিলেন নবীগণের নবী। একথার বাস্তবতা প্রকাশিত হবে আখেরাতে। সেদিন সকল নবীই তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। শবে মেরাজেও তাঁর এমতো মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে। সে রাতে তিনি নবীগণের নামাজের জামাতে ইমামতী করেছিলেন। পৃথিবীতে হজরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটলে তাঁদের উপর ওয়াজিব হতো তাঁর উপর ইমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ্তায়ালা এই মর্মে তাঁদের নিকট থেকে অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, আরশের স্তম্ভসমূহে, বেহেশতের দরজায়, বৃক্ষকাণ্ডে, পত্রপল্লবে, গম্বুজ ও মহলসমূহে লিখে দাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, লিখে দাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহি খতিমুল আম্বিয়া'। পুনঃনির্দেশ দিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যতো কিছু সৃষ্টি করা হবে, তার সবকিছুই লিখে রাখো। হাদিস শরীফে এসেছে, যা কিছু সৃষ্টি হওয়ার সব লিখে কলম শুকিয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা যখন হজরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর কুনিয়াতী নাম রাখলেন আবু মোহাম্মদ। কথিত আছে, তাঁর দ্বারা যখন বিশেষ ভুল সংঘটিত হলো, তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! মোহাম্মদের ওসিলায় আমার ত্রুটি মার্জনা করো। আল্লাহ্তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, মোহাম্মদ সম্পর্কে তুমি কোত্থেকে জানলে? হজরত আদম বললেন, আমাকে যখন তুমি সৃষ্টি করেছিলে, তখন আমার দৃষ্টি পড়েছিলো আরশ ও বেহেশতের দরজাসমূহের উপর। আমি দেখেছিলাম ওগুলোর উপরে লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ্'। আমি তখনই বুঝেছি সৃষ্টিকুলে তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত। সেকারণেই তাঁর নাম স্থান পেয়েছে তোমার নামের পাশে। তখন ঘোষণা করা হলো, তিনি আখেরী জামানার নবী, তোমারই বংশধরভূত। আসমানে তার নাম আহমদ, আর জমীনে তার নাম হবে মোহাম্মদ। তাকে সৃষ্টি না করলে আমি

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করতাম না। হে আদম! আমি তাঁর ওসিলাতেই তোমাকে সৃষ্টি করেছি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সালমান ফারসী। হজরত জিবরাইল একবার রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মোহাম্মদ! আপনার প্রভুপালক বলেন, আমি নবী ইব্রাহীমকে আমার খলীল (বন্ধু) বানিয়েছি, আর তোমাকে বানিয়েছি হাবীব (প্রিয়তম জন)। তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত আমি কাউকেই সৃষ্টি করিনি। আমি পৃথিবী ও অন্যান্য জগত এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেনো জানতে পারে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা ও সম্মান কতো বিশাল। আমি তোমাকে সৃষ্টি না করলে মহাবিশ্বই সৃষ্টি করতাম না।

হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ললাটে নূরে মোহাম্মদী স্থাপন করেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, নূরে মোহাম্মদী স্থাপন করলেন আদমের পৃষ্ঠদেশে, যার উদ্ভাস দৃষ্টিগোচর হলো কপালেও। তারপর তা ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সর্বাঙ্গে। আল্লাহ্তায়ালা ওই নূরের বরকতেই আদমকে সমস্ত মাখলুকের নামের তালীম দিয়েছিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন তাঁকে সেজদা করার জন্য। এ ব্যাপারে রয়েছে দু'টি অভিমত— ১. একদল লোক বলেন, আল্লাহ্র বাণী 'ওয়াইজ্ ক্বলা রব্বুকা লিল মালায়ীকাহ্' আয়াতের 'মালাইকাহ্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইবলিস এবং তার সাথের ফেরেশতাদেরকে, যারা দায়িত্বরত ছিলো পৃথিবীতে। তারাই সেজদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলো ২. আল্লাহ্তায়ালা যখন আসমান, যমীন, ফেরেশতা ও জ্বিনদেরকে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতাদেরকে আসমানে রেখে দিলেন এবং জ্বিনদেরকে পাঠালেন পৃথিবীতে। কিছুকাল ধরে জ্বিনেরা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী করলো। কিন্তু পরে তারা হয়ে গেলো অত্যাচারী ও অবাধ্য। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতাদের একটি দলকে পৃথিবীতে পাঠালেন। ফেরেশতাদের ওই দলটিকে জ্বিন বলা হতো হয়তো একারণে যে, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতো। অথবা একারণেও হতে পারে যে, ওই ফেরেশতাবৃন্দ জ্বিনদের কল্যাণকামী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম একদল ইবলিসকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে থাকেন। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন 'সে জ্বিনদের দলভুক্ত ছিলো'। আর এখানে জ্বিন মানে ফেরেশতা। ইবলিস ছিলো ওই ফেরেশতাদের নেতা এবং বড় আলেম। পৃথিবীতে যে সকল জ্বিন ছিলো, ফেরেশতারা তাদেরকে পাহাড় পর্বত, উপত্যকা ও সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবী, আকাশ এবং বেহেশতের দেখা শোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ইবলিসকে। ইবলিস কখনও পৃথিবীতে, কখনও আকাশে আবার কখনও বেহেশতে ইবাদত করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাকে ও পৃথিবীতে নিযুক্ত সকল ফেরশতাদেরকে হজরত আদম আ.কে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন। ইবলিস ছাড়া সকলেই সেজদা করেছিলো। বিভিন্ন

তাফসীর ও ইতিহাসগ্রন্থের বরাত দিয়ে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতাই সেজদা করার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিলো। এই অভিমতটি কোরআন মজীদের আয়াতের বক্তব্যের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, সর্বপ্রথম আদমকে সেজদা করেছিলেন হজরত জিবরাইল, তারপর সেজদা করেছিলেন মিকাইল, অতঃপর ইস্রাফীল এবং শেষে আজরাইল। তারপর সেজদা করেছিলেন নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ। অন্যান্য ফেরেশতাবৃন্দ সেজদা করেছিলেন সকলের শেষে।

হজরত আদমকে যখন বেহেশতে প্রবেশ করানো হলো, তখন তিনি সঙ্গিনীলাভের কামনা প্রকাশ করলেন, যাকে তিনি ভালোবাসবেন এবং আল্লাহর জিকিরের মধ্যে বাতেনী প্রশান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নিদ্রাভিভূত করে দিলেন এবং নিদ্রাবস্থায়ই তাঁর বাম পাঁজর থেকে হাড় বের করে নিয়ে তার দ্বারা সৃষ্টি করলেন হজরত হাওয়াকে। তাঁর নাম হাওয়া রাখা হলো এজন্য যে, তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো 'হাই' মানে জীবিত সত্তা থেকে। হজরত আদম তাঁর দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন। ফেরেশতারা বললো, থামুন। আগে বিবাহ হোক এবং বিবাহের মহরানা আগে পরিশোধ করুন। হজরত আদম বললেন, মহর আবার কী? ফেরেশতারা বললো, মোহাম্মদ মুস্তফার নামে তিন বার দরুদ পাঠ করুন, তাহলেই মহর আদায় হয়ে যাবে। এক বর্ণনায় বারের উল্লেখ নেই। এভাবে আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের সঙ্গে হজরত হাওয়ার বিবাহ সুসম্পন্ন করলেন এবং স্বয়ং বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন। হজরত আদমের এমতো সম্মান দেখে ইবলিস হিংসা করতে লাগলো। ওই হিংসার বশবর্তী হয়েই সে তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বেহেশত থেকে বের করিয়ে ছেড়েছিলো।

পৃথিবীতে নেমে এসে তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন। হলেন বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুখোমুখি। এক বর্ণনায় এসেছে, পৃথিবীতে পদার্পণ করে তিনি তিনশত বৎসর পর্যন্ত মস্তকাবনত করে রেখেছিলেন। অনুশোচনার আগুনে জ্বলেছিলেন অহরহ। আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি। মাসউদী বলেন, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর চোখের জল একত্র করা হলেও হজরত আদমের তখনকার অশ্রুপাতের সমান হবে না।

কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে এরকম--- হজরত আদমের চোখের পানি থেকে আল্লাহ্তায়ালা উদ, সন্দল (চন্দন) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। আর হজরত হাওয়ার চোখের পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন লবঙ্গ ও জায়ফল। দীর্ঘ রোদনের পর আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে কিছু কথা এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দেন এবং ওই বাণীর ওসিলায় তাঁর তওবা কবুল করেন।

কথাগুলি কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'রব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ই'ল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কূনান্না মিনাল খসিরীন'। আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তখন তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর ওসিলা ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। বক্তব্যটি অবশ্য অন্যান্য বক্তব্যের পরিপন্থী নয়।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত আদমের বেহেশতবাসের ঘটনা, ইবলিসের কুমন্ত্রণা প্রদান, তাঁর বেহেশতবিচ্যুতি ইত্যাদির বিবরণ সুদীর্ঘ। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু সাইয়্যেদুল বাশার স. এর মর্যাদা প্রকাশ করা, তাই এখানে ওই ঘটনার প্রয়োজনীয় অংশটুকুই কেবল উদ্ধৃত করা হলো। অন্যান্য নবীর ঘটনাও একারণে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

তওবা কবুল হওয়ার পর আল্লাহ্তায়ালা এই বিধানটি বলবৎ করলেন যে, হজরত হাওয়া তাঁর প্রতিটি গর্ভধারণের পর দু'টি করে সন্তান প্রসব করবেন; একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। কিন্তু হজরত শীশ জন্মেছিলেন একা। তিনিই ছিলেন রসুলেপাক স. এর উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ। নূরে মোহাম্মদী যাতে দু'জনের মধ্যে ভাগাভাগি না হয়, সে জন্যই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে মাতৃগর্ভে একা সৃজন করেন। যখন হজরত আদমের ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি হজরত শীশকে অসিয়ত করলেন, তিনি যেনো সেই নূর কোনো পবিত্র স্ত্রীর রেহেমে স্থানান্তরিত করেন। তারপর হজরত শীশও তাঁর পুত্র আনুশকে এরকম অসিয়ত করেছিলেন। এভাবে প্রজন্ম-প্রজন্ম ধরে একই অসিয়ত চলে আসছিলো। শেষে উক্ত নূর হজরত আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে চলে আসে হজরত আব্দুল্লার নিকট। আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর বংশধারাকে, মূর্খতার রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রেখেছিলেন। জাহেলিয়াতের জামানায় রেওয়াজ ছিলো, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাদের স্ত্রীদেরকে সম্মানী লোকদের কাছে তাদের শুক্র আহরণের জন্য পাঠিয়ে দিতো। উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের স্ত্রীরা যেনো সম্মানিত সন্তানের জন্ম দেয়। কখনও কখনও এমনও হতো যে, কোনো কোনো লোক দীর্ঘদিন ব্যাপী কোনো নারীকে সম্ভোগ করার পর তাকে বিয়ে করতো। 'সুনানে বায়হাকী' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমার জন্ম জাহেলী যুগের সকল প্রকার মন্দ থেকে মুক্ত। আমার পূর্বপুরুষগণের প্রত্যেকের বৈবাহিক জীবন ছিলো শরিয়তসম্মত। ব্যভিচারের সঙ্গে তাঁরা কেউই সম্পৃক্ত ছিলেন না। অন্য এক হাদিসে আছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে সর্বদাই পবিত্র পৃষ্ঠ থেকে পবিত্র গর্ভে পরিচ্ছন্নভাবে স্থানান্তরিত করেছেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যখনই দু'টি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতো, তখনই আমাকে স্থাপন করা হতো উত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস 'ওয়া তাকাল্লাবু মা ফিস্সজিদীন' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, নবী থেকে

নবীর দিকে নূরে মোহাম্মদী স্থানান্তরিত হচ্ছিলো। উক্ত নূর নবীগণের পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত হতে হতে পরিশেষে আসে তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ্‌র পৃষ্ঠদেশে। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. 'লাক্বাদ জ্বাআকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম' এই আয়াতের 'আনফুসিকুম' কথাটি পাঠ করতেন 'ফা' বর্ণে যবর দিয়ে। এভাবে পড়লে তার অর্থ হবে— নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এমন একজন রসুল আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। বংশধারা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও বংশমর্যাদা— সবদিক দিয়েই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি স. বলেছেন, আমার পিতা-পিতামহ ও ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষগণ থেকে নিয়ে আদম পর্যন্ত কেউই ব্যভিচারজাত নন। তাঁরা সকলেই ছিলেন বৈধ। আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' কিতাবে সাইয়্যেদা আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. উল্লেখ করেছেন, হজরত জিব্‌রাইল বলেছেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে মোহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দেখতে পাইনি। আর এমন কাউকেও দেখিনি, যে বনী হাশেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা উল্লেখ করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন, সব সময়ই আমি বনী আদমের সর্বোত্তম কালে কালান্তরিত হয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমাকে সৃষ্টি করা হলো আমার স্বকালে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নবী ইসমাঈলের বংশধরের মধ্য হতে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন, বনী কেনানা থেকে কুরায়েশকে, কুরায়েশ থেকে নবী হাশেমকে, আর বনী হাশেম থেকে আমাকে। অন্য এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সমগ্র সৃষ্টি থেকে বাছাই করে নিয়েছেন বনী আদমকে, বনী আদম থেকে আরববাসীদেরকে। তারপর আরববাসী থেকে আমাকে। শুনে রাখো, যে আরবদেরকে ভালোবাসে, সে তাদেরকে ভালোবাসে আমাকে ভালোবাসে বলেই। আর যে তাদের প্রতি শত্রুতা রাখে, সে শত্রুতা রাখে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করার কারণেই।

বংশধারা

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে রসুল স. এর বংশধারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এভাবে— মোহাম্মদ স. আবদুল্লাহ্, আবদুল মুত্তালিব-হাশেম-আবদে মানাফ-কুসাই-কেলাব-মুররা-কা'আব-লুওয়াই-গালেব-ফিহির-মালেক-নযর-কেনানা খুযায়মা-মুদরিকা-ইলয়াস-মুদার-নেযার-মাআদ-আদনান। এ পর্যন্ত সকল ইতিহাসবিদ এবং বংশবিদ্যায় পারদর্শীগণ একমত। এর ঊর্ধ্বতন বংশধারার ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তা যথার্থ নয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি স. ছিলেন হজরত ইসমাঈল আ. এর উত্তর পুরুষ। হজরত ইব্রাহিম, হজরত নূহ এবং হজরত ইদ্রিস তাঁর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন তাঁর বংশধারা বর্ণনা করতেন, তখন মাআদ ইবনে আদনান পর্যন্ত বলতেন। এর চেয়ে বেশী আর অগ্রসর হতেন না। বলতেন, বংশক্রম গণনাকারীরা মিথ্যা মিশিয়ে রেখেছে। এরূপ বলা হয়েছে 'মসনদে আল ফেরদাউস' গ্রন্থে। তবে সুহাইল বর্ণনা করেছেন, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, কথাটি হজরত ইবনে আব্বাসের। তিনি এরকম বলতেন এই আয়াতের তাফসীর ব্যপদেশে—'তোমাদের কাছে কি ওই সকল লোকের সংবাদ আসেনি, যারা তোমাদের পূর্ববর্তী ছিলো— নূহ, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায় থেকে এবং তাদের পরবর্তীদের থেকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না'। তখন তিনি আরো বলতেন, লোকেরা বংশক্রমবিদ্যার গর্ব করে, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের ওই বিদ্যাকে অস্বীকার করেছেন। হজরত ওমর বলেছেন, আমি আদনান পর্যন্ত আমার বংশধারা নিয়ে যেতে পারি। তার উপরে আমি আর জানি না। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেন, আমি এমন কোনো লোককে দেখিনি, যে তার বংশধারা মাআদ ইবনে আদনানের উপরে নিয়ে যেতে পারে। আদনান থেকে হজরত ইসমাঈল এবং তৎপর হজরত আদম পর্যন্ত বংশক্রম সংযুক্তির ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ আদনান থেকে নিয়ে হজরত ইসমাঈল পর্যন্ত এমন কিছু সম্বন্ধ উল্লেখ করেছেন, যা অসমর্থিত। তাদের কথিত সম্বন্ধসূত্র কখনো হ্রস্ব, কখনো প্রলম্বিত। ইমাম মালেককে একবার এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো, যে তার বংশপরম্পরা হজরত আদম পর্যন্ত বলতে পারতো। তিনি তাকে পাত্তা দেননি। তার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, এ বিষয়ে তাকে কি কোনো কিছু জানানো হয়েছে? এভাবে নবীগণের নসবনামা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। সুতরাং আদনানের উপরে কোনো নসবনামা বর্ণনা করার ব্যাপারে আমাদের মৌনতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা এ বিষয়ে রসুলে আকরম স.কে প্রত্যাদেশ করা হয়নি। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থের টীকাভাষ্যে এবং ইবনে জাওজীর কিতাবে আদনানের ঊর্ধ্বে হজরত আদম পর্যন্ত প্রায় ত্রিশটি সম্বন্ধপরম্পরা উল্লেখ আছে। ওগুলোর উপর যেহেতু আমার আস্থা নেই এবং যেহেতু বিষয়টি মতদ্বৈধতাদীর্ণ, তাই তা আর উল্লেখ করলাম না।

হজরত আবদুল মুত্তালিব

এখন আমরা রসুল স. এর এমন কতিপয় পূর্বপুরুষের আলোচনা করবো, যাঁরা বিখ্যাত ও অবিসংবাদিত ছিলেন। তন্মধ্যে হজরত আবদুল মুত্তালিব অন্যতম। তাঁর এক নাম ছিলো শীবাহ। তাঁর এমতো নামকরণের কারণ হচ্ছে, জন্মের সময় তাঁর মাথায় শাদা চুল ছিলো। তাঁকে শীবাতুল হামদও বলা হতো। কেননা তাঁর অধিকাংশ কাজ ছিলো প্রশংসনীয়। তাই মানুষ তাঁর প্রশংসা করতো। কেউ কেউ

তাঁকে আযের বলেও ডাকতো। হজরত আবদুল মুত্তালিব রসুলে আকরম স. এর দাদা ছিলেন। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, হজরত আবুদল মুত্তালিবের কুনিয়াতী নাম ছিলো আবুল হারেছ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিলো হারেছ।

তাঁর নাম আবদুল মুত্তালিব রাখার কারণ রয়েছে আরো কয়েকটি। তন্মধ্যে একটি কারণ এই— তাঁর পিতা হাশেম, তিনি কোনো এক সময় মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে বসবাস করেছিলেন। সেখানেই তাঁর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হাশেমের এক ভাইয়ের নামও ছিলো মুত্তালিব। তিনি মদীনায় গমন করলেন। সেখানে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই সুন্দর শিশুটি কার? দেখে তো মনে হয় এ শিশু আমাদের বংশের। এর অবয়ব তো দেখছি আমাদেরই মতো। লোকেরা বললো, এ হচ্ছে হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের সন্তান। মুত্তালিব শিশুকে নিজের পশ্চাতে উটের পিঠে বসিয়ে নিলেন। শিশুটির কাপড়-চোপড় ও শরীর ছিলো অপরিচ্ছন্ন। পথিমধ্যে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, শিশুটি কে? তিনি বললেন, আমার আবদ (সেবক)। এ থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেলো আবদুল মুত্তালিব। কেউ কেউ বলেন, হাশেম যখন চিরবিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আপন ভাই মুত্তালিবকে এই মর্মে অসিয়ত করলেন যে, ইয়াছরিবে তোমার যে আবদ (ভ্রাতুষ্পুত্র) রয়েছে, তাকে নিয়ে এসো। সে হিসেবে লোকেরা তাঁকে আবদুল মুত্তালিব বলে ডাকতো। তৃতীয় কারণটি এরকম— হাশেমের পুত্রসন্তান তখনও শিশু। এমতাবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলো। তারপর থেকে তাঁর চাচা মুত্তালিব তাঁকে লালন পালন করতে থাকেন। আরব দেশের দস্তর ছিলো, যাকে প্রতিপালন করা হতো, তাকে আবদ বলা হতো। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে।

চাচা মুত্তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার নেতৃত্ব পেলেন হজরত আবদুল মুত্তালিব। খানায়ে কাবা পাহারা দেওয়া এবং হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব তিনি তাঁর স্বস্কন্ধে উঠিয়ে নিলেন। আরববাসী সকলেই তাঁর অনুগত হয়ে গেলো এবং তাঁকে তারা যথেষ্ট সম্মানও প্রদর্শন করতে লাগলো। হজরত আবদুল মুত্তালিবের দেহ থেকে মেশক আম্বরের সুরভি নির্গত হতো। তাঁর ললাটদেশ ছিলো নূরে মোহাম্মদীর আলোকে সমুজ্জ্বল। মক্কাবাসীদের উপর কোনো দুর্বিপাক নেমে এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দাবীজ পাহাড়ে যেতেন এবং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁকে ওসিলা বানাতেন। খরা-দুর্ভিক্ষের সময় তাদের জন্য এস্তেসকার দোয়া করতেন। ললাটদেশে উদ্ভাসিত নূরে মোহাম্মদীর বরকতে তাদের সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যেতো।

হজরত কা'ব আহবার বর্ণনা করেছেন, আবদুল মুত্তালিবের ললাটে যখন নূরে মোহাম্মদী উদ্ভাসিত ছিলো, তখন একদিন তিনি কাবাগৃহের হাজারে আসওয়াদের কাছে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠলেন যখন, তখন দেখা গেলো, তাঁর

চোখে সুরমা লাগানো, মস্তকের কেশদাম তৈলচর্চিত এবং সর্বাঙ্গে শোভমান উন্নতমানের পোশাক। মানুষ তাঁর এরূপ সাজসজ্জা দেখে বিস্মিত হলো। বললো, এগুলো তুমি পেলে কোত্থেকে? তারপর তাঁর পিতা তাঁকে কুরায়েশদের এক গণকের কাছে নিয়ে গেলেন। সব কিছু শুনে গণক বললো, এর মানে হচ্ছে, আকাশের আল্লাহ্ এর বিবাহ দিতে বলছেন। একথা শুনে তাঁর পিতা কাইলা নাম্নী এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের এক সন্তান হলো। তাঁর নাম রাখা হলো হারেছ। আর তিনিই ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান। কাইলার মৃত্যু হলে তিনি হিন্দ বিনতে আমর নাম্নী আর এক রমণীর পানিগ্রহণ করেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনা

ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা যখন মক্কা আক্রমণ করলো এবং বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার জন্য তারা বিরাট শাদা হাতি নিয়ে এলো, তখন লোকেরা আবদুল মুত্তালিবের কাছে সমবেত হলো। তিনি জনতাকে বললেন, হে জনমণ্ডলী! ভয় কোরো না। এ ঘরের মালিক যিনি, তিনিই এ ঘরের হেফাজত করবেন। আবরাহা কুরায়েশদের উট বকরী সব তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। তার মধ্যে আবদুল মুত্তালিবেরও চারশ' উট ছিলো। আবদুল মুত্তালিব কুরায়েশদের সঙ্গে নিয়ে উটের উপর আরোহণ করে শাবীর পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। ওই সময় আবদুল মুত্তালিবের ললাটে নূরে মোহাম্মদী পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে লাগলো। আর তার ঝলক কাবাগৃহ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। ফলে কাবাগৃহ অত্যন্ত আলোকিত হয়ে গেলো। সে নূরের ঝলক দেখে আবদুল মুত্তালিব বললেন, হে কুরায়েশ জনতা! নিঃসন্দেহে তোমরা সফল হতে পারবে। আল্লাহ্র শপথ! এ নূরের ঝলক আমি তখনই দেখতে পাই, যখন আমার সৌভাগ্য অত্যাসন্ন হয়। তারপর কুরায়েশ জনতা ফিরে এলো এবং এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। আবরাহা কুরায়েশ বাহিনীকে পরাস্ত করতে এক লোককে প্রেরণ করলো। লোকটি মক্কায় প্রবেশ করে আবদুল মুত্তালিবের চেহারায় অপার্থিব জ্যোতি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। গরু যবেহের পর যে রকম গড় গড় আওয়াজ হয়, সেরকম আওয়াজ তার মুখ দিয়ে বের হতে লাগলো। সে যখন প্রকৃতিস্থ হলো, তখন আব্দুল মুত্তালিবকে সেজদা করে বলতে লাগলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি কুরায়েশদের প্রকৃত নেতা।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল মুত্তালিব যখন আবরাহার নিকট গেলেন, তখন আবরাহা তার শাদা হাতিটিকে ডাকলো, যাকে সে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছিলো। হাতিটি আবদুল মুত্তালিবের চেহারার মধ্যে নূর দেখতে পেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। হাতিটি অন্যান্য হাতির মতো ছিলো না। সে

আবরাহা বাদশাকেও কখনও সেজদা করতো না। হাতিটি যেনো আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানুরূপ আবদুল মুত্তালিবের সামনে গিয়ে মস্তক অবনত করে একথাই বলছিলো, সালাম! হে আবদুল মুত্তালিব, তাঁর জন্যও সালাম, যিনি তোমার বংশে আগমন করবেন। হাতির মাথায় অনবরত গদা মারা হলো। কিন্তু সে মৃত্তিকা থেকে তার মস্তক উত্তোলন করলো না।

তারপর আবরাহা ইয়েমেনের দিকে চলে যাচ্ছিলো। এমন সময় আল্লাহ্‌তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে আবাবীল পাখির একটি ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিলো তিনটি করে ছোটো পাথর। একটি করে চঞ্চুতে এবং দু'টি করে তাদের দু'পায়ে। পাথরগুলি মশুরের ডালের দানার চেয়ে বড় ছিলো না। কিন্তু ওই ক্ষুদ্র পাথর যার গায়ে পড়তো, সেই হয়ে যেতো ভূতলশায়ী। আবরাহার উপর যখন একটি পাথর পড়লো, তখন তার হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি টুকরা টুকরা হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আর তার শরীর থেকে নির্গত হতে লাগলো রক্ত, পুঁজ ও পানি। আর তার কলিজাও বিদীর্ণ হয়ে গেলো। এই ঘটনাটি রসুলেপাক স. এর ওই সকল মোজেজার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বে। এধরনের মোজেজাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। 'এরহাসাত' মানে ভিত্তিস্থাপন। অর্থাৎ এধরনের মোজেজা ছিলো তাঁর মহাআবির্ভাবের পূর্বাভাস।

মোজেজার প্রকার

রসুলেপাক স. এর মোজেজা ছিলো তিন রকমের— ১. ওই মোজেজা, যা প্রকাশ পেয়েছিলো তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্বলাভের আগে ২. ওই মোজেজারাজি, যেগুলো প্রকাশ পেয়েছিলো নবুওয়াতের গুরুভার বহনকালে ৩. ওই অলৌকিকত্ব-সমূহ, যেগুলো প্রকাশ পেয়ে চলেছে তাঁর উম্মতের আউলিয়াগণের মাধ্যমে। এগুলোর নাম কারামত।

হাজ্জাজের অপতৎপরতা

'মাওয়াহেব' রচয়িতা উপরে বর্ণিত হস্তিবাহিনীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। প্রশ্নটি এই— হাজ্জাজ সাকাফী তো কাবাগৃহ ধ্বংসই করে দিয়েছিলো। তার ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হলো না কেনো? একথার জবাবে বলা যেতে পারে যে, এরহাসের ওই ঘটনা ছিলো তাঁর নবুওয়াতের পূর্বের, বা ঘটনাটি ছিলো তাঁর নবুওয়াতের পূর্বাভাস। এরপর নবুওয়াত যখন সুপ্রকাশিত, সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, তখন আর এরহাসের প্রয়োজন রইলো না। এর আরেকটি কারণ এই যে, কাবাগৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হাজ্জাজ সাকাফীর ছিলো, না। সে এরকম করেছিলো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে উৎখাত করতে গিয়ে। আরেকটি কারণ ছিলো

হজরত আয়েশার বর্ণনাটি জানতে না পারা। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো কাবাগৃহের সম্মান রক্ষা করা। এরপর আবদুল মালিকের নিকট যখন হজরত আয়েশার বিবৃতিটি পৌছে গিয়েছিলো, তখন হাজ্জাজ সাকাফী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলো। কুরায়েশরাও খানায়ে কাবাকে কয়েকবার সংস্কার করেছিলো। হজরত ফাতেমার জন্মের বৎসর তো তারা কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণই করেছিলো। রসুলেপাক স. নিজে ওই নির্মাণকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এরূপ সংস্কার অথবা নির্মাণকর্মকে ধ্বংসসাধন বলা যায় না।

হাশেম ঃ হজরত আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশেমের আসল নাম ছিলো আমর। হাশেম অর্থ রুটিকে টুকরো টুকরো করা। একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনিই প্রথম তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের জন্য রুটি পাকিয়ে টুকরো টুকরো করে তাদেরকে আহার করিয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় হাশেম। আবার উচ্চমর্যাদাবিশিষ্ট হওয়ার কারণে তাঁকে আমরুল আলীও বলা হতো। তিনি দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর আভিজাত্যবোধও ছিলো প্রখর। হাশেমের চার পুত্র ছিলো। তাদের নাম— ১. আসাদ— তিনি ছিলেন হজরত আলীর মাতামহ ২. নুফায়মা ৩. সফী এবং ৪. আবদুল মুত্তালিব। ইনিই ছিলেন আমাদের নবীর পিতামহ।

আবদে মানাফ ঃ আবদে মানাফের আসল নাম মুগীরা এবং তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদে শামস। মানাফ ছিলো একটি প্রতিমার নাম। আবদে মানাফের ছিলো চার পুত্র — ১. হাশেম, ইনি ছিলেন নবী করীম স. এর পিতা হজরত আবদুল্লাহ্‌র দাদা। ২. আবদে শামস— ইনি বনী উমাইয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন ৩. নওফল— ইনি হজরত যোবায়ের ইবনে মুতইমের দাদা। ৪. মুত্তালিব— ইনি ইমাম শাফেয়ীর পিতৃপুরুষ। বলা হয়ে থাকে, হাশেম এবং আবদে শামস্ উভয়ে জমজ ভাই ছিলেন। জন্মকালে তাঁদের উভয়ের কপাল এক সঙ্গে মিলিত ছিলো। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদেরকে পৃথক করা যায়নি। অবশেষে তরবারী দিয়ে কেটে তাঁদেরকে পৃথক করা হয়েছিলো। সে জন্যই হয়তো তাঁদের উভয়ের সন্তানদের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা বিরাজমান ছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবার এরকম বর্ণনাও সুবিদিত যে, উভয়ের কোমর একত্রে মিলিত ছিলো এবং তরবারী দিয়ে কেটে তাদেরকে পৃথক করা হয়েছিলো।

কুসাই ঃ কুসাই শব্দটি 'কাসইউন' শব্দের ইসমে তাসগীর (সংক্ষিপ্ত রূপ)। কুসাই অর্থ দূরবর্তী। এমতো নামকরণের কারণ এই— তাঁর মাতা ফাতেমা যখন গর্ভবতী হলেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব গোত্র থেকে অনেক দূরে খাযাআ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। স্থানটির আর এক নাম ছিলো মাজমা। দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করার কারণ ছিলো এরকম— আরবের বিভিন্ন গোত্র সে সময় খাযাআ

গোত্রের আক্রমণে পরাজিত হয়ে মক্কাভূমি থেকে পালিয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ওই সময় কুসাইয়ের জন্ম হয়। পরে কুসাই তাদেরকে একত্র করেন। ফলে মক্কাবাসীরা খাযাআ গোত্রের হাত থেকে তাদের দেশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পুনরায় তারা মক্কায় ফিরে আসে। কথিত আছে, কুসাইই দারুন্নদওয়া বা পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে কুরায়েশরা সেখানে সমবেত হয়ে পরামর্শ করতো। নাদ্‌ওয়া অর্থ আলাপচারিতা, সংলাপ। 'নাদা' বা 'নাদিয়া' অর্থ— সভা, পরিষদ। কুসাইয়ের আসল নাম ছিলো জায়েদ।

কেলাব ঃ কেলাব অথবা মাকালিব শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ— নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করা। আরবগণ বলে থাকেন 'ক্বালা ক্বতিল আ'দুয়্যু মাকাতিবাহু' (শত্রু তার শত্রুতাসহ যুদ্ধ করেছে)। অথবা কেলাব 'কালবুন' এর বহুবচন। বহুবচন হওয়ার কারণে শব্দটি আধিক্যার্থক। আবার 'কালাবুন' এর আর এক অর্থ— হিংস্র প্রাণী, আমরা যাকে বলি কুকুর। এক বেদুঈনকে একবার প্রশ্ন করা হলো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের নাম রাখো 'কালাবুন' (কুকুর) 'যীবুন' (বাঘ), অথচ ক্রীতদাসদের রাখো মারযুন, রিয়াহ ইত্যাদি ভালো ভালো নাম। তখন লোকটি বললো, সন্তানদের নাম রাখি আমরা দুশমনদের জন্য, আর গোলামদের নাম রাখি নিজেদের জন্য। একজন বিজ্ঞ লোকেরও নাম ছিলো কেলাব। কেউ কেউ বলেন, কেলাব এর আসল নাম ছিলো ওরওয়া।

মুররা ইবনে কাআব ঃ তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইয়াওমে আরুবা নির্ধারণ করেছিলেন। জুমার দিনের পূর্ব নাম ছিলো আরুবা। তিনি ওই দিন কুরায়েশদেরকে একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন এবং আখেরী জামানার নবী মোহাম্মাদ মুস্তফার মহাআবির্ভাবের সুসংবাদ দিতেন। বলতেন, ওই নবী হবেন আমারই বংশদ্ভূত। তিনি জনতাকে ওই নবীর আনুগত্য করতে এবং তাঁর উপর ঈমান আনতে উপদেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন।

যেমন— লাইতানী শাহিদান নাহওয়া দাআ'উ্তুহু
ইজা কুরাইশুন তানাফীল হাক্বা খুয্যালানা।

অর্থ— আক্ষেপ! আমি যদি তাঁর সত্যধর্ম প্রচারকালে উপস্থিত থাকতে পারতাম, যখন কুরায়েশরা তাঁর যথার্থ দাবীকে লাঞ্ছনার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

লুওয়াই ইবনে গালিব — 'লুওয়াই' লাই এর সংক্ষিপ্ত বিশেষ্য। এর অর্থ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন।

ফিহির ঃ ইতিহাসবিদগণের একটি দল বলেছেন, ফিহিরের উপাধি ছিলো কুরায়েশ। কুরায়েশ বংশ প্রধানত তাঁর নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর সঙ্গে বংশসূত্র সম্পৃক্ত যাঁরা নন, তাঁদেরকে বলা হতো কেনানী। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে কুরায়েশ নযর ইবনে কেনানার উপাধি ছিলো। আর তাঁর বংশধরগণই কুরায়েশ নামে পরিচিত।

কুরায়েশ নামকরণের কারণ

কুরায়েশ নামকরণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত কারণটি এরকম— কুরায়েশ ছিলো একটি বিরাট জলজ প্রাণী। সে পানির মাছসমূহ খেয়ে ফেলতো। অন্য কোনো জলজ প্রাণী তাকে আক্রমণ করতে পারতো না। তার প্রভাব ছিলো একচ্ছত্র। তবে কোনো কোনো লোক বলেন, কুরায়েশ বংশের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মক্কাভূমিতে একত্রিত হতে পেরেছিলো বলেই তাদেরকে কুরায়েশ বলা হয়। কেননা 'তাকরাশ' অর্থ একত্রিত হওয়া বা সমবেত হওয়া। তৃতীয় কারণ হচ্ছে— এ বংশের লোকেরা ছিলো ব্যবসায়ী এবং চতুর প্রকৃতির। 'কারশ' শব্দের অর্থ— উপার্জন, চতুরতা এবং সমাবেশ। কেউ কেউ বলেন, এ বংশের লোকেরা হজের সময় মক্কার নিঃস্ব লোকদের খোঁজ খবর নিতো এবং খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে সাহায্য করতো। এভাবে 'তাকরীশ' এর আর এক অর্থ হয় অন্বেষণ করা। 'সাররাহ' গ্রন্থে রয়েছে, তাকরীশ অর্থ প্রাধান্য লাভ করা, আর 'ইকরাশ' অর্থ কারও জন্য চেষ্টা-তদবীর করা।

মুদরিকা ঃ মুদরিকার প্রকৃত নাম ছিলো আমের বা আমর। 'মুদরেকা' অর্থ প্রাপক। ঐতিহাসিকগণ এমতো নামকরণের কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন— একদিন তিনি একটি খরগোশের পিছনে ছুটেছিলেন। অবশেষে সেটিকে ধরতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁর পিতা তাঁর নাম দিয়েছিলেন মুদরিকা। পরবর্তীতে তিনি এ নামেই খ্যাতি লাভ করেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি তাঁর পিতা— পিতামহের সমুদয় সম্মান-প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় মুদরিকা। মুদরিকা শব্দের 'তা' অর্থাৎ 'হা' বর্ণটি আধিক্যবোধক। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এই 'তা' বর্ণটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে রূপান্তরণের জন্য। ওয়াল্লহু আ'লাম।

ইলইয়াস ঃ যে সকল লোক কাবা শরীফের দিকে হজের 'উট' পরিচালনা করেছিলো, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন 'ইলইয়াস'। 'কামুস' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইলইয়াসই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর সম্প্রদায় প্রথম বন্যাক্রান্ত হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশে হজের স্থানসমূহে রসুল স. এর তালবীয়া পাঠের আওয়াজ শুনতে পেতেন।

মুদার ঃ মুদার ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর পরিবারবর্গের জন্য কোরবানীর পশু নির্ধারণ করেছিলেন। সেকালে তিনি সকল মানুষের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী। তিনি ইসলাম ধর্ম ও সুন্নতে ইব্রাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

নেযার ঃ 'নেযার' শব্দটি এসেছে 'নযর' থেকে। এর অর্থ— স্বল্পতা। কথিত আছে, নেযারের যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতা তাঁর চোখের মধ্যে নূরে মোহাম্মদীর ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে নিরন্নদেরকে পানাহার করিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এ সকল আয়োজনের আনন্দ এই সন্তান জন্মের আনন্দের তুলনায় খুবই নগণ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো নেযার। তাঁর কুনিয়াতী নাম ছিলো আবু রবীয়া।

মাআদ ইবনে আদনান ঃ মাআদ ইবনে আদনানের এক ভাইয়ের নাম ছিলো সাআদ ইবনে আদনান। মাআদ ইবনে আদনান রসুলেপাক স. এর পিতামহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর নসবনামা আদনানের উপরে আর উদ্ধার করা যায় না। আর এ সম্পর্কে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কিছু জানানোও হয়নি।

আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

আল্লাহ্‌তায়ালা যখন আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহা বাদশাহ্‌র অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, তখন একরাতে তিনি তাঁর গৃহমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখলেন। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কুরায়েশদের এক গণকের কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালে সে বললো, তোমার এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে তোমার বংশে জন্মলাভ করবে এক মহান পুরুষ। আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর পক্ষের প্রমাণ হবে সুস্পষ্ট। ওই ঘটনার পর আবদুল মুত্তালিব ফাতেমা নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করেন। আর তিনিই হচ্ছেন যবিহুল্লাহ্ আব্দুল্লাহ্‌র মাতা এবং রসুলেপাক স. এর দাদী।

যমযম কূপ খননের ঘটনা

সাইয়্যেদা হাজেরার গর্ভ থেকে যখন হজরত ইব্রাহীমের সন্তান হজরত ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর কপালে চমকাতে থাকে নূরে মোহাম্মদী। এতে করে হজরত ইব্রাহীমের অন্য স্ত্রী হজরত সারা ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েন। তিনি হজরত ইসমাঈল ও হজরত হাজেরার সৌভাগ্য সহ্য করতে পারতেন না। যেহেতু তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না, তাই তিনি কখনো কামনা করতেন না যে, হজরত হাজেরা নূরে মোহাম্মদী বহনকারীর জননী হন। তিনিই হজরত হাজেরা ও হজরত ইসমাঈলকে এমন স্থানে নির্বাসনে রেখে আসতে বলেন, যে স্থান ধুসর, শস্যজলবিবর্জিত এবং জনমানবহীন। হজরত ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও এরকম নির্দেশ পান। ফলে মাতা-পুত্রকে রেখে আসেন একটি পার্বত্য এলাকায়। সেই স্থানেই পরবর্তীতে নির্মিত হয় কাবাগৃহ। তিনি সেখানে তাঁদের জন্য সামান্য কিছু খেজুর এবং এক মশক পানি রেখে এসেছিলেন। হজরত হাজেরা ওই খেজুর ও পানি পান করতেন, আর শিশু ইসমাঈল পান করতেন তাঁর বুকের দুধ।

একসময় খেজুর ও পানি ফুরিয়ে এলো। পিপাসায় কাতর হয়ে শিশু ইসমাঈল কাঁদতে শুরু করলেন। হজরত হাজেরা অস্থির হয়ে পড়লেন। পানির সন্ধান করতে আরোহণ করলেন সাফা পর্বতের চূড়ায়। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, যদি কেউ তাঁকে দেখে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তারপর নিচে নেমে এলেন তিনি। পুনরায় ওঠলেন মারওয়া পাহাড়ের শিখরদেশে। সেখানেও অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। এভাবে তিনি সাফা ও মারওয়ায় সাত বার দৌড়ে ওঠানামা করলেন এবং প্রতি বারেই প্রাণাধিক পুত্রকে দেখে গেলেন। শেষ বার যখন তিনি পুত্রের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। অবশ্য শেষবারে তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠে একটি আওয়াজ শুনতে পান। কে যেনো বলছে 'আমি তোমার ডাক শুনেছি। তুমি আমার সাহায্যের দিকে এসো'। ওই আওয়াজ ছিলো হজরত জিবরাইলের। নিচে নেমে তিনি তাঁকেই যমযম কূপের সামনে হজরত ইসমাঈলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। দেখলেন, জিবরাইল তাঁর ডানা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে উচ্ছ্রিত হলো পানির ঝর্ণা। সাইয়্যেদা হাজেরা ভাবলেন, পানি যদি এদিকে ওদিকে গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, এমতো আশংকা করেই তিনি ঝর্ণার চারপাশে মাটি দিয়ে বাঁধ দিয়ে দিলেন। ওই স্থানেই চিরপ্রতিষ্ঠিত হলো যমযম কূপ।

নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা নবী ইসমাঈল ও তাঁর জননীর উপর রহম করুন। যমযমের জলপ্রবাহকে তিনি যদি না আটকাতেন, তবে ওই কূপের পানি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবাহিত হয়ে যেতো। এই ঘটনার পর থেকে মাতাপুত্রের দুঃখ-কষ্ট নিবারিত হলো। কেননা যমযমের পানি ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়টিই নিবারন করে। যমযম সলিলের বিশেষত্বও এই যে, তা দুধের মতো খাদ্য ও পানীয় উভয়ের স্থলাভিষিক্ত। বেশ কিছুকাল পর জলা অনুসন্ধান করতে করতে ইয়েমেন দেশ থেকে জুরহুম নামক একটি গোত্র সেখানে উপস্থিত হলো। তারা হজরত হাজেরার অনুমতি নিয়ে যমযমের পাশেই বসতি স্থাপন করলো। হজরত ইসমাঈল জুরহুম গোত্রের স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। এভাবে অতিক্রান্ত হলো দিন, মাস, বৎসর। বৎসরের পর বৎসর। যৌবনে পদার্পন করলেন হাজেরানন্দন ইসমাঈল। জুরহুম গোত্রেরই এক নারীর পাণিগ্রহণ করলেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু হলো তাঁর বংশের বিস্তার।

হজরত ইব্রাহীম কখনও কখনও হজরত সারার অনুমতি নিয়ে বুরাকে আরোহণ করে সিরিয়া থেকে মক্কায় চলে আসতেন। এভাবেই খোঁজ-খবর নিতেন স্ত্রী ও সন্তানের। চাশতের সময় সিরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করতেন। মক্কায় এসে আবার ফিরে চলে যেতেন দ্বিপ্রহরের সময়। এভাবে এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ পেলেন কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের। তখন হজরত ইব্রাহীম, তাঁর পুত্র ইসমাঈলের সহায়তায় পাহাড়ের পাদদেশে কাবাগৃহের

ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইতোপূর্বে হজরত আদমের জন্য আল্লাহ্তায়ালা ইয়াকুত পাথরের নির্মিত একটি ঘর জান্নাত থেকে এনে ওই স্থানে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ঘরের ছিলো যমরদ পাথরের দু'টি দরজা। একটি পূর্ব দিকে, অপরটি পশ্চিম দিকে। আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে ঘরটি তাওয়াফ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে আদেশ করলেন, পৃথিবীতে বায়তুল হারাম বানাও এবং তার তাওয়াফ করো, যেভাবে তুমি আকাশের ফেরেশতাদেরকে আরশ তাওয়াফ করতে দেখেছো। হজরত আদম ছিলেন ভারতবাসী। সেখান থেকে তিনি ওই গৃহ তওয়াফ করার জন্য মক্কায় আসতেন। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আদম পদব্রজে চল্লিশ বার হজ্জ করেছিলেন। হজরত নুহের মহাপ্লাবনের সময় ঘরটিকে সপ্তম আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। বৃত্তান্তটি অতিদীর্ঘ। আর এখানে কাবাগৃহের ইতিহাস বর্ণনা করা যেহেতু উদ্দেশ্য নয়, তাই প্রসঙ্গটির এখানেই ইতি টানা হলো।

বর্ণিত আছে, হজরত ইসমাঈল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লি ছিলেন। তারপর তাঁর বংশধরদের মধ্যে ছাবেত নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শ্বশুরকুলের লোকদের সঙ্গে হজরত ইসমাঈলের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। তাঁর বংশের অনেকেই মক্কানগরী থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ডেরা নির্মাণ করলেন তাঁরা। মক্কার শাসনক্ষমতা চলে গেলো জুরহুম গোত্রের লোকদের হাতে। এক সময় সেখানকার শাসক নিযুক্ত হলো আমের ইবনে হারেছ। সে ছিলো অত্যাচারী। মুসাফিরদের উপরেও অত্যাচার করতো সে। হজের পশু বা অন্য কোনো কিছু কাবায় প্রেরণ করা হলে সেগুলো সে নিজেই নিয়ে নিতো। আশেপাশের গোত্রগুলো তাকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। জুরহুমেরা প্রমাদ গুণলো। প্রাণভয়ে মক্কানগরী ছেড়ে পালিয়ে গেলো ইয়েমেনের দিকে। পলায়নের সময় আমর ইবনে হারেছ হাজারে আসওয়াদটিকে খুলে ফেললো। সেখানে ছিলো স্বর্ণনির্মিত দু'টি মৃগমূর্তি ও মূল্যবান পাথর। মূর্তি দু'টি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলো এসফিন্দিয়ারের ফারসী নামক এক লোক। মূর্তি দু'টির নাম ছিলো গাযালুল কাবা। তাছাড়া কাবাগৃহে ছিলো কিছু অস্ত্রশস্ত্র। ইবনে আমর ইবনে হারেছ ওগুলো যমযম কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে তা উপর থেকে বন্ধ করে দিলো। কূপের স্থানটি সে মাটি দ্বারা ভরাট করে এমনভাবে সমান করে দিলো যে, তার নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রইলো না। এভাবে পবিত্র মক্কানগরীর অমর্যাদা করার কারণে আল্লাহ্তায়ালা সেখানে এক মাস ধরে বিভিন্ন বিপদাপদ অবতীর্ণ করলেন। আরববাসীরা ওই দুর্যোগের নাম দিয়েছিলো হাদমা। তখন কিছু লোক ধ্বংস হয়েছিলো এবং কিছু লোক সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো।

তারপর হজরত ইসমাঈলের বংশধরেরা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। বসবাস করতে থাকেন শান্তির সঙ্গে। কিন্তু যমযম কূপ তাদের কাছে অদৃশ্যই থেকে যায়। অনেক পরে মক্কার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আবদুল মুত্তালিবের কাছে আসে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে যমযম কূপের স্থানটি দেখিয়ে দেন এবং তা পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত প্রদান করেন। আবদুল মুত্তালিব জায়গাটি খনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কুরায়েশ জনতা এতে বাদ সাধে। তারা নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে তাঁকে। যমযম কূপের স্থানটিতে তখন দু'টি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। মূর্তি দু'টির নাম ছিলো আসাফ ও নায়েলা। কুরায়েশরা চাচ্ছিলো না যে, তাদের পরম পূজনীয় ওই মূর্তিদু'টি সরিয়ে সেখানে কূপ খনন করা হোক। আবদুল মুত্তালিব তবুও তাঁর সংকল্পে অটল থাকেন। পুত্র হারেছকে নিয়ে খননকার্য শুরু করেন। সামান্য মাটি খনন করার পর পাথর ও কূপের আলামত দেখা গেলো। বহুপূর্বে পুঁতে রাখা অস্ত্রপাতি ও হরিণের মূর্তিও উদ্ধার করা গেলো সেখানে থেকে। আরো কিছু খুঁড়তেই পানি বের হতে শুরু করলো কূপ থেকে। আবদুল মুত্তালিব তখন হলেন দ্বিগুণ মর্যাদার অধিকারী। তিনি এই মর্মে মান্নত করলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তাঁকে দশটি সন্তান দান করেন এবং তারা বড় হয়ে তাঁকে কূপটি আরো গভীর করার কাজে যদি সহায়তা করতে পারে, তবে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে দশটি সন্তানই দান করলেন। তারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলো। এক রাতে আবদুল মুত্তালিব কাবাগৃহের নিকট ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাঁকে বলা হলো, হে আবদুল মুত্তালিব! তোমার মানতের কী হলো? যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর শরীর কাঁপছিলো। মানত পূরণে বিলম্ব করার বিষয়টি তাঁর কাছে মনে হলো অত্যন্ত গুরুভার। সঙ্গে সঙ্গে একটি দুম্বা যবেহ করে আহার্য প্রস্তুত করে ফকীর মিসকীনদেরকে আহার করালেন তিনি। ওই রাতে পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন, কে যেনো বলছে— এর চেয়ে বড় কোরবানী করো। পরদিন একটি গরু কোরবানী করলেন তিনি। আবার তাঁকে স্বপ্নে বলা হলো, আরো বড়। পরদিন কোরবানী করলেন একটি উট। আবার স্বপ্নে শুনতে পেলেন— আরো অধিক বড়। আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নেই জিজ্ঞেস করলেন, এর চেয়ে অধিক বড় কী? বলা হলো, মনে নেই? তুমি তো তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে একজনকে কোরবানী করতে চেয়েছিলে।

এবার তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সন্তানদেরকে সমবেত করে সবকিছু খুলে বললেন। সন্তানেরা বললেন, পিতা! আপনি যদি আমাদের সকলকেই কোরবানী দিতে চান, তাতেও আমরা রাজী আছি। সন্তানদের এহেন আনুগত্যদৃষ্টে আবদুল মুত্তালিব খুবই খুশী হলেন। বললেন, তাহলে লটারী করা হোক। লটারীতে নাম উঠলো হজরত আবদুল্লাহ্‌র। আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর অতি

আদরের। কেননা তাঁর কপালে পরিদৃষ্ট হতো নূরে মোহাম্মদীর উদ্ভাস। দেখতেও খুব সুন্দর ছিলেন তিনি। ছিলেন বাহাদুর তীরন্দাজ। এতদসত্ত্বেও আবদুল মুত্তালিব প্রিয় পুত্রকে কাবাগৃহের নিকটে আসাফ ও নায়েলা প্রতিমাদ্বয়ের কাছে কোরবানীর স্থানে নিয়ে গেলেন। হাতে নিলেন ধারালো ছুরি। নিকটাত্মীয়রা তাঁকে বাধা দিলো। তারা তাঁকে নিয়ে সেই গণক রমণীর নিকট নিয়ে গেলো, যে ছিলো সমগ্র হেজাজে সর্বাধিক বুদ্ধিমতী। সে সময় পর্যন্ত দুষ্ট জ্বিনদের আকাশ পর্যন্ত যাতায়াত করা এবং সেখানকার কথা চুরি করে শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হয়নি। কথিত আছে, সে সময় দুষ্ট জ্বিনেরা গণকদের কাছে এসে তাদের করনীয় কাজ সম্পর্কে বলে দিতো। গণক রমণী বললো, তোমরা এখন চলে যাও। আগামীকাল এসো। এর মধ্যে আমি আমার হামযাদ জ্বিনের কাছ থেকে এ বিষয়ে করণীয় কি— তা জেনে নিতে পারবো। পরের দিন সে আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলো, একজন মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে তোমার নিকট কতগুলো উট আছে? লোকেরা বললো দশটি। রমণী বললো, দশটি উট এবং দশজন ছেলের মধ্যে লটারী দাও। লটারীতে যদি উট উঠে আসে, তাহলে ছেলের পরিবর্তে উট কোরবানী করে দিয়ো। আর যদি কোনো পুত্রের নাম লটারীতে ওঠে, তবে সেই পরিমাণ উট আরও বৃদ্ধি করে পুনরায় লটারী কোরো, এভাবে উটের সংখ্যা দশ দশ করে বৃদ্ধি করে যেয়ো, যতক্ষণ না উটের নাম লটারীতে আসে। উটের নাম যখন লটারীতে আসবে তখন তার দ্বিগুণ উট কোরবানী দিয়ো। এরকম করলেই ছেলের জীবনের পরিবর্তে উটের কোরবানী সিদ্ধ হবে। আবদুল মুত্তালিব তার সহগামীদেরকে নিয়ে ফিরে এলো। অতঃপর আসাফ ও নায়েলা প্রতিমাদ্বয়ের নিকট কোরবানীর স্থানে হজরত আবদুল্লাহ্ ও তাঁর পাশাপাশি উটগুলোকে উপস্থিত করা হলো এবং লটারী দেওয়া হলো। উটের সংখ্যা যখন একশতে পৌঁছলো, তখন উঠলো উটের নাম। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তখনও অন্তরে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি পুনরায় লটারী টানলেন। তখনও উটের উপর লটারী ফললো। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। এভাবে হজরত আবদুল্লাহ্ যবেহ হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তারপর আবদুল মুত্তালিব একশ উট যবেহ করে বিশেষ ও সাধারণ লোক, এমনকি পশুপাখিদেরকেও আহার করালেন। এরপর থেকে আরব দেশে এক ব্যক্তির রক্তপণ নির্ধারিত হলো একশত উট। ইতিপূর্বে রক্তপণের জন্য নির্ধারিত ছিলো দশ উট। পরবর্তীতে শরিয়তপ্রণেতা মোহাম্মদ মুস্তফা স. একশ উটই রক্তপণরূপে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি স. বলতেন, আমি দুই যবীহুল্লাহ্র সন্তান। অর্থাৎ আমি আবদুল্লাহ্ ও ইসমাঈলের সন্তান। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা তাঁর গ্রন্থে এবং আল্লামা যমখশরী তাঁর 'কাশ্শাফ' কিতাবে এবং হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

থেকে। তিনি বলেছেন, আমরা একবার রসুলুল্লাহ স. এর কাছে বসেছিলাম। এক বেদুইন এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করে বললো, হে দুই যবীহুল্লাহ্র পুত্র! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে যে গণিমতের মাল দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু দান করুন। একথা শুনে রসুল স. মৃদু হাসলেন। তার কথা অস্বীকার করলেন না।

জ্ঞাতব্য ঃ জমহুরের নিকট বিখ্যাত মত হচ্ছে, যবীহুল্লাহ্ ছিলেন হজরত ইসমাঈল আ.। অবশ্য কোনো কোনো আলেমের মতে যবীহুল্লাহ ছিলেন হজরত ইসহাক আ.। যদি দু'টি মতই বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তার ভাবার্থ করা যেতে পারে এভাবে— চাচাকে পিতাও বলা যায়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা নবী ইয়াকুবের সন্তানের সংবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন 'যখন ইয়াকুব তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আমার পরে কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা আপনার রবের এবং আপনার পিতাগণ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের রবের ইবাদত করবো'। এই আয়াতে হজরত ইসমাঈলকেও পিতাগণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন হজরত ইয়াকুবের চাচা। অর্থাৎ তাঁর পিতা হজরত ইসহাকের ভাই। হজরত ইসহাককে যবীহুল্লাহ্ ধরে নিলে 'আমি দুই যবীহুল্লাহ্র পুত্র' কথাটির ব্যাখ্যাও অনুরূপ হবে। তবে ইবনে কাইয়ুম প্রথম মত, অর্থাৎ জমহুরের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত যবীহ্ মক্কায় ছিলেন। কেননা কোরবানীর দিবসে মক্কাতেই কোরবানী করা হয়। যেমন সাফা-মারওয়াতে সায়ী করা হয় এবং পাথর নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে জামরায়। এসব করা হয়ে থাকে হজরত ইসমাঈলের মহাপুণ্যবতী মাতার কর্মের স্মৃতিচারণস্বরূপ এবং জিকরে ইলাহী প্রতিষ্ঠার্থে। যবেহ যদি সিরিয়ায় হতো তবে কোরবানীও সেখানেই হতো। তাছাড়া কোরআনুল করীমে যবীহ্কে 'হালীম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর হালীম তো তিনিই হয়ে থাকেন, যিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে কোরবানীর জন্য সমর্পণ করেন। কোরআনে হজরত ইসহাককে বলা হয়েছে 'আলীম'। হজরত ইসমাঈলের যবীহ্ হওয়ার পক্ষে আরও একটি যুক্তি রয়েছে। মানবীয় বৈশিষ্ট্যানুসারে জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতিই মমতা থাকে বেশী। তাই বুঝতে হবে, ইব্রাহিম খলীলের অন্তরের সেই মমতার বন্ধন ছিন্ন করণার্থেই তাঁকে যবেহ করতে বলা হয়েছিলো। তাছাড়া আরেকটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, হজরত ইসমাঈলের জন্ম হজরত ইসহাকের জন্মের পূর্বে হয়েছিলো। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয এক ইহুদী আলেমকে প্রশ্ন করেছিলেন (তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) হজরত ইব্রাহীমের দুই পুত্রের মধ্যে কাকে যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদীরা একথা খুব ভালোভাবেই জানে যে, হজরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা আপনাদেরকে হিংসা করে। তাই আপনাদের পিতৃপুরুষের

শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালাও একথা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তারা কোরআন মানে না। তাই ইসহাককে যবীহুল্লাহ্‌ সাব্যস্ত করে। আল্লামা শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'রাসায়েল' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইসহাক যবীহুল্লাহ্‌ ছিলেন—— আহলে কিতাবদের একথাটা বানোয়াট। তবে কোনো কোনো স্বনামধন্য মাশায়েখও এরকম বলেছেন। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

হজরত আবদুল্লাহ্‌র সৌন্দর্য

হজরত আবদুল্লাহ্‌র রূপ-সৌন্দর্যের কথা যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং যবেহের ঘটনার আলোচনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো, তখন কুরায়েশ বংশের রমণীগণ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করলো। তাঁকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে রক্ষা করলেন।

আহলে কিতাবরাও বিভিন্ন আলামত দ্বারা বুঝে নিলো যে, আখেরী জামানার নবীকে আবদুল্লাহ্‌র পৃষ্ঠেই আমানত রাখা হয়েছে। তারা তাঁর দুশমন হয়ে গেলো এবং তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ফন্দী-ফিকির শুরু করলো। এমতো অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা মক্কায় সমবেত হতে লাগলো। কিন্তু এখানে এসে বিভিন্ন ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে হতবাক ও হতাশ হয়ে গেলো। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেলো আপন আপন স্থানে। একদিন হজরত আবদুল্লাহ্‌ শিকারে বের হলেন। আহলে কিতাবদের একটি বিশাল দল সিরিয়া থেকে এসেছিলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। ওই সময় ওই অরণ্যে উপস্থিত ছিলেন রসুল স. এর মাতার আব্বাজান ওয়াহাব ইবনে মানাফ। তিনি দেখতে পেলেন, কতকগুলো বিদেশী লোক হঠাৎ কোত্থেকে যেনো এসে জড়ো হলো। তারা আক্রমণ করার আগেই তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। পরে গৃহে ফিরে এসে তিনি তাঁর পরিবারবর্গের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর কন্যা আমেনাকে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। পরে তিনি এ শুভ প্রস্তাব তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রেরণ করলেন। ওদিকে আবদুল মুত্তালিবও মনে মনে আবদুল্লাহ্‌র বিবাহের কথা ভাবছিলেন। প্রস্তাবটি তাঁর মনঃপুত হলো। কেননা আমেনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন সব দিক দিয়ে আবদুল্লাহ্‌র উপযুক্ত পাত্রী।

যথাসময়ে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। কথিত আছে, আবদুল্লাহ্‌ একদিন বনী আসাদ গোত্রের এক রমণীর কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রমণীটি কাবাগৃহের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। তার নাম ছিলো রাকীসা অথবা কাতীল বিনতে নওফল। আবদুল্লাহ্‌র রূপ-লাবন্য দেখে সে অভিভূত হলো। বললো, তোমার জন্য যে একশতটি উট কোরবানী করা হয়েছে, তা আছে আমার যিম্মায়। আমি তা

তোমাকেই দিতে চাই। আবদুল্লাহ্ রমণীর এমতো প্রস্তাবে লজ্জিত হলেন এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন। আর একদিন গণনাবিদ্যায় পারদর্শী এক সম্পদবতী মহিলা সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করতে চাইলো। এভাবে তাঁকে পতিরূপে পেতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো আরো অনেক সম্ভ্রান্ত ও রূপসী নারী। তাদের কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি।

যথাসময়ে মহাপুণ্যবতী আমেনার সঙ্গে তাঁর বাসর সম্পন্ন হলো। নূরে মোহাম্মদী তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে চলে গেলো আমেনার উদরে। তিনি গর্ভবতী হলেন। সময়টি ছিলো মিনার সময়। এরপর তাঁকে যারা পতিরূপে পেতে চেয়েছিলো, তাদের একজন তাঁর সাক্ষাত পেলো। দেখলো, তাঁর ললাটে দীপ্যমান নূরটি আর নেই। সে বললো, আপনি কি ইতোমধ্যে কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর নাম আমেনা বিনতে ওয়াহাব। সে বললো, এখন আর কোনো রমণী আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। কেননা আপনার ললাটে যা ছিলো, তার অধিকারিণী এখন আপনার স্ত্রী। এক বর্ণনায় এসেছে, যে রমণী তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলো, সে ছিলো ওয়ারাকা ইবনে নওফলের ভগ্নি। ওয়ারাকা হজরত খাদীজার চাচাতো ভাই ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে অন্য এক রমণীর কথা— যার নাম ছিলো আদুবিয়া। এমনও হতে পারে যে, কথিত দুই রমণীই হজরত আবদুল্লাহ্র সহধর্মিণী হওয়ার অভিলাষিণী ছিলো।

মাতৃগর্ভে

হজরত আবদুল্লাহ্র পৃষ্ঠদেশ থেকে রসুলে আকরম স. এর জীবনকণিকা হজরত আমেনার গর্ভে উপস্থিত হয়েছিলো বিশুদ্ধমতানুসারে হজের দিনসমূহের আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিবসের জুমার রাত্রিতে। এজন্যই ইমাম আহমদ বলেন, জুমার রাত্রি লাইলাতুল কদরের রাত্রির চেয়েও উত্তম। কেননা ওই রাতে মাতৃউদরে শুভাগমন করেছিলেন মহাবিশ্বের মহামমতার প্রতিভূ মহানবী মোহাম্মদ মুস্তফা স. স্বয়ং। সুতরাং অন্য কোনো রাতই এই রাতের সমতুল হতে পারে না। কাজেই মিলাদ শরীফের রাতকে শবে কদরের চেয়েও উত্তম মনে করতে হবে। হাদিস শরীফে এসেছে, মিলাদ শরীফের রাতে আলমে মালাকুতে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো যে, সমগ্র বিশ্বজগতকে পবিত্র নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও। পৃথিবী ও আকাশের সকল ফেরেশতা তখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো। জান্নাতের রক্ষী ফেরেশতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, ফেরদৌসে আলাকে উন্মুক্ত করে দাও এবং সমস্ত জাহানকে সুরভি দ্বারা মোহিত করে দাও। আকাশ-পৃথিবীর সকল স্তরে ও স্থানে এই সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে— নূরে মোহাম্মদী আজ রাতে মহাপুণ্যময়ী আমেনার উদরে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত খায়ের

ও বরকত, সম্মান, সৌভাগ্য, নূর ও রহস্যের উৎস এবং সকল জগত সৃষ্টির মূল, বনী আদমের মূলসমূহের মূল এ ধরাধামে আবির্ভূত হওয়ার সময় এখন সন্নিকটবর্তী। সুতরাং হে সৃষ্টিকুল! সম্মানিত ও আলোকিত হও। আনন্দ প্রকাশ করো।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন সুবহে সাদেকের সময় পৃথিবীর সকল প্রতিমা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। শয়তানদের আকাশারোহণকে করা হয়েছিলো রুদ্ধ। উল্টে গিয়েছিলো পৃথিবীর সকল সম্রাটের সিংহাসন। পৃথিবীর সকল গৃহ হয়ে গিয়েছিলো আলোকময়। এমন কোনো জায়গা তখন ছিলো না, যা তাঁর পবিত্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়নি। এমন কোনো প্রাণী ছিলো না, যাকে তখন বাকশক্তি দেওয়া হয়নি। প্রাণীকুলের সকলেই তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রচার করেছিলো। পূর্বপ্রান্তের পাখিরা পশ্চিম প্রান্তের পাখিদের কাছে বলাবলি করেছিলো তাঁর মহাআবির্ভাবের শুভসমাচার।

রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের পূর্বের বৎসর সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলো মক্কাবাসীরা। একটানা খরায় শুকিয়ে গিয়েছিলো সকল গাছের পাতা। শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলো প্রাণীকুল। কিন্তু তাঁর জন্মবর্ষে আল্লাহ্‌তায়ালা রহম করলেন। এতো বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যে, সকল গাছপালা ছেয়ে গেলো সবুজ পত্রপল্লবে। চারিদিকে সজীবতা ও সতেজতা দেখে মক্কার লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওই বৎসরের নাম দিয়েছিলো 'সানাতুল ফাতহ'।

রসুলেপাক স. মাতৃগর্ভে ছিলেন পুরো নয় মাস। গর্ভকালীন সময়ে তাঁর মা অন্যান্য গর্ভধারিণী মহিলাদের মতো শারীরিক কোনো অসুবিধা বোধ করেননি। ক্লান্তি-অবসাদ বা খাদ্যে অরুচি— কোনোকিছুই অনুভব করেননি তিনি। তিনি বলেছেন, আমার মনেও হতো না যে, আমি গর্ভবতী। শুধু বুঝতে পারতাম, আমি ঋতুরহিতা। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি ওই সময় সামান্য ভার অনুভব করতেন। আবু নাঈম উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে— গর্ভধারণের প্রথম দিকে তিনি কিছু ভার বোধ করতেন। পরে ওরকম অনুভূতি তাঁর ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স.কে তাঁর মা আমেনা যেদিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন, সেদিন আনন্দে উতলা হয়ে গিয়েছিলো সকল প্রাণী। তারা বলেছিলো, কাবাধিপতি প্রভুপালকের শপথ! আজ রাতে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল মাতৃগর্ভে আগমন করেছেন, যিনি সারা জাহানের ইমাম। সমগ্র সৃষ্টির সূর্য। অন্য এক বিবরণে এসেছে, ভূপৃষ্ঠের সকল চতুষ্পদ প্রাণী সে রজনীতে বাকশীল হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা সকলেই রসুলেপাক স. এর মাতৃগর্ভে আগমনের সুসংবাদ প্রচার করেছিলো।

সাইয়্যেদা আমেনা বলেন, আমি জাগ্রত ও নিদ্রার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় কে যেনো আমাকে ডেকে বললো, আমেনা! তুমি অন্তঃসত্ত্বা। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পুনরায় নেপথ্যচারী বললো, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ধারণ করেছো। একথা শুনে মনে হলো সত্যিই আমি গর্ভবতী। তিনি আরও বলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রত্যেক মাসেই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেতাম— তোমার জন্য ওই মুহূর্ত সমাগত, যখন আবুল কাসেম পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবেন। অপরিমেয় খায়ের ও বরকতের অধিকারী হবেন তিনি। বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খল অদৃঢ়। হজরত আমেনা বলেন, মোহাম্মদ আমার গর্ভে থাকাকালীন একবার আমার দেহ থেকে এমন এক নূর উদ্ভাসিত হলো, যার আলোকে সারা জাহান আলোকিত হয়ে গেলো। ওই নূরের ঝলকে আমি দেখতে পেলাম বসরার বালাখানাসমূহ। রসুলেপাক স. এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো। সাইয়্যেদা আমেনা রসুলেপাক স. ব্যতীত অন্য কোনো সন্তানের জননী হননি। হজরত আবদুল্লাহ্ও হননি আর কোনো সন্তানের জনক।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, রসুলেপাক স. যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন হজরত আবদুল্লাহ্র মৃত্যু হয়। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্র যখন মৃত্যু হয়, তখন রসুলেপাক স. আট মাস, সাতমাস অথবা দু'মাসের শিশু ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্র ওফাত হয়েছিলো মদীনা শরীফে। ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে তখন তিনি সেখানে কুরায়েশদের এক কাফেলার সঙ্গে ছিলেন। ব্যবসা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ওই কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে তিনি বনী নাজ্জারের নিকটে রয়ে যান। কাফেলার লোকেরা যখন মক্কা মুকাররমায় ফিরে এলো, তখন আবদুল মুত্তালিব হজরত আবদুল্লাহ্র খোঁজ করলেন। কাফেলার লোকেরা বললো, আমরা তাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হারেছকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হারেছ যখন মদীনায় পৌছলেন, তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁকে দারে নাবেগাতে দাফন করা হয়েছিলো। তবে কেউ কেউ বলেন, তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো আবওয়া নামক স্থানে। আবওয়া মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গার নাম।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্র যখন ইন্তেকাল হলো, তখন ফেরেশতারা বললো, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের নেতা মোহাম্মদ তোমার নবী এবং হাবীব। তিনি যে এতিম হয়ে গেলেন? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমিই তাঁর হেফাজতকারী, সাহায্যকারী এবং যিম্মাদার। তোমরা তাঁর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করো। বরকতের জন্য দোয়া করো (সলাওয়াতুল্লাহি তাআ'লা ওয়া মালাইকাতিহী ওয়ান্ নাবীয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাআ ওয়াস্ সলিহীনা আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'বদুল্লাহ্ ইব্‌ন আ'বদুল মুত্তালিব ওয়া বারাকাতুহু ওয়া সালামুহু)

বেলাদত শরীফ

সুবহানাল্লাহ্ ! রসুলেপাক স. মাতৃগর্ভে থাকতেই যে ফযীলত লাভ করেছিলেন, তার তুলনায় তাঁর জন্মক্ষণ যে আরো অধিক বিস্ময়কর ফযীলতে পরিপূর্ণ হবে— তা বলাই বাহুল্য। সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী রচয়িতারা এ বিষয়ে একমত যে, রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্ম হয়েছিলো ইয়াওমুল ফীল বা হস্তিদিবসের চল্লিশ বা পঞ্চাশ দিন পর। এই মতটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। আবার একথাটিও সুবিখ্যাত যে, তাঁর জন্ম হয়েছিলো রবিউল আউয়াল মাসে। কোনো কোনো আলেম বলেন, রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, উক্ত মাসের দুই বা আট তারিখ দিবাগত রাতে তিনি জন্মেছিলেন। অনেক আলেম এই অভিমতের সমর্থক। আবার কেউ কেউ দশ তারিখও বলে থাকেন। তবে বারোই রবিউল আউয়াল তারিখটি বেশী বিখ্যাত। মক্কাবাসীদের আমল উক্ত তারিখ অনুসারেই। তাঁরা উক্ত তারিখে জন্মস্থান জিয়ারত করতেন এবং মিলাদ শরীফ পড়তেন। রসুলেপাক স. এর বেলাদত শরীফ বারোই রবিউল আউয়াল সোমবার রাতের বেলায় হয়েছিলো। তাঁর উপর প্রথম ওহী অবতরণ, হিজরত করে মদীনা শরীফে উপনীত হওয়া, মক্কাবিজয় এবং ওফাত শরীফও সোমবার দিনেই হয়েছিলো। সুবহে সাদেকে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে গুফর উদিত হওয়ার কালে তিনি এ ধরাধামে শুভাগমন করেছিলেন। শেষ রাতে পূব আকাশে সুবহে সাদেক কালে যে ছোটো ছোটো তিনটি তারকা দেখা যায়, তাকে বলে গুফর। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বলা হয়েছে, সকল নবীই ওই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ বর্ণনাতে বেলাদতের সময় সুবহে সাদেক ছিলো বলা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বেলাদতের সময় ছিলো রাত্রিকাল। রাত দ্বারা অবশ্য এখানে সুবহে সাদেককেই বুঝানো হয়েছে। কেননা সুবহে সাদেককে রাতের অংশই মনে করা হয়। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় শায়েখ বদরুদ্দীন যারকাশী থেকে বর্ণিত হয়েছে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, বেলাদত শরীফ হয়েছিলো তখন, যখন ভোর খুব উজ্জ্বল হয়ে যায়, যা দিবাভাগেরই অংশ হিসেবে গণ্য। যখন তারকারাজি আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, ওই সময়কে রাতের অংশ হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা নবুওয়াত ও বেলাদতের সময়টি ছিলো মোজেজা প্রকাশের শুভক্ষণ। সুতরাং মোজেজা হিসেবে এমনটিই হওয়া সম্ভব যে, ওই সময় তারকারাজিকে আকাশ থেকে ছিটকে পড়তে দেখা গিয়েছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

কোনো কোনো গণক এবং গণনাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি বলেছেন, বেলাদত শরীফের মুহূর্তটি অত্যন্ত সৌভাগ্যময় মুহূর্ত। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকমই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, রসুলেপাক স. এর বুযুর্গী

কোনো কাল বা মুহূর্তের বুযুর্গীর কারণে হাসিল হয়নি। বরং সময় ও মুহূর্তই তাঁর বুযুর্গীর মাধ্যমে ধন্য হয়েছে। যেমন কোনো স্থানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় উক্ত স্থানে অবস্থান গ্রহণকারীর মর্যাদার মাধ্যমে। আর এখানেই এই হেকমতটি সক্রিয় যে, রসুলেপাক স. এর বেলাদত এমন কোনো মাসে হয়নি, যে মাসটি নিজে নিজেই একটি বুযুর্গ ও বরকতময় মাস বলে খ্যাত। যেমন মহররম, রজব, রমজান ইত্যাদি। বেলাদতের দিবসের বেলায়ও উক্ত হেকমতটিই পরিদৃষ্ট হয়। যেমন জুমার দিন একটি উত্তম দিন। সমস্ত দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিনটি সর্বোত্তম। কিন্তু ওই দিন তাঁর জন্ম হয়নি। জুমার দিনে হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। কিন্তু এদিন ওই দিনের চেয়ে উত্তম কেমন করে হবে, যে দিন রসুলে পাক স. জন্মগ্রহণ করেছেন? 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, রসুলেপাক স. এর জন্মদিন সোমবারকে আল্লাহ্তায়ালা বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করেননি, যেমন হজরত আদম আ. এর জন্মের দিন শুক্রবারকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাঁর জন্মদিন সোমবারকে ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারণ না করার কারণ হচ্ছে, তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থেই ওই দিনকে ইবাদতের জন্য লঘু করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি'। তবে সোমবার দিন নফল রোজা রাখা মোস্তাহাব, কারণ এ দিন রসুলে পাক স. এর জন্মের পরশধন্য। হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, রসুলেপাক স. সোমবার রোজা রাখতেন। এদিন রোজা রাখার কারণ সম্বন্ধে একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিনই আমার উপর প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করা হয়। মুসলিম।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেন, মক্কা মুকার্রমায় এক ইহুদী ছিলো। সে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। রসুলেপাক স. এর জন্মের রাতে সে বললো, হে কুরায়েশ জনমণ্ডলী! আজ রাতে তোমাদের কারো ঘরে কি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? কুরায়েশরা বললো, জানি না। সে বললো, আখেরী উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দু' কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নিদর্শন থাকবে, যাতে ঘোড়ার কাঁধের চুলের মতো ঘন পশমগুচ্ছ দেখা যাবে। তারপর ওই লোকটিকে যখন হজরত আমেনার গৃহে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন সে বললো, আমি নবজাতককে দেখতে চাই। শিশুনবীকে তার সামনে আনা হলো। সে মোহাম্মদ স. এর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে সেই নিদর্শনটি দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর বললো, আল্লাহ্র কসম! বনী ইসরাইল থেকে নবুওয়াত চলে গেলো। হাকেম। আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত হাসসেছে, হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত বলেছেন, রসুলেপাক স.

এর জন্মের সময় আমি সাত বা আট বৎসরের বালক ছিলাম। আমি তাঁর জন্মসংবাদ শুনেছি এবং তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি। এক ইহুদী সেদিন সকাল বেলায় তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। তার স্বজাতিরা সমবেত হয়ে বললো, কী হয়েছে? এভাবে ডাকাডাকি করছো কেনো? লোকটি বললো, আজ রাতে আহমদের তারকা উদিত হয়েছে। ওসমান ইবনে আবুল আস বর্ণনা করেছেন, আমার মা বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্মের সময় উপস্থিত ছিলাম। স্পষ্ট দেখলাম একটি নূরের ঝলক। ওই নূরের ঝলকে সকল ঘরবাড়ি, ঘরের দেয়াল সব কিছু আলোকিত হয়ে গেলো। আমি দেখতে পেলাম, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবীর খুব কাছে এসে গিয়েছে। মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি নক্ষত্রগুলো আমার উপরে পতিত হবে।

বিশুদ্ধ ও বিখ্যাত হাদিসসমূহে এসেছে, মহাসম্মানিতা আমেনা বলেছেন, আমি আমার সন্তানের জন্মের রাতে দেখলাম, একটি নূর প্রকাশিত হলো। তার আলোয় শাম (সিরিয়া) দেশের বালাখানাগুলি আলোকিত হয়ে গেলো এবং আমি তা দেখতে পেলাম। রসুলেপাক স. এর দুধমাতা হালিমা সাদীয়া বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদা আমেনা বলেছেন, তখন আমার সামনে একটি তারকা উদ্ভাসিত হলো, যার আলোকে গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেলো। তখন আমি সিরিয়া রাজ্যের প্রাসাদসমূহও দেখতে পেলাম। আমার সন্তান সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। তার শরীরে কোনো রকমের অপরিচ্ছন্নতা ছিলো না। তাঁর একথার দ্বারা বুঝা যায়, রসুল স. এর জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছিলো, যে নিয়মে অন্যান্য গর্ভধারিণীরা তাঁদের সন্তান প্রসব করেন। তাছাড়া অন্য এক হাদিসে এসেছে 'ফাআখাযানিল মাখায়ু'— (পানির খাট আমাকে পেলো) অর্থাৎ আমার প্রসবব্যথা শুরু হলো।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, আমার মায়ের নাম ছিলো শেফা। তিনি বলেছেন, যখন মহাপুণ্যবতী আমেনার সদ্যজাত সন্তানকে আমার হাতে দেওয়া হলো, তখন দেখা গেলো, তিনি খত্নাকৃত। হঠাৎ তিনি হাঁচি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেনো আওয়াজ ধ্বনিত হলো— ইয়ারহামুকাল্লাহ্। তখন পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত কিছুই আলোকিত হয়ে গেলো। আর আমি শাম দেশের অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলাম। এক বর্ণনায় এসেছে, পারস্যের প্রাসাদরাজির কথা। আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহের কথা। তবে শেষোক্ত বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা সিরিয়া ছিলো রসুলেপাক স. এর আপন রাজ্য। বিভিন্ন গ্রন্থে সিরিয়ার ফযীলত সম্পর্কে বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 'আশ্‌শিফা' পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে, সাইয়্যেদা আমিনা বলেন, আমি তখন ভয় পেলাম এবং আমার শরীরে কাঁপুনি

শুরু হলো। এরপর ডান দিক থেকে একটি নূর প্রকাশিত হতে দেখলাম। শুনতে পেলাম, কে যেনো বলছে, তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছো ? জবাব এলো, পশ্চিম দিকের সমস্ত বরকতময় স্থানে। এরপর বাম দিক থেকেও উক্তরূপ একটি নূর প্রকাশিত হতে দেখলাম। কে যেনো বললো, তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছো? জবাব এলো, পূর্ব দিকের সকল বরকতময় স্থানে। তাঁকে নবী ইব্রাহীমের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছেন এবং তাঁর জন্য পবিত্রতা ও বরকতের দোয়া করেছেন। শেফা বলেন, ঘটনাটি আমার মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে গিয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে যখন রসুলেপাক স. তাঁর নবুওয়াতের প্রচার শুরু করলেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং প্রথম সারির মুসলমানদের মধ্যে পরিগণিত হলাম। তিনি আরো বলেছেন, মহাসৌভাগ্যবতী আমেনা যখন ছ'মাসের গর্ভবতী, তখন স্বপ্নযোগে শুনতে পেয়েছিলেন— হে আমেনা! তুমি পৃথিবীর গর্ভধারিণীদের মধ্যে সর্বোত্তমা। তোমার সন্তানের নাম রেখো মোহাম্মদ। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মোহাম্মদ নাম তাঁর মহাসম্মানিতা মাতার পক্ষ থেকেই রাখা হয়েছিলো। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ নাম রেখেছিলেন হজরত আবদুল মুত্তালিব। মূলত বর্ণনা দু'টোর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

নবীজননী আমেনা বলেন, মেয়েদের প্রসবকালে যে অবস্থা হয়, আমার যখন সেরূপ অবস্থা শুরু হলো, তখন আমি নির্জন গৃহকোণে আশ্রয় নিলাম। হজরত আবদুল মুত্তালিব তখন তওয়াফরত ছিলেন। ওই সময় আমি এক বিস্ময়কর শব্দ শুনতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। দেখতে পেলাম, একটি শাদা মোরগ এসে তার ডানা দিয়ে আমার বুকের উপর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, আমার ভয় আরও বেড়ে গেলো। তারপর দেখতে পেলাম আমার পাশে একটি শরবতের পেয়ালা। আমি তা থেকে শরবত পান করলাম। পেলাম পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি। তারপর নূরের তৈরী একটি উঁচু মিনার এবং কতিপয় রমণীর দেখা পেলাম, যারা ছিলো আবদে মানাফ বংশের মেয়েদের মতো দীর্ঘদেহধারিণী। আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? তাঁদের একজন বললেন, আমি ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। অপরজন বললেন, আমি ইমরানের কন্যা মরিয়ম। আর আমাদের সঙ্গিনীরা বেহেশতের হুর। মহামহিমময়ী আমেনা বলেন, তখন আমার অবস্থা হলো আরো সঙ্গীন। মুহুর্মুহু বিকট আওয়াজ ধ্বনিত হতে লাগলো। আমি রীতিমতো ভয় পেতে লাগলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরাশ। দেখলাম, মাটি থেকে ঊর্ধ্বদেশ পর্যন্ত বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছে রূপার চাঁদ। এরপর দেখলাম, এক ঝাঁক পাখি এসে আমার প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ করে ফেললো। পাখিগুলোর চঞ্চু যমরদ এবং ডানা ইয়াকুতের তৈরী। আল্লাহ্‌তায়ালা আমার দৃষ্টির পর্দা সরিয়ে দিলেন। আমি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব কিছু দেখতে

পেলাম। আরও দেখতে পেলাম তিনটি পতাকা---- একটি পূর্বপ্রান্তে, একটি পশ্চিম প্রান্তে, আরেকটি কাবাশরীফের উপরে। আবার প্রসববেদনা অনুভব করলাম। একটু পরেই আমার পুত্রসন্তান মোহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হলো। দেখলাম, নবজাতক সেজদায় পড়ে আছেন। তাঁর দু'হাতের দুই শাহাদত আঙুল আকাশের দিকে উত্তোলিত। এরপর একটি মেঘখণ্ড দেখতে পেলাম। এক মুহূর্তে সে মেঘখণ্ড তাঁকে আমার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেললো। কিসের যেনো আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেনো ডেকে বলছে, এঁকে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়ে আনো এবং পৃথিবীর সকল শহরে ঘুরিয়ে আনো, যেনো সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর পবিত্র নাম, গুণাবলী ও আকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারে। যেনো আরো জানতে পারে যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাহী, অর্থাৎ অংশীবাদিতার মূলোৎপাটনকারী। অন্য এক হাদিসে এসেছে, সাইয়েদা আমেনা বলেছেন, তাঁকে যখন আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হলো, তখন আমি এক বিশাল আকৃতির নূরানী মেঘখণ্ড দেখতে পেলাম, যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিলো অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, তাদের পদবিক্ষেপের শব্দ এবং জনসমাগমের আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেই মেঘখণ্ড তাঁকে আচ্ছাদিত করে ফেললো এবং আমার দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শুনলাম, কে যেনো ঘোষণা করছে— সর্বশেষ নবীকে পৃথিবীর সবজায়গায় ভ্রমণ করাও। জ্বিন মানুষ পশুপাখি ও ফেরেশতাদের মধ্যে বিচরণ করিয়ে আনো। তাঁকে হজরত আদমের স্বভাববৈশিষ্ট্য, হজরত শীশের আধ্যাত্মজ্ঞান, হজরত নূহের বীরত্ব, হজরত ইব্রাহীমের বন্ধুত্ব, হজরত ইসমাঈলের ভাষা, হজরত ইসহাকের পরিতুষ্টি, হজরত সালেহের প্রাঞ্জলতা, হজরত লুতের প্রজ্ঞা, হজরত ইয়াকুবের শুভসমাচার, হজরত মুসার দৃঢ়তা, হজরত আইয়ুবের সহিষ্ণুতা, হজরত ইউনুসের আনুগত্য, হজরত ইউশার জেহাদ, হজরত দাউদের কণ্ঠস্বর, হজরত দানিয়েলের প্রীতি, হজরত ইলিয়াসের মর্যাদা, হজরত ইয়াহ্ইয়ার নিষ্পাপত্ব এবং হজরত ঈসার নির্লিপ্ততার প্রতীক বানাও। সন্তরণ করাও সকল নবীর সৎস্বভাবলীর সমুদ্রে। সাইয়েদা আমেনা বলেন, তারপর সেই মেঘখণ্ড অপসৃত হলো। আমি দেখলাম, একটি সবুজ রেশমী কাপড়ের মধ্যে আমার সন্তানকে আগলে রাখা হয়েছে। আর সেই রেশমী কাপড় থেকে ঝর্ণার মতো পানি টপকে টপকে পড়ছে। কে যেনো ঘোষণা করছে— মাশাআল্লাহ্! এ মহান শিশুকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মহিমা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। সকল সৃষ্টি তাঁর আনুগত্য করবে। সকলকেই হতে হবে তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমি যখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তখন দেখলাম পূর্ণিমার পূর্ণ শশীসদৃশ ঝকমক করছে তাঁর সমস্ত অবয়ব। আর তা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ। দেখলাম, তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে— একজনের হাতে রৌপ্যের চন্দ্র, অপর

জনের হাতে সবুজ তস্তরী এবং তৃতীয় জনের হাতে শ্বেতশুভ্র রেশমী বস্ত্র। তারপর তারা বের করলো চোখ ধাঁধানো একটি অঙ্গুরীয়। ওই অঙ্গুরীয় দিয়ে তারা নবজাতকের দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মহর মেরে দিলো। তারপর তারা শাদা রেশমী কাপড় দিয়ে অঙ্গুরীয়টি পেঁচিয়ে উঠিয়ে নিলো। কিছুক্ষণ পর তারা তাঁকে আমার ক্রোড়ে সমর্পণ করলো।

হজরত আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, তাঁর জন্মের রাত্রিতে আমি কাবা শরীফের সন্নিকটে ছিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেখতে পেলাম, কাবা শরীফ মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেজদা করছে। কাবা শরীফ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে তকবীর ধ্বনি। মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে— আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার রাব্বু মুহাম্মাদিনিল মুস্তফা আলআন ক্বদা তাহ্হারানী রাব্বি মিন আন্জাম্লিল আস্নানি ওয়া আরজাম্লিল মুশ্রিকীন (আল্লাহ্ মহান! আল্লাহ্ মহান! তিনি মোহাম্মদ মুস্তফার প্রভুপালনকর্তা। এরপর তিনি আমাকে মূর্তিপূজার অশুদ্ধতা এবং অংশীবাদীদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দিলেন)। গায়েব থেকে আরও উচ্চারিত হলো— কাবার প্রভুর শপথ! কাবা মর্যাদায়িত হলো। শুনে রাখো, কাবা হবে তাঁর কেবলা এবং তাঁর বাসস্থান। তখন কাবাগৃহের অভ্যন্তরে রক্ষিত মূর্তিসমূহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো। আর সেখানকার সর্ববৃহৎ মূর্তি হুবল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। মহাপুণ্যময়ী আমেনার কোল আলো করে মোহাম্মদ মুস্তফা ভূমিষ্ঠ হলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ হলো রহমতের মেঘমালা।

জেনে রাখা উচিত, সকল ঐতিহাসিক এব্যাপারে একমত যে, রসুলে আকরম স. নাভি কাটা এবং খত্নাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ আমাকে যে সকল সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আমি খত্নাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখতে পায়নি। খত্নাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার রহস্য এটাই। আবার তার কারণ হিসেবে কোনো কোনো আলেম একথাও বলেছেন যে, রসুলেপাক স. এর অস্তিত্বের পূর্ণতার মধ্যে কোনো সৃষ্টির কোনোরূপ কর্তৃত্ব না থাকুক, এটাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য। সে জন্যই খত্নাকৃত অবস্থায় তিনি তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবার এর কারণ এ-ও হতে পারে যে, পবিত্র সত্তা কোনোরূপ ত্রুটি বা অপূর্ণতার সঙ্গে যেনো সম্পৃক্ত না হয়। শেষ যুগের আলেমগণের মধ্যে কেউ কেউ এই বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন এবং এই হাদিসের ব্যাপারে জারাহ নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক' কিতাবে এই হাদিসের সুবিদিত হওয়ার দাবী করেছেন। জাহাবী বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারেই যখন সমালোচনা রয়েছে, তখন একে 'সুবিদিত' বলা যেতে পারে কীভাবে? কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি যেহেতু

অধিক আলোচিত, তাই হয়তো এটিকে শব্দগত ও অর্থগতভাবে 'সুবিদিত' বলা হয়েছে। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, এটা রসুল স. এর কোনো বিশেষত্ব নয়। কেননা অনেক শিশু এভাবেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর খত্না হজরত জিবরাইল করেছিলেন তাঁর বক্ষবিদারনের সময়। আবার এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে খত্না করিয়ে অতিথি সৎকার করিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

খত্না করা সুন্নত না ওয়াজিব— এ বিষয় নিয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেছেন, খত্না করা সুন্নত। এ মত পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং কিছুসংখ্যক শাফেয়ী মতাবলম্বী। আবার কাজটিকে ওয়াজিব বলেছেন কিছুসংখ্যক মালেকী মতাবলম্বী।

রসুল স. এর জন্মগ্রহণের সময়ে প্রকাশিত মোজেজাসমূহের সংখ্যা অগণনীয়। তার মধ্যে কিছুসংখ্যকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো। ওই মোজেজাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মোজেজা হচ্ছে— পারস্যের বালাখানাসমূহ প্রকম্পিত হওয়া এবং তার চৌদ্দটি প্রস্তরস্তম্ভ ধসে পড়া। চৌদ্দটি স্তম্ভ ধসে পড়ার ব্যাখ্যা কোনো কোনো আলেম করেছেন এভাবে— তাদের বাদশাহী চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। পরবর্তীতে দেখা গেছে চার বৎসরে সিংহাসনে বসেছে দশজন। তারপর আমীরুল মুমিনীন হজরত ওসমানের খেলাফত পর্যন্ত রাজত্ব করেছে অবশিষ্ট বাকী চারজন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বলা হয়েছে, হজরত ওমরের খেলাফতকাল পর্যন্ত তাদের বাদশাহী স্থায়ী ছিলো।

রসুলেপাক স. ভূমিষ্ঠকালের অন্যতম মোজেজা ছিলো শুকিয়ে যাওয়া ছাবী দরিয়ায় পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া। তাছাড়া সামাওয়া নামক একটি ঝর্ণা ছিলো, যা হাজার বৎসর পর্যন্ত ছিলো বিশুষ্ক। তাঁর জন্মের সময় তা প্রবাহিত হয়েছিলো। পারস্যবাসীদের হাজার বৎসরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডও সেসময় নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিলো। এহেন অবস্থা দর্শনে তখনকার পারস্যরাজের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়েছিলো। কিন্তু সে তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতো না। ওই সময় পারস্যের প্রধান বিচারকর্তা মুআবদান স্বপ্নে দেখলো, একটি শক্তিশালী উট এবং চতুর একটি আরবী ঘোড়া দৌড়ে এসে দজলা নদী পার হয়ে শহরে প্রবেশ করলো। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা স্বপ্নটিকে ব্যাখ্যা করলো এভাবে—আরব দেশে এমন কোনো ঘটনা ঘটবে, যার প্রভাবে অনারব দেশসমূহ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা করার জন্য পারস্যসম্রাট গণকদের কাছে, বিশেষ করে সে দেশের সবচেয়ে নামকরা এবং অভিজ্ঞ গণৎকার সাতীহের কাছে

লোক পাঠালো। ওই গণৎকারটির অবস্থা ছিলো বিস্ময়কর। কথিত আছে, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো জোড়া ছিলো না। সে দাঁড়াতে এবং বসতে পারতো না। কিন্তু সে যখন রাগান্বিত হতো তখন মশকের মতো ফুলে উঠতো এবং বসে পড়তো। তার শরীরে হাতের আঙ্গুল ও মস্তক ব্যতীত কোথাও হাড় ছিলো না। তার পুরু দেহটি ছিলো একটি মাংশস্তূপের মতো। তাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে নিয়ে যেতে হতো। আরো কথিত আছে, তার মুখ ছিলো তার বুকের মধ্যে। তার মাথা ও ঘাড় আলাদা ছিলো না। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তার বয়স হয়েছিলো প্রায় দু'শ বৎসর। গায়েবী বিষয়ের কোনো কিছু তার কাছে জিজ্ঞেস করতে হলে তাকে মুক্তার মালার মতো দোলাতে হতো। তখন তার নিঃশ্বাস ফুলে উঠতো এবং সে কথা বলতে শুরু করতো। সম্রাটের দূত যখন ওই সাতীহ্ নামক ব্যক্তির কাছে গেলো, তখন সে মৃত্যুশয্যায়। দূত তাকে সম্রাটের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালো। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর এসেছে বলে অনুমান করা গেলো না। দূত কিছু কবিতা পাঠ করলো, যার মধ্যে সম্রাটের প্রসঙ্গ ছিলো। সাতীহ কবিতাগুলি শুনে মুচকি হেসে বলতে লাগলো এখন কোরআন পাঠের এবং যষ্টিধারী ব্যক্তির আগমনের সময়। অর্থাৎ মোহাম্মদ মুস্তফার আগমনের সময়। এখন সামাওয়া মরুভূমিতে পানি প্রবাহিত হবে। জলপ্রবাহ শুরু হবে বিশুষ্ক ছাবী ঝর্ণাতেও। আর নিভে যাবে পারস্যের হাজার বৎসরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। সাতীহও আর দুনিয়াতে থাকবে না। এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভূতলশায়ী হলো। সাঙ্গ হলো তার জীবন লীলা।

আল্লাহ্তায়ালা পারস্যের সর্বশেষ সম্রাট ইয়াযদেজরদের সাম্রাজ্য খতম করেছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের মাধ্যমে। তার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে পলায়ন করেছিলো। তারপর কিছুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে সে পুনরায় প্রয়াস চালিয়েছিলো। শেষে হজরত ওসমানের খেলাফতকালে সে খোরাসানের দিকে পালিয়ে যায়। পরিশেষে তাকে বন্দী ও হত্যা করা হয়।

কাবাভ্যন্তরের মূর্তিসমূহ ভূলুণ্ঠিত হওয়াও রসুলেপাক স. এর জন্মের সময়ের অন্যতম মোজেজা। কুরায়েশরা প্রতি বৎসর তাদের প্রধান প্রতিমাটির কাছে সমবেত হতো। পূজার্চনা করতো। এতেকাফ করতো। একরাতে তারা দেখলো প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তারা সেটিকে উঠিয়ে পুনরায় যথাস্থানে খাড়া করে দিলো। আবার পড়ে গেলো প্রতিমাটি। আবার তারা উঠিয়ে দিলো সেটিকে। তৃতীয়বারও পড়ে গেলো। এ দুরাবস্থা দেখে তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। শেষে প্রতিমাটিকে তারা শক্ত করে যখন বেঁধে খাড়া করে দিলো, তখন সে মূর্তি থেকে একটি কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ আসতে লাগলো—

তুরাদ্‌দা বিমাওলূদি আম্বাআত নাবুরাহ্‌ — জ্বামিউ ফুজ্বাজ্বিল আরদ্বি বিশ্‌শারক্বি ওয়াল গারবি

ওয়া খর্‌রাত লাহুল আওছানু ত্বর্‌রা ওয়া রআ'দাত - ক্বলূবু মুলূকিল আরদ্বি জামআ'ম মিনার রু'ব।

অর্থঃ শুভজন্মের উত্তরীয় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার আলোকচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হয়েছে উদয়াচল ও অস্তাচল। আর তারই প্রতাপে প্রতিমাসকল এখন দুর্দশাগ্রস্ত। ওই মহাজনের পরাক্রমে সম্রাটপ্রবরদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে।

দুগ্ধপান

রসুলেপাক স.কে সর্বপ্রথম দুধপান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছুওয়ায়বা। রসুল স. এর জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে ছুওয়ায়বা আবু লাহাবের নিকটে গিয়ে বললেন, আপনার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ শুভসংবাদ শুনে আবু লাহাব খুশি হয়ে হজরত ছুওয়ায়বাকে মুক্তি দিলো। বললো, যাও। শিশুকে দুধ পান করাও। তুমি মুক্ত। রসুল স. এর জন্মের সংবাদ শুনে খুশিতে আত্মহারা হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা আবু লাহাবের জন্য দোজখের আযাব লাঘব করবেন। প্রতি সোমবার তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। হাদিস শরীফে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান যারা করেন, এই হাদিসটি তাঁদের পক্ষের দলিল। রসুলেপাক স. এর বেলাদতের রাতে (জায়েয পদ্ধতিতে) আনন্দ প্রকাশ করা এবং সম্পদ ব্যয় করা উত্তম কাজ। আবু লাহাব কাফের ছিলো। কোরআনে তার নিন্দা করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও রসুল স. এর বেলাদতে খুশি হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা তার প্রতিদান দিয়েছেন। দোজখের আযাব দিয়েছেন কিঞ্চিৎ হালকা করে।

ছুওয়ায়বা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না, সে ব্যাপারে হাদিসবেত্তাগণের মতভেদ আছে। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণনা করেন। জীবনীগ্রন্থসমূহে আছে, দুধপান করানোর কারণে তিনি স. তাঁকে সম্মান করতেন। মদীনা শরীফ থেকে তাঁর জন্য কাপড় চোপড় ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো খায়বরের যুদ্ধের বৎসর অষ্টম হিজরীতে। মক্কাবিজয়ের দিন মক্কা শরীফে প্রবেশ করে রসুল স. ছুওয়ায়বার খোঁজ করেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন, ছুওয়ায়বা আর নেই। বেঁচে নেই তাঁর কোনো নিকটজনও। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। ছুওয়ায়বা সাইয়্যেদুশ্‌ শুহাদা হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকেও দুধপান করিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধের দিক দিয়ে রসুল স. এবং হজরত হামযা ছিলেন পরস্পরের দুগ্ধসম্পর্কীয় ভাই।

কথিত আছে, রসুলেপাক স. তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মাতার দুধপান করেছিলেন সাতদিন। কিছুদিন ছুওয়ায়বার দুধ পান করেছিলেন। শেষে এমতো সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন হজরত হালিমা সাদীয়া। 'হেলেম' (সহিষ্ণুতা) গুণে গুণান্বিতা ছিলেন বলেই তাঁর নাম ছিলো হালিমা। আর তিনি যেহেতু বনী সা'দ ইবনে বকর গোত্রভূত ছিলেন, তাই তাঁকে বলা হতো সাদীয়া। বনী সা'দ গোত্রের লোকেরা ছিলেন মিষ্টভাষী। ফাসাহাত ও বালাগাতেও পারদর্শী ছিলেন তাঁরা। রসুলে পাক স. বলেছেন, আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফসীহ (বিশুদ্ধভাষী)। কারণ আমি কুরায়েশ কুলোদ্ভব এবং প্রতিপালিত হয়েছি বনী সা'দ গোত্রে। হজরত হালিমা সাদীয়ার দুধপান করানোর ব্যাপারে অনেক ফযীলত ও মোজেজার কথা বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোর কিছু বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হলো।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় রয়েছে, ইবনে ইসহাক, ইবনে রহওয়াইহ, আবু ইয়ালা, তিবরানী, বায়হাকী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হজরত হালিমা সাদীয়া বলেছেন, আমি বনী সা'দ ইবনে বকর গোত্রের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশু পাওয়ার আশায় মক্কায় গেলাম। তখন আরবদেশে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। বহুদিন ধরে বৃষ্টিপাত হচ্ছিলো না। আমার একটি দুর্বল গাধা ছিলো, যা ছিলো প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। একটি উটনী ছিলো, যার দুধের একটি বোঁটা ছিলো কম। আমার সাথে ছিলেন আমার সন্তান ও স্বামী। আমাদের অভাব এরকম ছিলো যে, রাত কোনোক্রমে কাটলেও দিন কাটিতে চাইতো না। আমাদের গোত্রের অন্যান্য মহিলারা আগেভাগে মক্কায় পৌঁছে দুগ্ধপোষ্য সকল শিশুকেই নিয়ে নিয়েছিলো। অবশিষ্ট ছিলেন কেবল রসুলেপাক স.। কারণ তিনি ছিলেন এতিম। আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! কোনো বাচ্চা না নিয়ে মক্কা থেকে ফিরে যাওয়া আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। আমি যাই, এতিম শিশুটিকেই নিয়ে আসি! আমি তাকেই দুধপান করাবো। আমি হজরত আমেনার ঘরে গেলাম। দেখলাম দুধের চেয়ে শুভ্র শিশু রেশমী বস্ত্রে পেচাঁনো অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁর দেহ থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর শরীরের নিচে বিছানো রয়েছে সবুজ রঙের রেশমী কাপড়। তিনি নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্বভাব ছিলো তিনি যখন নিদ্রা যেতেন, তখন তাঁর নাসিক্যধ্বনি হতো। এরকম হতো তাঁর বয়োবৃদ্ধকালেও। উল্লেখ্য, নাক ডাকার আওয়াজ বিকট না হলে প্রশংসনীয়। বিবি হালিমা বলেন, আমার তখন ইচ্ছা হচ্ছিলো, তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি। তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আমি তখন বিমোহিত। আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে কোলে তুলে নিলাম। তাঁর বুকের উপর হাত রাখা মাত্র তিনি মৃদু হেসে চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ থেকে একটি নূর বের হয়ে আকাশের দিকে উধাও হয়ে

গেলো, আমি তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন করলাম। ডান স্তন তাঁর মুখে দিলাম। তিনি প্রশান্তির সঙ্গে দুধ পান করলেন। এরপর বাম স্তন তাঁর মুখে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি তা মুখে নিলেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা রসুলেপাক স.কে শিশুকালেই ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার এলহাম করেছিলেন। তাই তিনি জানতেন, এক স্তনের দুধই তাঁর জন্য নির্ধারিত। কেননা হজরত হালিমার নিজেরও একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্র ছিলো। বিবি হালিমা বলেন, রসুলেপাক স. তাঁর আপন দুধভাইয়ের জন্য আমার একটি স্তনের দুধ রেখে দিতেন। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে নিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে এলাম। আমার স্বামীও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। এরপর আমার স্বামী উটনীটির দিকে দুগ্ধদোহনের জন্য গিয়ে দেখলেন উটনীর স্তন দুধে ভরপুর হয়ে আছে। অথচ ইতোপূর্বে সেটির স্তন ছিলো প্রায় দুগ্ধশূন্য। তিনি উটনীর দুধ দোহন করে নিজে পান করলেন। আমাকেও পান করালেন। আমরা পরিতৃপ্ত হলাম। সে রাত্রে আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলাম। বহুদিন ধরে আমরা এরকম শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারিনি। প্রায় সারাক্ষণ পেরেশানীতে থাকতে হতো আমাদেরকে।

আমার স্বামী বললেন, হালিমা! তোমাকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। কতোই না বরকতময় শিশু পেয়েছো তুমি। দেখছো না, কতো খায়ের ও বরকত হচ্ছে আমাদের সকল কাজে। এই মহান শিশুটির বদৌলতেই তো আজ আমাদের এ অবস্থা। আশা করি এরূপ খায়ের ও বরকত আমরা সব সময় পেতে থাকবো। বিবি হালিমা বলেন, এরপর আমরা কয়েক রাত মক্কায় কাটালাম। এক রাতে দেখলাম, একটি নূর তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছে। আরও দেখলাম, সবুজ বসন পরিহিত এক লোক তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার স্বামীকে জাগালাম। বললাম, দ্যাখো দ্যাখো কী আশ্চার্য ঘটনা! তিনি বললেন, হালিমা! চুপ থাকো। একথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। আমি জানি, ইহুদীরা এ শিশুর শত্রু। এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তাদের আলেম ও ধর্মযাজকেরা পানাহার পরিত্যাগ করেছে। তাদের মনে শান্তি নেই।

বিবি হালিমা বলেন, লোকেরা বিদায় হয়ে গেলো। সাইয়্যেদা আমেনা আমাকেও বিদায় দিলেন। আমার উটনীতে সওয়ার হয়ে রসুল স.কে কোলে নিয়ে সেখানে থেকে রওয়ানা দিলাম। আমার উটনীটি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন হয়ে গেলো। গর্দান টান করে দ্রুত সামনের দিকে চলতে লাগলো। আমরা যখন কাবা শরীফের সামনে এলাম, তখন উটনীটি তিনটি সেজদা করলো। তারপর আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে আওয়াজ করলো এবং গোত্রের অন্য সকল বাহনের আগে আগে দৌড়ে যেতে লাগলো। তার এরূপ দ্রুতগতি দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলো। আমার সঙ্গের মেয়েরা জিজ্ঞেস করলো, বিনতে যুওয়ায়ের! এটাকি

তোমার সেই উটনী যার উপরে চড়ে তুমি এসেছিলে? ওতো তোমার ভারই বহন করতে পারতো না। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা তো সেই উটনীই, যাতে চড়ে আমি এসেছিলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মহান শিশুটির বরকতে একে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তারা বললো, আল্লাহ্‌র কসম! এর মান-মর্যাদা অতি উচ্চ। বিবি হালিমা বলেন, আমি তখন আমার উটনীকে বলতে শুনলাম— হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমার আরোহীর মর্যাদা সত্যিই উচ্চ। আমি তো মৃতপ্রায় ছিলাম। এঁর বরকতেই আমাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। হে বনী সা'দ গোত্রের রমণীগণ! তোমরা এখনো অচেতন! তাই বুঝতে পারছো না আমার পিঠে কাকে বহন করে নিয়ে চলেছি। আমার পিঠে রয়েছেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খায়রুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন— হাবীবে রব্বুল আলামীন।

হালিমা সাদীয়া বলেন, পথে চলতে চলতে আমি শুনতে পেলাম আমার ডান ও বাম থেকে কে যেনো বলছে, হে হালিমা! তুমি এখন বিত্তবতী। বনী সা'দ গোত্রের রমণীদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিতা। বকরীর পালের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন বকরীগুলি আমার সামনে এসে বলতে লাগলো, হালিমা! তুমি কি জানো তোমার দুগ্ধপান করেছেন কে? ইনিই তো মোহাম্মদ, গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রভুপালকের বার্তাবাহক। আদমসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমজন। বিবি হালিমা বলেন, এরপর থেকে আমরা যে লোকালয়ে গেলাম, সেখান থেকেও সরে যেতে লাগলো দুর্ভিক্ষ-খরা-অজন্মা। প্রান্তর হয়ে উঠলো শস্যসজীব। আবার আমাদের নিজেদের বস্তিতেও দেখা দিলো সবুজের সমারোহ। আমার বকরীগুলি সারাদিন মাঠে চরে ফিরে সন্ধ্যায় ঘরে আসতো পরিতৃপ্ত হয়ে। তাদের স্তনগুলো পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো দুধে। আমরা ওগুলোর দুধ দোহন করে নিজেরা পান করতাম, অপরকেও পান করাতাম। আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদেরকে বলতো, বিনতে যুওয়ায়েব যে মাঠে বকরী চরায় তোমরাও সেখানে তোমাদের বকরীগুলোকে ছেড়ে দিয়ো। তারপর থেকে তাদের রাখালেরা আমার বকরীর সঙ্গে তাদের বকরীগুলোকে চরাতে শুরু করলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের বকরীগুলিতেও খায়ের বরকত দান করলেন। রসুলেপাক স. এর ওসিলায় আমাদের গোটা জনপদেই খায়ের বরকত ছড়িয়ে পড়লো।

বিবি হালিমা বলেন, রসুল স. এর মুখে যখন কথা ফুটলো, তখন আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, তিনি বললেন 'আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাওঁ ওয়া আসীলা'। আর রাতের বেলা শুনতে পেতাম, তাঁর কলব থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লহু কুদ্দুসান নামাতাল উ'য়ূনু ওয়ার রহমানু লা তা'খুযুহু সিনাতাওঁ ওয়ালা নাউম। বিবি হালিমা আরো বলেন, আমি রসুলেপাক স.কে দোলনায় শুয়ে চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে

শুনেছি এবং চাঁদের দিকে ইশারা করতে দেখেছি। তিনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকেই হেলে যেতো। আর ফেরেশতারা তাঁর দোলনা দুলিয়ে দিতো। তিনি স. কখনও তাঁর পরিহিত বস্ত্রে মলমূত্র পরিত্যাগ করতেন না। এ দু'টো কাজের জন্য তাঁর ছিলো নির্দিষ্ট সময়, আমি তাঁর মুখ থেকে দুধ ইত্যাদি পরিষ্কার করে দেওয়ার আগেই কে যেনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতো। তাঁর মুখমণ্ডল সব সময় থাকতো পাক-সাফ। শরীর থেকে কাপড় একটু সরে গেলেই তিনি নড়াচড়া এবং আওয়াজ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর কাপড় ঠিক করে দিতাম। একটু বিলম্ব করলেই দেখতাম কে যেনো তাঁর কাপড় ঠিক করে দিয়ে গেছে। খেলাধুলা করার বয়সে পৌঁছলেও তাঁর মধ্যে খেলাধুলার প্রবণতা দেখা গেলো না। ক্রীড়ারত বালক-বালিকাদের থেকে দূরে থাকতেন তিনি। বলতেন, আমাকে খেল-তামাশা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। নবী ইয়াহ্ইয়াও এরকম বলতেন। বিবি হালিমা বলেন, রসুলেপাক স. এর শারীরিক প্রবৃদ্ধিও ছিলো স্বতন্ত্র ধরনের। অন্যান্য বালক একমাসে যতটুকু বাড়তো, তিনি ততটুকু বাড়তেন একদিনে। আর তাদের এক বৎসরের বেড়ে ওঠার সমান ছিলো তাঁর এক মাসের বেড়ে ওঠা। ওই বয়সেই মাঝে মাঝে সূর্যালোকের মতো কী যেনো এসে তাঁকে বেষ্টন করতো। তিনি তখন হয়ে যেতেন অপার্থিব আলোকে আলোকিত। এক বর্ণনায় এসেছে, শাদা বস্ত্র পরিহিত দু'জন লোক এসে তাঁর জামার বুকের ফাঁড়া স্থান দিয়ে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যেতো। তিনি কখনো কান্নাকাটি করতেন না। কোনোরূপ খারাপ আচরণও করতেন না। জন্মাবধি তিনি এরকম ছিলেন। কোনোকিছুর উপর হাত রাখলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করতেন 'বিসমিল্লাহ্'।

বিবি হালিমা বলেন, আমি তাঁর এরূপ সুউচ্চ মর্যাদা দেখে আমার স্বামীকে আমার নিকট আসতে নিষেধ করতাম। আমি তাঁকে দূরে কোথাও যেতে দিতাম না। একদিন আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এর মধ্যে তিনি তাঁর দুধবোন শীমার সঙ্গে বাইরে চলে গেলেন। শীমা তাঁকে খুবই আদর করতো। সেদিন গরম পড়েছিলো খুব। আমি তাঁর তালাশে জলদী বের হয়ে গেলাম। কিছু দূর যেতেই দু'জনকেই দেখতে পেলাম। শীমাকে বললাম, এরূপ উত্তপ্ত লু হাওয়ার মধ্যে তুমি একে নিয়ে এসেছো কেনো? শীমা বললো, কই! আমরা তো কোনো উত্তাপ অনুভব করছি না। একখণ্ড মেঘ সারাক্ষণ আমাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমরা যেদিকে যাই, মেঘটিও সাথে সাথে যায়। এভাবেই আমরা এখানে এসেছি। এই হাদিসে দেখা যায়, রসুলেপাক স. এর উপর মেঘমালা ছায়া প্রদান করতো তাঁর বাল্যবেলা থেকেই। তবে আলেমগণ বলেন, এরকম ঘটনা যে সবসময় ঘটতো, এমন নয়।

রসুলেপাক স. এর বক্ষবিদারণের ঘটনাও ঘটেছিলো তাঁর দুধমা হালিমা সাদীয়ার গৃহে। ঘটনাটি এরকম— একদিন তিনি স. হালিমাকে বললেন, মা!

তুমি আমাকে ভাইদের সঙ্গে ছাগল চরাতে যেতে দাওনা কেনো? তোমার ছাগলগুলোতো আমিই চরিয়ে আনতে পারি। একথা শুনে তিনি একদিন তাঁর প্রাণাধিক দুধপুত্রকে রাখালদের সঙ্গে মাঠে যেতে দিলেন। তার আগে তাঁকে সাজিয়ে দিলেন সুন্দর করে। চুল আঁচড়িয়ে দিলেন। নতুন কাপড় পরিয়ে দিলেন। চোখে লাগিয়ে দিলেন সুরমা। তারপর বদনজর থেকে রক্ষা পাবার মানসে তাঁর কাঁধে ইয়েমেনি কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিয়ে দিতেই তিনি স. তা ভেঙে ফেললেন। বললেন, আমার প্রভুপালকই আমাকে রক্ষা করবেন। একথা বলেই তিনি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন চারণভূমির দিকে। অর্ধদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বিবি হালিমার ছেলেরা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মা! মা! আমাদের ভাইটির বড়ই বিপদ। সে আমাদের সাথে সাথেই ছিলো। হঠাৎ কোত্থেকে একটি লোক এসে তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেলো। তার পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম, লোকটি তাকে মাটিতে শুইয়ে তার পেট চিরে ফেলেছে। দেখেই আমরা ছুটে এসেছি। জানিনা এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কিনা। বিবি হালিমা এবং তাঁর স্বামী ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ছুটে গেলেন চারণভূমির দিকে। পাহাড়ে উঠে দেখলেন, বালক রসুল আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে দৃষ্টি ফেরালেন। তাঁদেরকে দেখে মৃদু হাসলেন। ঘটনাটি হাদিস গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আবু ইয়া'লা, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকের শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, একবার আমি বনী লাইছ ইবনে বকর গোত্রে আমার দুধভাইদের সঙ্গে মরুভূমিতে ছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো তিনজন লোকের প্রতি। তাদের একজনের হাতে একটি বরফভর্তি সোনার তস্তরি ছিলো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক জনের হাতে ছিলো রূপার বদনা, আরেক জনের হাতে ছিলো সবুজ জমরদের জলপাত্র। ওই পাত্রটিও ছিলো বরফে ভরা। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। আমার সাথী-সঙ্গীরা মহল্লার দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। লোক তিনজন আমাকে আলতো করে মাটিতে শুইয়ে দিলো। একজন আমার বুকের মধ্যখান থেকে নাভি পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেললো। আমি ব্যাথা পেলাম না। তারা আমার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে আনলো। সেগুলো বরফ দিয়ে খুব ভালোভাবে ধৌত করলো। তারপর তা যথাস্থানে রেখে দিয়ে দণ্ডায়মান হলো। তাদের একজন বললো, এখন তোমরা এখান থেকে চলে যাও। বলেই সে আমার পেটের ভিতর হাত দিয়ে আমার কলিজা বের করে আনলো। কলিজাটি বিদীর্ণ করে তা থেকে কালো রক্তের একটি টুকরো বের করে ফেলে দিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, কালো দাগ বের করে ফেলে দিলো। বললো, এটা শয়তানের অংশ। তারপর সে তার কাছে যা ছিলো তা আমার হৃৎপিণ্ডে ভরে দিলো। এক বিবরণে বলা হয়েছে, বস্তুটির নাম শাকবা। তারপর লোকটি তার ডান ও বাম

দিকে ফিরে কিসের যেনো ইশারা করলো। মনে হলো, সে যেনো কারো কাছে কিছু খুঁজছে। কে যেনো তাকে একটি নূরের আঙটি দিলো। আঙটিটি ছিলো তীব্র জ্যোতির্ময়। সেদিকে সরাসরি তাকালে চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয়। ওই আঙটি দিয়ে লোকটি আমার কলবকে মহরাংকিত করলো। তার সঙ্গে মিশ্রিত করা হলো নবুওয়াত ও হেকমতের নূর। তারপর আমার কলবকে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হলো। ওই মহরাংকনের শীতলতা এবং উৎফুল্লতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনুভব করেছিলাম। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে— আমার সীনার ভিতর উক্ত মহরের শীতলতা আমি বহুদিন ধরে অনুভব করেছি। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে— তার শীতলপ্রভাব এবং আনন্দ আমি এখন পর্যন্ত আমার শরীরের জোড়ায় জোড়ায় অনুভব করি। এতে করে বুঝা যায়, মহরের শীতলতা রাসুল স. সারা জীবন ধরেই অনুভব করেছিলেন। আল্লাহ্ই উত্তম পরিজ্ঞাতা।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তাদের একজন যখন আমার নাড়িভুঁড়ি পানি দ্বারা ধৌত করা শুরু করলো, তখন দ্বিতীয় জন বললো, বরফ ও পানি দ্বারা ধৌত করো। তাই করা হলো। বর্ণনাটি এই দোয়া মাছুরার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— আল্লহুম্মা আগ্‌সিল খত্বাইয়া বিমাইছ্ ছাল্‌জ্বি ওয়াল বার্‌দ (হে আল্লাহ্! আমার গোনা খাতাসমূহ বরফ ও শীতল পানি দ্বারা ধৌত করে দাও)। তারপর দ্বিতীয় জন বললো, ওঠো। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। এ কথা বলে সে আমার বুকের পাঁজরের মিলনস্থল থেকে নিয়ে নাভি পর্যন্ত হাত বুলালো। ফলে বিদীর্ণ বুক মিলিত হয়ে গেলো। এরপর তারা দু'জনে আমাকে আস্তে করে উঠিয়ে দিলো। আমাকে জড়িয়ে নিয়ে আমার দু'চোখের মধ্যবর্তীস্থানে চুম্বন করলো। বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। আপনি যদি জানতেন, এ কাজের মধ্যে আপনার জন্য কী পরিমাণ খায়ের ও বরকত লাভ হয়েছে, তাহলে আপনার চক্ষু খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো এবং আপনি অবশ্যই প্রসন্ন হতেন। একথা বলেই তারা আকাশের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি চেয়ে রইলাম তাদের গমনপথের দিকে। হজরত আনাস রা. বলেছেন, আমি রসূলেপাক স. এর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত বক্ষবিদারণের সরু সূতার মতো দাগ দেখেছি। বিদ্বানগণ বলেন, কলব ধৌত করার ব্যাপারটি কেবল রসুল স. এর ক্ষেত্রে ঘটেনি, ঘটেছিলো অন্য নবীগণের বেলাতেও। তাঁদের কলবে শয়তানের যে অংশ থাকতো, তা এভাবেই দূর করে দেওয়া হতো।

রসুল স. এর এহেন বক্ষবিদীর্ণ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো কয়েকবার। ছ'বছর বয়সে, এক বর্ণনানুসারে দশ বছর বয়সে, আবার বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের বক্তব্যানুসারে মেরাজ রজনীতে। কোনো কোনো আলেম উক্ত বিষয়ের সকল বর্ণনা সমন্বয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। আমিও এরকম করেছি মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রথম দিকে।

হালিমা সাদীয়া বলেন, বক্ষবিদারণের ঘটনা যখন সংঘটিত হয়, তখন আমার স্বামী এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে পরামর্শ করলো। শেষে সকলে একমত হলো, নিশ্চয় মোহাম্মদ অশুভ কোনোকিছু দ্বারা আক্রান্ত। এমতাবস্থায় তাঁকে আর এখানে রাখা ঠিক নয়। মা ও দাদার নিকট ফিরিয়ে দেওয়াই ভালো। হালিমা সাদীয়া বলেন, তারপর আমরা তাঁকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলাম। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে থামতে হলো। তাঁকে এক স্থানে বসিয়ে রেখে আমি একদিকে চলে গেলাম। ফিরে এসে তাঁকে আর সেখানে দেখতে পেলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পেলাম না। শেষে নিরাশ হয়ে মাথায় হাত রেখে 'ও আমার মোহাম্মদ, ও আমার সন্তান' বলে বলে ডাকতে লাগলাম। এমন সময় এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করে আমার কাছে এসে বললো, কী হয়েছে? বিলাপ করছো কেনো? আমি বললাম, আমার সন্তান হারিয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ বললো, কেঁদো না। আমি তোমাকে তার সন্ধান বলে দিচ্ছি। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয় তুমি যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারবে। আমি বললাম, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীত হোক। অনুগ্রহ করে বলুন, তিনি আবার কে? বৃদ্ধ বললো, তিনি হচ্ছে বড় দেবতা হুবল, তিনি বড়ই মর্যাদাবান। তিনি জানেন তোমার সন্তান কোথায় আছে। আমি বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক। তুমি কি জানো না, এ সন্তানের জন্মের রাত্রিতে মূর্তিসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয়েছিলো? বৃদ্ধটি আমাকে জোর করে হুবল মূর্তির কাছে নিয়ে গেলো এবং আমাকে নিয়ে মূর্তিটিকে প্রদক্ষিণ করলো। মূর্তিকে লক্ষ্য করে আমার বিপদের কথা বললো। সঙ্গে সঙ্গে হুবলের মস্তক ভেঙে পড়ে গেলো। তার পাশের প্রতিমাগুলো পড়ে গেলো উপুড় হয়ে। ওগুলোর ভিতর থেকে উচ্চারিত হলো, বৃদ্ধ তুমি দূর হয়ে যাও। ওই সম্মানিত সন্তানের নাম আর উচ্চারণ কোরো না। তার দ্বারাই তো আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হবো। আমাদের পূজারীরাও নিশ্চিহ্ন হবে তাঁর হাতে। তিনি তো চিরসুরক্ষিত। কেননা তাঁর রক্ষাকর্তা আল্লাহ্।

হালিমা সাদীয়া বলেন, অতঃপর আমি আবদুল মুত্তালিবের নিকট বিষণ্ণবদনে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার! তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেনো? আমার মোহাম্মদ কোথায়? আমি তাঁকে সবকিছু খুলে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন— হে গালিবের বংশধরেরা! শীঘ্র সমবেত হও। তাঁর ডাক শুনে কুরায়েশেরা একত্রিত হলো। জানতে চাইলো, হে নেতৃপ্রবর! বলুন কী ঘটেছে? তিনি বললেন, মোহাম্মদকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর আবদুল মুত্তালিবসহ সকলেই আপন আপন বাহনে চড়ে রসুল স.কে খুঁজতে বের হয়ে গেলো। পার্শ্ববর্তী সকল পাহাড়-উপত্যকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া গেলো না। শ্রান্ত আবদুল মুত্তালিব হারাম শরীফে ফিরে

এলেন। কাবাগৃহ তওয়াফ করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন। অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো— তোমরা চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্‌ই মোহাম্মদের হেফাজতকারী। তিনিই তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আবদুল মুত্তালিব বললেন, হে গায়েবী ঘোষক! বলো, মোহাম্মদ কোথায়? উত্তর এলো, তেহামার উপত্যকায় এক গাছের নিচে বসে আছেন। আবদুল মুত্তালিব সঙ্গে সঙ্গে তেহামার দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় ওয়ারাকা ইবনে নওফলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনিও তাঁর সঙ্গী হলেন। তাঁরা দু'জনে তেহামার উপত্যকায় পৌঁছে দেখলেন, রসুল স. একটি খেজুর গাছের পাতা সংগ্রহ করছেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, বৎস! তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার জীবন তোমার জন্য কোরবান হোক। আমিই তোমার দাদা আবদুল মুত্তালিব। তিনি তাঁর সওয়ারীর উপর নিজের সামনে তাঁকে বসিয়ে মহানন্দে মক্কা মুকাররমায় ফিরে এলেন। সদ্‌কা করলেন স্বর্ণ ও কয়েকটি উট। হালিমা সাদীয়া বলেন, আমাকেও অনেক উপঢৌকন দিলেন তিনি। আমি ফিরে এলাম স্বগৃহে। রসুল স. এর এই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে কী রহস্য নিহিত আছে, তা আল্লাহ্‌তায়ালাই ভালো জানেন। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা 'ওয়া ওয়াজাদাকা দ্বল্লান ফাহাদা' আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বর্ণিত ঘটনা উল্লেখ করেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হালিমা সাদীয়া মক্কায় হজরত আমেনার কাছে রসুল স.কে আনলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো হজরত আমেনার অনুমতি নিয়ে পুনরায় তিনি রসুল স.কে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবেন। আরো অধিক খায়ের বরকত লাভ করাই ছিলো তাঁর ইচ্ছা। বললেন, এখন তো মক্কায় বালামুসিবত চলছে। কাজেই আমি তাঁকে আরো কিছুদিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই। সাইয়্যেদা আমেনা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিবি হালিমা রসুল স.কে পুনরায় ফিরে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এবার তিনি স. তাঁর কাছে দুই কি তিন বৎসর ছিলেন। ওই সময়েই তাঁর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটেছিলো। হালিমা সাদীয়ার পর রসুল স.কে দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন উম্মে আয়মান। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাসী। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হজরত উম্মে আয়মান রসুলেপাক স.কে লালনপালন করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন হজরত আমেনার ইনতেকালের পর। তিনি বলেন, আমি কখনও রসুলেপাক স.কে ক্ষুধা ও পিপাসার কথা বলতে শুনিনি। সুবহে সাদেকের সময় তিনি এক গ্লাস যমযমের পানি পান করতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছুই চাইতেন না। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, দুপুরে আহার করতে বললে তিনি বলতেন, আহারে আমার আগ্রহ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রসুলেপাক স. এর বয়স যখন চার, পাঁচ, ছয়, সাত অথবা বারো বৎসর কিংবা বিশুদ্ধ অভিমতানুসারে ছয় বা সাত বৎসর, তখন হজরত আমেনা হজরত উম্মে আয়মান এবং রসুল স.কে নিয়ে আপন পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য মদীনায় বনী নাজ্জারের জনপদে গমন করেন। সেখানে এক মাস অতিবাহিত করে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে পরলোকগমন করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আবওয়া মদীনার সন্নিকটবর্তী। এক বর্ণনায় এসেছে, সাইয়্যেদা আমেনার কবর রয়েছে মক্কার হুজুন নামক স্থানের একটি উঁচু টিলায়। কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত তাঁকে প্রথমে আবওয়া নামক স্থানে দাফন করা হয়। পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় মক্কায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর মাতার মদীনাবাসের স্মৃতি রোমন্থন করতেন। তিনি স. তাঁর কবরও জিয়ারত করতেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতেন, এখানেই শায়িত আছেন আমার জন্মদাত্রী। তখন ইহুদীরা আমাকে দেখে বলতো, এ-ই হচ্ছে এই উম্মতের নবী। আর মদীনা তার হিজরতের জায়গা। তাদের কথাগুলো এখনো আমার মনে পড়ে। আবু নাঈম জুহুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন আসমা বিনতে জুবহুম বলেছেন, হজরত আমেনার মৃত্যুকালে আমি তাঁর নিকট ছিলাম। রসুলেপাক স. তখন ছিলেন পাঁচ বৎসরের বালক। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের শিয়রে বসেছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর রসুলেপাক স. এর লালনপালনের দায়িত্ব নিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। তিনি তাঁকে আপন সন্তানের চেয়ে অধিক ভালোবাসতেন। তাঁকে ছাড়া তিনি কখনো আহার করতেন না। সর্বাবস্থায় তাঁকে কাছে কাছে রাখতেন। বসতে দিতেন নিজের আসনে। তাঁর কোনো বিশিষ্ট সহচর আদবের প্রসঙ্গ ওঠালে তিনি তাকে বলতেন, আমার সন্তানকে এভাবেই ছেড়ে দাও। আমার আসনেই সে বসুক। কেননা সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আমি তো মনে করি, সমগ্র আরবে তার তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নয়। হস্তরেখাবিশারদেরা আবদুল মুত্তালিবকে বলতো, আপনার এ সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্ন ও গুরুত্ব প্রদান করুন। আমরা তাঁর চরণযুগলের মতো অন্য কারও চরণ দেখতে পাই না। তাঁর চরণে রয়েছে ওই সকল নিদর্শন, যা আমরা দেখতে পাই মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে। যে বৎসর আবদুল মুত্তালিব কুরায়েশ নেতৃবর্গের সঙ্গে ইয়েমেনে গিয়েছিলেন, সে সময় ইয়েমেনের লোকেরা তাঁকে বলেছিলেন, আপনার বংশের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন আখেরী জামানার পয়গম্বর। সেই সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আবদুল মুত্তালিব দেখলেন, মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষাক্রান্ত। ওই দুর্ভিক্ষ কয়েক বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। সে সময় গায়েবী ইঙ্গিতে তিনি রসুল স.কে তাঁর

কাঁধের উপর বসিয়ে বৃষ্টিপ্রার্থনা করলেন। এরপর এমন প্রবল বৃষ্টিপাত হলো যে, দূর হয়ে গেলো কয়েক বৎসরের খরা ও অজন্মা। মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিবের বয়স হয়েছিলো একশত দশ বৎসর। অন্য এক বর্ণনানুসারে একশত বিশ বৎসর। আবার একশত চল্লিশ বৎসরের বিবরণও আছে। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। যোবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবও তাঁর চাচা ছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ এবং আবু তালিবের মধ্যে মহব্বত ছিলো খুব বেশী। তাছাড়া হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁকে এইমর্মে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সন্তানকে যেনো তিনিই লালন-পালন করেন।

তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো আট, নয়, দশ বা ছয় বৎসর। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, দাদার ইনতেকালের পর রসুলেপাক স.কে বলা হয়েছিলো তিনি তাঁর চাচাগণের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, তার কাছেই থাকতে পারবেন। তিনি আবু তালিবের কাছে থাকতেই পছন্দ করলেন। আর আবু তালিবও তাঁকে গ্রহণ করলেন অতি আনন্দের সঙ্গে। তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তিনিই ছিলেন তাঁর সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী ও আশ্রয়দাতা। তিনিও তাঁর প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র ব্যতীত খাবার গ্রহণ করতেন না। আবু তালিব সব সময় তাঁর ডান পাশে রসুলেপাক স. এর বিছানা বিছিয়ে দিতেন। গৃহে-বাইরে সবখানেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। আবু তালিব রসুলেপাক স. এর প্রশংসায় বহু কবিতাও রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা এরকম—

ওয়া শাক্কক্ব লাহু মিন্ ইস্মিহি লিইয়াজ্আ'লাহা
ফাযুল আ'রশি মাহমূদুন ওয়া হাজা মুহাম্মাদ।

অর্থ ঃ তাঁর জন্যই তাঁর নামের বরকতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং আরশের অধিকারী আল্লাহ্ হচ্ছেন মাহমুদ, আর তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ।

কবি সাহাবী হাস্সান ইবনে সাবেতও উক্তরূপ কবিতা রচনা করেছেন। বলেছেন—

আ-লাম তারা আন্নাল্লহা আরসালা আ'বদাহু
বিআইয়াতিহি ওয়াল্লহু আ'লা ওয়া আমজাদ
ওয়া শাক্কক্ব লাহু মিন ইস্মিহি লিইয়াজ্আ'লাহা
ফাযুল আ'রশি মাহ্মূদুন ওয়া হাজা মুহাম্মদ।

অর্থ ঃ তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন মোজেজা দিয়ে। আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং মহাসম্মানিত। তাঁরই জন্য তাঁর নামের বরকতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং আরশের অধিপতি হচ্ছেন মাহমুদ, আর তিনি মোহাম্মদ। এরকম বলা হয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে। হজরত

আবু তালিব যখন রসুলেপাক স.কে লালন-পালন করছিলেন, তখনও মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, আরুত বলেছেন, আমি দুর্ভিক্ষের সময় মক্কায় এসেছিলাম। তখন লোকেরা এস্তেসকার জন্য আবু তালেবের নিকট সমবেত হলো। বড়দের সঙ্গে ছিলো তাদের শিশুসন্তানেরাও। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিলো সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল। দেখলাম, তাঁর চেহারার উপর মেঘের ছায়া পতিত হলো। আবু তালিব ওই সম্মানিত সন্তানের পৃষ্ঠদেশ কাবাগৃহের দেয়ালের সঙ্গে মিলিত করে দিলেন। সম্মানিত সন্তান তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নির্মেঘ আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে মেঘে। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। আবু তালেব তাঁর প্রশংসায় পাঠ করলেন নিম্নোক্ত কবিতা—

আবৃইয়াদ্বু ইয়াসৃতাসৃক্বাল গামামু বিওয়াজ্বহি
শামাইলুল তিইয়ামি ইস্‌মাতু লিল্ আরামিলি।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, উক্ত কবিতার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ছিলো আশির অধিক। তিনি বলেন, আবু তালিব কবিতাটি ওই সময়ও পাঠ করেছিলেন, যখন কুরায়েশরা হয়ে গিয়েছিলো রসুলেপাক স. এর প্রতিপক্ষ। আবু তালিব এই কবিতায় কাফেরদের নিন্দা করেছেন। প্রতিহত করতে চেয়েছেন তাদের শত্রুভাবাপন্নতাকে। তাঁর কবিতাটি ছিলো প্রকৃতপক্ষে রসুলেপাক স. এর প্রতি আনুগত্যমূলক। ইবনে আলকীন বলেন, আবু তালিবের এই কবিতাটি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই তিনি এ বিষয়ে জানতেন। বুহায়রা ধর্মযাজক জারজিসই তাঁকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, আবু তালিব কবিতাটি রচনা করেছিলেন রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পর। আবু তালিব যে রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের বিষয়ে জানতেন, সে কথা বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাই শীয়া মতাবলম্বীরা বলে থাকে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শায়েখ ইবনে হাজার আরো বলেন, আমি দেখেছি আলী ইবনে হামযা নসরীব তাঁর গ্রন্থে আবু তালিবের কবিতাগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং তিনি সেখানে এই দাবিটিও উপস্থাপন করেছেন যে, আবু তালিব ইসলামের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং ওই অবস্থাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আর আশারিয়াগণ বলেন, তাঁর অন্তিমযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিলো অবিশ্বাসের উপর। তাঁরা আরও বলেন, তাঁর ইসলামের উপর থাকার কোনো প্রমাণ নেই। হাদিসবেত্তাগণ বলেন, আবু তালিব যে রসুল স. এর উপর ইমান আনেননি এবং ইসলামের আহ্বান কবুল করেননি, তার দলিল-প্রমাণ রয়েছে অনেক। তাঁরা বর্ণনা করেন, আবু তালিবের মৃত্যুর সময় রসুলেপাক স. তাঁর শিয়রের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার

দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে দাওয়াত কবুল করা তাঁর হয়ে ওঠেনি। আবার এরকম বর্ণনাও রয়েছে যে, হজরত আব্বাস মাথা নিচু করে তাঁকে পবিত্র কালেমা পাঠ করতে শুনেছেন। একথা তিনি রসুল স.কে পরে জানিয়েছিলেন। রসুল স.ও এ সংবাদ শুনে খুশী হয়েছিলেন খুব। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

বারো বৎসর বয়সে তিনি স. সিরিয়া সফরে যান। প্রথমে পৌছান বসরায়। ওই সফরেই বুহায়রা নামক এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী তাঁর মধ্যে দেখতে পান ওই সকল নিদর্শন, যা সর্বশেষ নবীর আলামতরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে। তাঁর আল্লাহ্ভীতি এবং বিবাগী স্বভাবের বিষয়টি ছিলো সর্বজনবিদিত। বসরার নিকটে এক পল্লীতে একটি গির্জা ছিলো। আখেরী জমানার নবীর সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় দীর্ঘকালব্যাপী তিনি সেখানে অপেক্ষায় ছিলেন। কুরায়েশদের কোনো কাফেলা এলে তিনি গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতেন। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতেন কাফেলার প্রতিটি সদস্যকে। কিন্তু প্রতিবারই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন তাঁর আপন ডেরায়।

অবশেষে সেই শুভদিন সমাগত হলো। এলো কাংখিত কাফেলা। বুহায়রা দেখতে পেলেন, এক খণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তিনি যখন থামছেন, তখন মেঘখণ্ডটিও স্থির হয়ে যাচ্ছে। বুহায়রা কাফেলাকে নিমন্ত্রণ জানালেন। আবু তালিব রসুলেপাক স.কে তাঁর জায়গায় রেখে বুহায়রার দিকে এগিয়ে এলেন। বুহায়রা দেখলেন, অনতিদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রসুলেপাক স. এর উপরেই স্থির হয়ে আছে মেঘখণ্ডটি। বুহায়রা বললেন, হে দলপতি! আপনি কি সকলকে নিয়ে এসেছেন? আবু তালিব বললেন, না। আমার বালক ভ্রাতুস্পুত্রকে রেখে এসেছি তাঁবুর কাছে। বুহায়রা বললেন, তাঁকেও নিয়ে আসুন। আবু তালিব রসুল স.কে ডেকে নিয়ে এলেন। বুহায়রা দেখলেন, মেঘখণ্ডটিও ভেসে আসছে তাঁর উপর ছায়া দিতে দিতে। যখন তাঁরা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন তখন বুহায়রা শুনতে পেলেন, পাহাড়ের প্রতিটি পাথর ও গাছপালা বলছে 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্'। কাছে এলে তিনি রসুল স. এর কাঁধের মাঝখানে মহরে নবুওয়াতও দেখতে পেলেন। তাঁর অন্যান্য আলামতও হুবহু মিলে গেলো তওরাত-ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ বিবরণের সঙ্গে। বুহায়রা তাঁর মহরে নবুওয়াতের উপর চুম্বন করলেন এবং শেষ নবী হিসেবে তাঁর উপর ইমান আনলেন। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যাঁরা তাঁর উপর ইমান এনেছিলেন, বুহায়রা ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবানদের একজন। হাবীব নাজ্জার, আসহাবে কারিয়া ইত্যাদির ঘটনা প্রসঙ্গে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবু মিন্দা ও আবু নাঈম বুহায়রাকে রসুল স. এর সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করেন। ওই সফরের সময়েই রোমদেশ থেকে সাত ব্যক্তি রসুলেপাক স.কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো। বুহায়রা ওই সময়েই সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে রসুল স. এর

নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ইনিই তিনি, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও অন্যান্য আকাশী পুস্তিকায় যাঁর পরিচয় ও গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আরো বলেছিলেন, আল্লাহ্র অভিপ্রায় পরিবর্তন করার সাধ্য কারোই নেই। আবু তালিবকে তিনি তখন এইমর্মে সাবধানও করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেনো ইহুদী ও নাসারাদের অশুভ দৃষ্টি থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখেন। কেননা ইনিই আখেরী জামানার নবী এবং তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে অন্য সকল দ্বীন রহিত করে দেওয়া হবে। তিনি আবু তালিবকে রসুল স. সহ সিরিয়া যেতে নিষেধও করে দিলেন। তাই আবু তালিব তাঁর ব্যবসার মালপত্র সেখানেই বিক্রি করে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। এক বর্ণনায় এসেছে, আবু তালিব কিছু লোকের মাধ্যমে সেখান থেকেই রসুল স.কে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি একা। ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। তিরমিজী বলেছেন, বিবরণটি হাসান এবং সহীহ্। কোনো কোনো বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, আবু তালিব হজরত আবু বকর ও হজরত বেলালের সঙ্গে রসুল স.কে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। বিবরণটি সঠিক নয়। কেননা ওই সফরে হজরত আবু বকর রসুল স. এর সঙ্গে ছিলেন না। আর হজরত বেলালকে তো সে সময় তিনি খরিদই করেননি। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলেপাক স. এর চেয়ে দু'বছরের ছোটো ছিলেন। আর তখন রসুল স. এর বয়স ছিলো বারো বৎসর। শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর 'ইসাবা' পুস্তকে লিখেছেন, হাদিসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তখন রসুল স. এর সঙ্গে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন, কথাটি মেনে নিতে হয়। 'মাওয়াহেব' রচয়িতাও এরকম লিখেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে শিথিল সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হিনদা। বলেছেন, রসুল স. এর বয়স তখন ছিলো বিশ বৎসর। আর হজরত আবু বকরের আঠারো। তিনি এমনও বলেছেন যে, তখন কাফেলা যেখানে থেমেছিলো, সেখানে ছিলো একটি বরই গাছ। রসুল স.কে ওই গাছের ছায়ায় বসিয়ে হজরত আবু বকর বুহায়রার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সৌজন্যমূলক বাক্যালাপের পর সন্ন্যাসী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যিনি গাছের ছায়ায় বসে আছেন, তিনি কে? হজরত আবু বকর বলেছিলেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি তো নবী। আমার কাছে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, এ গাছের নিচে ঈসার পরে মোহাম্মদ ব্যতীত আর কেউ বসবে না। একথা শোনার পর থেকেই হজরত আবু বকরের অন্তরে রসুল স. এর প্রতি প্রবলতর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। তাই পরবর্তী সময়ে রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। শায়েখ ইবনে হাজার বলেন, এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে ওই সফর ছিলো অন্য একটি সফর, যে সফরে আবু তালেব ছিলেন অনুপস্থিত।

রসুলেপাক স. অদৃশ্যজগতের অধিবাসীদেরকে, অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেতেন। ফলে তাঁর স্বভাবে-আচরণে কখনো কখনো দেখা দিতো অস্বাভাবিকতা। আবু তালেব তাঁর এহেন অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপদের আশংকা করে তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন চিকিৎসক ও গণকদের কাছে। তারা তাঁকে জানিয়ে দিলো, তাঁর উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব নেই। আর তিনি শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থও নন। এক সময় তিনি স. হজরত খাদীজার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বৎসর, তখন তিনি হজরত খাদীজার বাণিজ্যকর্মচারীরূপে সিরিয়া গমন করলেন। অবশ্য তাঁকে এমতো পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আবু তালিব। বলেছিলেন, এখন আমার কাছে ব্যবসা করার মতো কিছু নেই। সুতরাং তুমি খাদীজার শরণাপন্ন হও। সে তো অনেককেই তার ব্যবসার কাজে লাগায়। আশা করা যায় তার ব্যবসায় তুমি লাভবান হতে পারবে। কিন্তু সার্বিক কথা হচ্ছে, হজরত খাদীজা নিজেই একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন। আর তিনি মোহাম্মদ স. এর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কাউকে পাচ্ছিলেন না। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই আরবের লোকেরা তাঁকে মোহাম্মদ আমীন বলে ডাকতো। তাই হজরত খাদীজা রসুলেপাক স.কে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আপনি ব্যবসা করতে চাইলে, যে কোনো শর্তে আমি রাজি। লভ্যাংশ মতো চান, ততোই দেওয়া হবে। প্রস্তাব পেয়ে রসুল স. আবু তালিবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তা গ্রহণ করলেন।

যথাসময়ে বাণিজ্যযাত্রা শুরু হলো। সাইয়্যেদা খাদীজা রা. তাঁর ক্রীতদাস মায়সারা এবং কর্মচারী খুযায়মাকে রসুল স. এর সফরসঙ্গী করে দিলেন। রসুল স. বসরায় পৌঁছলেন। সেখানে একটি গির্জা ছিলো। সে গির্জার এক পাদ্রীর নাম ছিলো নাসতুরা। তিনি দেখতে পেলেন, রসুল স. একটি গাছের নিচে বসে আছেন। তিনি জানতেন, নবী ছাড়া অন্য কেউ গাছটির নিচে বসতে পারবে না। গাছটি ছিলো শাখা-প্রশাখা-পত্রবিবর্জিত, বিশুষ্ক। কাণ্ডটিও ছিলো বহু পুরাতন। কিন্তু রসুল স. গাছটির নিচে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাছটি হয়ে গেলো সজীব ও ফলবান। আশপাশের প্রকৃতিতেও এলো সবুজের সমারোহ। নাসতুরা রসুলেপাক স. এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে লাত্ মানাতের কসম দিচ্ছি! আপনার নাম বলুন? রসুলেপাক স. বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তুমি এখান থেকে দূর হয়ে যাও। কেননা এ পর্যন্ত এরকম কঠিন কথা কোনো আরববাসী আমাকে বলেনি। নাসতুরার হাতে ছিলো একটি কিতাব। তিনি সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, আর বলে যাচ্ছিলেন, শপথ ওই আল্লাহ্‌র, যিনি নবী ঈসার উপর ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছেন। আপনিই তো সেই ব্যক্তি (আপনিই তো শেষ নবী)। রসুল স. তাঁর পণ্যসামগ্রী বসরার বাজারেই বিক্রি করলেন। তাঁর লাভ হলো অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ। সাথী-সঙ্গীরাও তাঁর সংসর্গের বরকতে লাভ করলেন প্রচুর।

তাঁরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন দ্বিপ্রহরের সময়। সাইয়্যেদা খাদীজা তখন ছিলেন তাঁর সহচরীপরিবেষ্টিতা হয়ে। দূর থেকে দেখতে পেলেন, দু'টি মোরগ রসুল স. এর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে আছে। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত খাদীজা রা. দেখলেন, রসুলেপাক স. এর মাথার উপর দু'জন ফেরেশতা ছায়া দিয়ে চলেছে। প্রকাশ থাকে যে, ওই ফেরেশতাদ্বয় ছিলো মোরগের আকৃতিবিশিষ্ট। তাছাড়া সাইয়্যেদা খাদীজার গোলাম মায়সারা এবং তাঁর বিশেষ কর্মচারী খুযায়মার কাছ থেকে তিনি যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছিলেন, ওই ঘটনাগুলোও তাঁকে রসুল স. এর প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী করে তুলেছিলো। তাই তিনিই প্রথমে তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ না করে পারেননি। তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী, সম্ভ্রান্ত বংশদ্ভূতা এবং ধনাঢ্যা। কুরায়েশদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর অনুরক্ত। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে বিফলমনোরথ হন।

সাইয়্যেদা খাদীজা গোপনে একজন মহিলাকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। তিনি জানতে চান, রসুল স. বিয়ে করার প্রতি আগ্রহান্বিত কি না। তাঁকে নিরুত্তর দেখে বলেন, বলুন আপনার কী অসুবিধা? তিনি স. বললেন, তেমন আর্থিক সঙ্গতি তো আমার নেই। মহিলা বললেন, কোনো রূপবতী, বিত্তবতী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হয়ে বিবাহের যাবতীয় খরচাদির ব্যবস্থা করেন, তাহলে কি আপনি তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হবেন? রসুল স. বললেন, কে সে? মহিলা বললো, খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ। তিনি স. বললেন, আমি রাজী। মহিলা হজরত খাদীজার কাছে গিয়ে বললো, মুবারকবাদ! আপনার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সাইয়্যেদা খাদীজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। শুভবিবাহ সম্পন্ন করার ভার দিলেন তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদের উপর। রসুল স. তাঁর চাচা আবু তালিব, হামযা, হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে নির্ধারিত সময়ে খাদীজার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' থেকে আরো জানা যায়, হজরত খাদীজার পিতা তাঁর বিবাহের সময় জীবিত ছিলেন। তবে 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে— সঠিক কথা হচ্ছে, সে সময় তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন না। জীবিত ছিলেন তাঁর চাচা আমর ইবনে আসাদ। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা।

বিবাহের খুতবা

রসুলেপাক স. এবং হজরত খাদীজার বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন আবু তালিব। বললেন— সমুদয় প্রশংসা ওই মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ইব্রাহীমের সন্তান ইসমাঈলের বংশভূত করেছেন। সৃজন করেছেন আমাদেরকে

মাআদ ও মুদার এর মূল থেকে। আমাদেরকে করেছেন তাঁর গৃহের সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক। সে গৃহকে করেছেন জনসমাগমমুখর। তাই বিভিন্ন দিক ও দেশ থেকে মানুষ এ গৃহের জিয়ারত করতে ছুটে আসে। ওই পুণ্যপথিকদের নিরাপত্তা দানের দায়িত্বও তিনি অর্পণ করেছেন আমাদের উপর। আমাদেরকে বানিয়েছেন জনশাসক। অতঃপর আমার বক্তব্য এই যে, নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ এমন এক যুবক, যার সমকক্ষ কেউ নেই। সে-ই সকলের অগ্রণী। সম্পদপ্রাচুর্য তার নেই বটে, কিন্তু সে মহান, নিঃসন্দেহে সে খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের পতির আসনে আসীন হবার যোগ্য। আমি আমার সম্পদ থেকে তার বিবাহের মহর বাবদ বিশটি উট নির্ধারণ করলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, এ বিবাহের পর তাঁর মর্যাদার ক্ষেত্রে যুক্ত হবে এক নতুন অনুষঙ্গ।

'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে আছে, আবু তালিব যখন তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন, তখন হজরত খাদীজার চাচাতো ভাইও একটি ভাষণ দিলেন, যার সারমর্ম এরকম— ওই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি আমাদেরকে ওই রূপ বানিয়েছেন, যেরূপ বিবরণ দিলেন শ্রদ্ধার্হ আবু তালিব। সুতরাং আমরা সমগ্র আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের অগ্রবর্তী। এদিক থেকে উপস্থিত কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন। একথাও অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য যে, আমাদের এমতো শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকারকারী কেউ নেই। নিঃসন্দেহে আমরা উভয় পক্ষই চাই যে, আমাদের উভয়ের আত্মীয়তার যোগসূত্র অধিকতর সুদৃঢ় হোক। হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমি খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদকে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র সঙ্গে চারশত মিছকাল মহরের বিনিময়ে পরিণয়াবদ্ধ করলাম। আবু তালিব বললেন, হে ওয়ায়াকা ! আমি চাই এই শুভঅনুষ্ঠানে খাদীজার চাচা আমর ইবনে আসাদও বক্তব্য প্রদান করুন। আমর ইবনে আসাদ বললেন, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদকে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র সঙ্গে বিবাহ দিলাম। উভয়পক্ষ থেকে ইজাব ও কবুল বিনিময় হলো। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে কোনো কোনো বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত খাদীজার বিবাহের মহর ছিলো সাড়ে বারো আওকিয়া। এক আওকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম। এক বর্ণনানুসারে ওই বিবাহের মহর ছিলো পাঁচশত দিরহাম। বর্ণনাদ্বয়ের সামঞ্জস্যসাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, ওই সময় বিশটি উটের মূল্য ছিলো পাঁচশত দিরহাম, অথবা চারশত মেছকাল। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'রওজাতুল আহবাবে' আরো বর্ণিত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদা খাদীজা তাঁর বাঁদীদেরকে দফ বাজিয়ে নৃত্য করে আনন্দ প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রসুল স.কে বলেছিলেন, আপনি আপনার চাচার কাছে জিজ্ঞেস করুন, বিশটি উট

থেকে একটি যবেহ করে আমি লোকদেরকে খাওয়াতে পারবো কি না। ওই রাতেই হজরত খাদীজা এবং রসুলেপাক স. বাসর যাপন করেছিলেন। নবী করীম স. খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। বিবাহের পর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর মর্যাদা উত্তরোত্তর প্রকাশ করে দিতে থাকেন। আবু তালিবও খুব খুশী হন। বলেন 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আযহাবা আন্নাল কারবা ওয়া রাকাআ আন্নাল হুমুম' (সকল প্রশংসা ওই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের বিপদাপদ দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে করেছেন দুশ্চিন্তামুক্ত)। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ 'ওয়া ওয়াজাদাকা আ'ইলান ফাআগনা' আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স.কে হজরত খাদীজার সম্পদ দ্বারা সম্পদবান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে— রসুলেপাক স. সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদবান— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় জগতে। বরং তাঁর মর্যাদার তুলনায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই নগণ্য।

কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ

রসুলে আকরম স. এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়েশরা কাবাগৃহের সংস্কার করতে চাইলো। বৃষ্টির পানি জমে জমে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। তা পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন পড়লো। রোম থেকে এলো একজন নির্মাণবিশেষজ্ঞ। নাম ইয়াকুম। কুরায়েশরা পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব দিলো তাকেই। কুরায়েশদের সকলেই পাথর তুলে তুলে আনতে লাগলো। রসুলে আকরম স.ও তাদের সঙ্গে পাথর আনতে লাগলেন। কুরায়েশরা নিজেদের পরনের লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর রেখে তার উপর পাথর বহন করে আনতে লাগলো। জাহেলী যুগে এভাবে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। বিষয়টিকে তারা দুষণীয় মনে করতো না। ইসলামের যুগে এ অপপ্রথাটির মুলোচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু রসুলেপাক স. কখনও এরূপ করেননি। তাঁর চাচা হজরত আব্বাস তাঁকে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে লুঙ্গি খুলে ফেলতে বললেন। কিন্তু রসুল স. লুঙ্গি খোলার উদ্যোগ নিতেই বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন সংজ্ঞা ফিরলো, তখন তিনি লুঙ্গি লুঙ্গি বলে চিৎকার শুরু করলেন। এমন সময় অদৃশ্য আওয়াজ এলো—'খম্‌মির আওরাতাকা' (ছতর ঢাকাকে অপরিহার্য করে নাও)। আলেমগণ বলেন, রসূলেপাক স. এর কাছে ওই আওয়াজই ছিলো প্রথম গায়েবী আওয়াজ।

হাজারে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপন করার সময় কুরায়েশদের মধ্যে দেখা দিলো প্রচণ্ড মতানৈক্য। এমতো সম্মান লাভের দাবীদার হলো প্রত্যেক গোত্রই। এনিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তবে এক পর্যায়ে সকলে এমতো সিদ্ধান্তে একমত হলো যে, আগামীকাল ভোরবেলা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে, তাকেই সালিশ নিযুক্ত করা হবে। পরদিন সর্বপ্রথম

মসজিদে প্রবেশ করলেন রসুলে আকরম স.। তাঁকে দেখে পরিতুষ্ট হলো সকলেই। বললো, এবার সঠিক লোকের আগমন ঘটেছে। সকলেই তাঁর সালিশীর উপর রাজী হয়ে গেলো। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র উত্তরীয় মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। হাজারে আসওয়াদ নামক প্রস্তরটিকে রাখলেন মাঝখানে। বললেন, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে আসুন এবং চাদরের কিনারা ধরে নিয়ে যান। এভাবে সকলেই যখন চাদর ধরে হাজারে আসওয়াদ যথাস্থানে নিয়ে গেলো, তখন রসুলেপাক স. স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ ধরে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ছয়টি স্তম্ভের উপর। হাদিস শরীফে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, কাবাগৃহের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন হজরত আদম। কিন্তু সে স্থাপনা হজরত নূহের সময়ের মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর তা নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহীম আ.। অতঃপর আমালেকা বাদশাহ। তারপর জুরহুম কবীলা। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের। শেষে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী। হাজ্জাজ ছিলেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমীর উমরাদের একজন। তিনি আবদুল মালিকের নির্দেশে কাবাগৃহের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করেন। শেষোক্ত কাঠামোটিই এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। কথিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ মারওয়ানী স্থাপনাটি উঠিয়ে দিয়ে রসুলুল্লাহ্ স. এর হাদিস মোতাবেক আকার দিতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেছিলেন, আমীরুল মুমিনীন। কাবাগৃহকে তার বর্তমান অবস্থাতেই ছেড়ে দিন। না হলে পরবর্তী সময়ে রাজা-বাদশাহ্রা একে নিয়ে ভাঙা-গড়া করতেই থাকবে। এটা হবে তাদের খেল-তামাশার বিষয়। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'তারিখে মক্কা' নামক ইতিহাসপুস্তকে। 'তারিখে আযরাকী' কিতাবে মুকাতিল থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আদম আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি আমাকে জানি। আমি তোমার ওই নূরও দেখেছি, যার ইবাদত করা হয়। তাঁর এমতো প্রার্থনার পর আল্লাহ্তায়ালা বায়তুল মামুরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। বায়তুল মামুরের ওই অবতরণস্থলই বর্তমানের কাবাগৃহ। বায়তুল মামুর ছিলো লাল রঙের ইয়াকুত পাথরের। তার উচ্চতা তখন ছিলো প্রায় আকাশ ছোঁয়া। আদমকে হুকুম করা হলো, তাওয়াফ করো। হজরত আদম তাওয়াফ করলেন। ওই তাওয়াফের বরকতে আল্লাহ্তায়ালা দূর করে দিলেন তাঁর সকল দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনা। ওই বায়তুল মামুরকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয় হজরত নূহের মহাপ্লাবনের সময়।

হজরত আদমের বংশধর কর্তৃক কাবাগৃহের নির্মাণের ব্যাপারে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কাবাগৃহ পাঁচবার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সর্বপ্রথম এ গৃহ নির্মাণ করেন হজরত শীশ।

হাদিসটি ইবনে বার তাঁর 'তামহীদ' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। দুই. দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহীম খলীল। ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে কোরআন ও হাদিসে। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণিত হয়েছে, সর্বপ্রথম কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ করেন হজরত ইব্রাহীম খলীল। ফাকেহীও তাঁর নিজস্ব সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীরও এরকম বলেছেন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে। এসব বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়, হজরত ইব্রাহীমের নির্মাণের পূর্বে এস্থানে কোনো গৃহ ছিলো না। তিনিই প্রথম কাবাগৃহনির্মাতা। হজরত ইসমাঈল ছিলেন তাঁর সহযোগী। তিনি কাঁধে করে পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহীম খলীল কাবাগৃহ নির্মাণ করেছেন পাঁচটি পর্বতের পাথর দিয়ে। সে পাঁচটি পর্বত হচ্ছে— ১. কোহে হেরা ২. কোহে শাব্বীর ৩. কোহে লুবনান ৪. কোহে তূর এবং ৫. কোহে জুদী। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে এরকম— ১. হেরা ২. কুবায়স ৩. কুদুস ৪. দরকান ও ৫. রদবী। ফেরেশতাগণ ওই পাহাড়গুলো থেকে পাথর নিয়ে আসতো। আর সেই পাথরসমূহ উঠিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করতেন হজরত ইসমাঈল। তিন. তারপর নির্মাণ করে আমালেকা বাদশাহ। চার. অতঃপর জুরহুম সম্প্রদায়। আমালেকা ও জুরহুম সম্প্রদায়ের অগ্রপশ্চাত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেননা আমালেকার শাসন ছিলো জুরহুম গোত্রের শাসনের পূর্বে। সুতরাং একথাই বলা সঠিক হবে যে, আমালেকার নির্মাণ পূর্বে হয়েছিলো। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহীম খলীলের নির্মাণের পর কুসাই ইবনে কেলাবও নির্মাণের কাজ কিছুটা করেছিলেন। পাঁচ. কুরায়েশরা নির্মাণ করেছে সকলের শেষে। কুরায়েশদের নির্মাণের বিষয়টি সহীহ্ হাদিস দ্বারা সুসাব্যস্ত। আর ওই নির্মাণকর্ম সম্পন্ন হয়েছিলো রসুল পাক স. এর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে। এক বর্ণনায় এসেছে, পঁচিশতম বৎসরে। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। সুলায়মান ইবনে খলীল মক্কী বলেছেন, রসুল স. এর বয়স তখন ছিলো তিরিশ। এ মতটি স্বল্পপ্রচারিত। তবে প্রকাশ্য কথা এটাই যে, কাবানির্মাণবিষয়ক বিবরণাদির মধ্যে পাঁচ শব্দটি সুস্পষ্ট। ৬৪ হিজরীতে হজরত ইবনে যোবায়ের কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে শ্রুত হাদিস অনুসারে হজরত ইব্রাহীম খলীলের ভিত্তির উপর কাবাগৃহের নির্মাণকর্ম সমাধা করেন তিনি। তারপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী তখনকার শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে ইবনে যোবায়েরের নির্মাণ কাঠামোটি পরিবর্তন করে ফেলেন। রসুল স. এর জীবনালেখ্যরচয়িতাগণ বলেন, আবদুল মালিক অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর এমতো অনাবশ্যক কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি শুনেছিলেন পরে, হারেছ ইবনে আবী কারিয়া মাখযুরীর মাধ্যমে। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

তৃতীয় অধ্যায়

ওহী, হিজরত

এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ওহীর প্রারম্ভ, নবুওয়াতের প্রমাণ, ইসলাম প্রচার, কাফেরদের শত্রুতা, সাহাবীগণের হাবশায় হিজরত, আবু তালিবের মৃত্যু, সাইয়্যেদা খাদীজার ইন্তেকাল, রসুলেপাক স. এর তায়েফ গমন এবং জ্বিনদের বায়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে।

রসুলে আকরম স. এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হলো, তখন তিনি ওহী লাভ করলেন। ওই ওহীর আলোকে সারা জাহান আলোকিত হয়ে উঠলো। ওহীর নূরের বহিঃপ্রকাশ হয় সোমবার, আটই রবিউল আউয়ালে। অথবা রবিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখে, আমূল ফীলের ৪১ বছরে। 'শাহ্রু রমাদ্বানাল্ লাজী উন্যিলা ফীহিল কুরআন' অথবা 'ইন্না আন্যাল্নাহু ফী লাইলাতিল ক্বদর' আয়াতদ্বয়ের মর্মানুসারে বিদ্বজ্জনের একদল মনে করেন, প্রত্যাদেশ শুরু হয়েছিলো রমজান মাসে। নবী করীম স. এর উপর নবুওয়াতের ফযীলতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে কোরআনের অবতরণ। আর যেহেতু রমজানে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, প্রত্যাদেশের প্রারম্ভকাল ছিলো রমজান মাস। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে সমগ্র কোরআন মজীদ রমজান মাসের কদরের রাত্রিতে লওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হতে থাকে পৃথিবীতে। কোরআন মজীদের বর্তমান গ্রন্থরূপ সুবিন্যস্ত করা হয়েছে লওহে মাহফুজের ধারাক্রম অনুসারেই। দৃষ্টান্তটি এরকম— যেমন কোনো একটি ফেকাহ গ্রন্থে বিশেষ ধারায় বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। আর লোকেরা সেখান থেকে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে মাসআলা সংগ্রহ করে নিচ্ছে। কারও কারও মতে প্রত্যাদেশ আরম্ভ হয়েছিলো রজব মাসে। তবে এ মতটি সুবিদিত নয়।

নবুওয়াত প্রকাশের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন রসুলেপাক স. এর নিকট নির্জনতা হয়ে পড়লো অধিকতর প্রিয়। তিনি তখন প্রায়শঃ জাবালে নূর বা হেরা পর্বতে গিয়ে নির্জনতায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে শুরু করলেন। সেখান থেকে তিনি এক দৃষ্টিতে কাবার সৌন্দর্য অবলোকন করে দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করতেন এবং এক ধ্যানে এক মনে আরাধনা করতেন আল্লাহ্র। ছিন্ন হয়ে যেতো সংসার, কোলাহল এবং পার্থিবতা। তবে তাঁর ওই ইবাদতে ফিকির প্রধান ছিলো, না প্রধান ছিলো

জিকির, তা নিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। তবে পছন্দনীয় মত হচ্ছে, তখন তিনি স. কালবী (হৃদয়জ) এবং জবানী (রসনাজ) উভয় প্রকার জিকিরে (স্মরণে) লিপ্ত থাকতেন। হজরত ইব্রাহীমের শরিয়তের যতটুকু তাঁর জানা ছিলো, অথবা পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তে যে সকল বিষয় অনুমোদিত ছিলো, কিংবা নিজের দিব্যজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত যে সব কাজ তাঁর কাছে সুন্দর বলে মনে হতো, সে সব বিষয়ের উপরেই তিনি আমল করতেন। যৎসামান্য খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি। সে খাদ্য শেষ হয়ে গেলে, অথবা পারিবারিক কোনো প্রয়োজন অনুভব করলে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুলে আকরম স. প্রতি বৎসর এক বার করে মক্কার লোকালয় ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন এবং এক মাস পর্যন্ত হেরা পর্বতের গহ্বরে অবস্থান করতেন। ওহী আগমনের সময় যখন নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি ইবাদত ও নির্জনবাসের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এমনি এক সময় তাঁর উপর সত্য প্রকাশিত হলো। শুরু হলো প্রত্যাদেশ। অবতীর্ণ হতে লাগলো কোরআন। কেউ যেনো এমন ধারণা না করে যে, কঠোর তপস্যা ও সাধনার বিনিময়ে তিনি নবুওয়াত পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ওহী কঠোর সাধনাজাত। না। কখ্খনো নয়। নবুওয়াত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার নিছক অনুগ্রহ। কোনো আমলই এমতো অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, বেলায়েতের সাধনা-আরাধনার সঙ্গে আমলের কিছুটা সম্পর্ক আছে। বেলায়েতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সমর্থনযোগ্য। কেননা বেলায়েতের দ্বারা কোনো কোনো জগতের কাশফ, কোনো কোনো রুহানিয়াতের দর্শন এবং কোনো কোনো আধ্যাত্মিক বিষয়ের আত্মিক অবগতি হাসিল হয়। কিন্তু নবুওয়াত হচ্ছে পরিপূর্ণ ও বিশেষ নৈকট্য। আর এর সম্পর্ক আসমানী-ওহীর সঙ্গে। আর সে ওহী বহনকারী হচ্ছেন রুহুলকুদ্দুস ফেরেশতা। তাঁকে রুহুল আমীন এবং জিবরাইলও বলা হয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এমতো উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করেন কেবল তাঁর মনোনীত ও বাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের জন্য।

রসুল আকরম স. সকাশে উপস্থিত হয়ে ওহীবাহক ফেরেশতা বললেন, আমি জিবরাইল। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে এই শুভসংবাদটি জানাতে বলেছেন যে, আপনি আল্লাহ্র রসুল। সুতরাং আপনি জ্বিন ও মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার দাওয়াত দিন। তিনি আরও বললেন, হে মোহাম্মদ! পাঠ করুন। তিনি স. বললেন, আমি তো পাঠক নই। অথবা বললেন, আমি পাঠাভ্যাসবর্জিত। একথার অর্থ— আমি উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। আমাকে কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী করা হয়নি। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, জিবরাইল তখন আমাকে তাঁর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে চাপ দিলেন। এই হাদিসের অর্থ হতে পারে দু'রকম— এক. জিবরাইল তাঁর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর পুরা (আধ্যাত্মিক) শক্তি আমার মধ্যে

প্রবেশ করালেন। দুই. চাপ সহ্য করার যতটুকু ক্ষমতা আমার ছিলো, তিনি আমাকে বুকে নিয়ে ততটুকু চাপ দিলেন। প্রথমোক্ত অর্থটিই সঠিক বলে হাদিসবেত্তাগণ মন্তব্য করেছেন। পরের বর্ণনা— বুক থেকে আলগা করে দিয়ে জিবরাইল দ্বিতীয়বার বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি (অন্যদের মতো) পাঠক নই। তিনি পুনরায় আমাকে বুকে নিয়ে চাপ দিলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন, এবার পড়ুন। আমি বললাম, না. আমি (অসাধারণ, তাই সাধারণভাবে) পাঠ করতে জানি না। তৃতীয়বার জিবরাইল আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আবারও চাপ দিলেন এবং বললেন— ইক্বরা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাজী খলাক্ব ..... আ'ল্লামাল ইন্‌সানা মা লাম ইয়া'লাম (প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রভু সবচেয়ে বড় করীম, যিনি কলম দ্বারা লেখা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না)।

এক বর্ণনায় আছে, জিবরাইল রসুলেপাক স.কে নিবেদন করলেন, হে শ্রদ্ধাস্পদ! আপনি শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। রসুলেপাক স. বললেন, 'আস্‌তাঈ'জু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম' (বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি)। জিবরাইল বললেন, বলুন 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানীর রহীম'। তারপর তিনি বললেন 'ইক্বরা বিস্‌মি রব্‌বিকাল্লাজী খলাক্'। হজরত জিবরাইল রসুলেপাক স.কে বুকে জড়িয়ে চাপ দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে মালাকুতি নূর প্রবেশ করিয়ে তাঁর জাগতিক দেহের শক্তি বৃদ্ধি করতে, যাতে করে তিনি বহন করতে পারেন প্রত্যাদেশের গুরুভার। হতে পারেন তাঁর দায়িত্বের প্রতি পরিপূর্ণরূপে একাগ্র। আরেকটি কারণ ছিলো এরকম— আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'ইন্‌না সানুল্‌ক্বী আ'লাইকা ক্বওলান ছাক্বীলা' (অচিরেই আমি আপনার উপর ভারী বাণী প্রক্ষেপ করবো)। সেই অপার্থিব বাণীর ভার গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলার জন্য তাঁকে ওভাবে চাপ দেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া তার আরও একটি কারণ এরকমও হতে পারে যে, ওহীর বিষয়টি ধারণাপ্রসূত কোনো বিষয় নয়। বলাবাহুল্য, ধারণাপ্রসূত বিষয়ের কোনো প্রতিক্রিয়া শরীরের উপরে পতিত হয় না। 'ইক্বরা' (পাঠ করো) শব্দটি বারংবার বলার কারণ ছিলো বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তোলা। আর তাঁর 'মা আনা বিক্বরী' (আমি পাঠক নই) কথাটি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। যেমন— একজন উম্মী লোককে সরাসরি কোনো লিখিত বাণী পড়তে বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অথচ রসুলে আকরম স. ফাসাহাত ও বালাগাত বিষয়ে ছিলেন পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী। আবার কোনো পুস্তক বা লিখিত কোনো কিছু পাঠ করতে পারা উম্মী হওয়ার পরিপন্থী। সে জন্য তিনি স. 'আনা উম্মী' না বলে বলেছিলেন

'মা আনা বিক্বারী'। এক বর্ণনায় আছে, জিবরাইল যখন বললেন 'ইক্বরা ইয়া মুহাম্মদ' তখন রসুলে আকরম স. বলেছিলেন, আমি কী পাঠ করবো? আমি তো কখনো কিছু পাঠ করিনি। জিবরাইল বেহেশতী রেশমের উপর লিখিত কিছু বের করলেন, যা ছিলো মোতি ও ইয়াকুত দ্বারা কারুকার্যখচিত। বললেন, পাঠ করুন। তিনি স. বললেন, আমি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। পড়বো কীভাবে? জিবরাইল তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। এরপর তিনি মাটিতে পদাঘাত করলেন। মাটি ফুঁড়ে ঝর্ণা বের হলো। ঝর্ণার পানি দিয়ে তিনি ওজু করলেন। কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল এবং দু' হাত পা ধৌত করলেন এবং মাথা মসেহ্ করলেন। এভাবে তিনি রসুল স.কে ওজু শেখালেন। রসুলে পাক স. ওযু করলেন। অতঃপর জিবরাইল এক আঁজলা পানি নিয়ে রসুলে আকরম স. এর পবিত্র চেহারার উপব ছিটিয়ে দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন। রসুলে আকরম স. হলেন অনুগামী। নামাজ শেষে বললেন, এভাবে ওজু করবেন এবং নামাজ পড়বেন। তারপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন। রসুলে আকরম স. ফিরে এলেন মক্কায়। পথ চলতে চলতে শুনতে পেলেন বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরখণ্ডগুলো বলছে 'আস্সালামু আ'লাইকা ইয়া রসুলাল্লহ্'। রসুলেপাক স. যখন গৃহে ফিরে এলেন, তখনও তাঁর হৃৎপিণ্ড এবং কর্ণপট কাঁপছিলো। ভীতিকর ও ভয়াবহ অবস্থায় এরকমই হয়। যেমন হয় গরু যবেহ্ করার সময়। রসুলেপাক স. উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা খাদীজার কাছে এসে বললেন 'যাম্মিলুনী' 'যাম্মিলুনী' (আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও)। তিনি তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। মুখে ছিটিয়ে দিলেন ঠাণ্ডা পানি। কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর তিনি স. সাইয়্যেদা খাদীজাকে সবকিছু খুলে বললেন। আরও বললেন, আমার ভয় হচ্ছে। আমি কি বিপদগ্রস্ত? হজরত খাদীজা বললেন, নিশ্চিন্ত থাকুন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে কোনো বিপদে ফেলবেন না। লাঞ্ছিত হতে দিবেন না। নিশ্চয়ই তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। কেননা আপনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অনাথদের প্রতিপালন করেন। অতিথিদের সমাদর করেন। আরাধনা করেন কেবল আল্লাহ্র। নিরন্নদের অন্ন যোগান এবং সাহায্য করেন শ্রমজীবিদেরকে। সদাচরণ, কল্যাণকামিতা আপনার স্বভাব। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন ভালো কাজ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে করে দেন সাবধান। আপনি পিতৃহীনদের আশ্রয়দাতা। আপনি সত্যবাদী। আমানতদার। অপর এক বর্ণনায় আছে, আপনি সহাস্যবদনধারী, সুন্দর চরিত্রাধিকারী, মধুর বচনবিশিষ্ট, সৎকর্ম সম্পাদক, সাহসী, দৃঢ়চেতা ও উচ্চ হিম্মতের অধিকারী। হজরত খাদীজার একথার অর্থ— যিনি কথিত গুণসমূহের অধিকারী, তিনি কখনোই অমঙ্গলাক্রান্ত হতে পারেন না। হজরত খাদীজা এসব কথা বলে রসুল স.কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলো এটাই প্রমাণ করে

যে, তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী এবং বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. যখন তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন হজরত খাদীজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কেননা রসুল স. এর উপরে তাঁর বিশ্বাস ছিলো অতি উচ্চ। এরপর তিনি তাঁর ধারণাকে অধিকতর দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রসুলেপাক স.কে নিয়ে গেলেন তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে। ওয়ারাকা ইবনে নওফল তখন বৃদ্ধ। কুরায়েশ পৌত্তলিকদের রেওয়াজ-রীতি থেকে তিনি ছিলেন সম্পর্কহীন। হজরত ঈসার ধর্মমত অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন তিনি। ছিলেন ইঞ্জিল শরীফের একজন বিশেষজ্ঞ। আরবী ভাষায় তিনি ইঞ্জিল তরজমা করতেন। তিনি ইবরানী ভাষাও জানতেন। হজরত খাদীজা তাঁকে বললেন, ভ্রাতঃ! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন। হজরত খদীজা রসুলেপাক স.কে ওয়ারাকার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছেন তৎকালীন আরবের সাধারণ রীতি অনুসারে। আরবগণ সাধারণত একে অপরকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র বলে সম্বোধন করে থাকে।

জীবনী বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ওয়ারাকা হজরত আবদুল্লাহ্‌র সমবয়সী ছিলেন। ওয়ারাকা রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে বলুন? রসুলেপাক স. যাবতীয় ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকা বললেন, তিনি হচ্ছেন নামুস। নবী ঈসার নিকটেও তিনি আগমন করেছিলেন। হে মোহাম্মদ! আপনাকে অভিনন্দন। আনন্দিত হন। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর রসুল বানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ওই নবী, যাঁর সম্পর্কে নবী ঈসা সুসংবাদ দিয়েছেন। বলেছেন, আমার পর একজন রসুল প্রেরিত হবেন, যাঁর নাম হবে মোহাম্মদ। এবার শুনুন, অচিরেই আপনাকে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হবে। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, হতাম বলবান যুবক। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো আপনাকে এ স্থান থেকে বের করে দিবে। রসুলেপাক স. বললেন, সত্যিই কি এরকম হবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ। আপনি যা নিয়ে আগমন করেছেন তা আর কেউই আনেননি। হায়! তবুও তো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। আপনাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র বিধান যে এরকমই। আল্লাহ্‌র নবীগণের সঙ্গে এরকমই দুশমনী করা হয়। কাফেরদের এমতো দুশমনী থেকে কোনো নবীই মুক্ত ছিলেন না। আমি ওই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকলে আপনার সাহায্যকারী হতে পারতাম। এর কিছুকাল পরেই ওয়ারাকা পরপারে পাড়ি দেন। নবুওয়াতের পূর্ণ প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন রসুলে পাক স. এর উপর ঈমান গ্রহণকারীদের অন্তর্ভূত। আরো অনেক মহানজন ছিলেন, যাঁরা তাঁর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। যেমন হাবীব নাজ্জার। সুরা ইয়াসিনে তাঁর কথা বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— ওয়ারাকা ইবনে নওফল সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য হবেন কি না। প্রকাশ থাকে যে, সাহাবী হওয়ার সংজ্ঞা এরূপ— যিনি রসুল স.কে ইমানের

সাথে দেখেছেন, তিনিই সাহাবী। এ শর্ততো তাঁর মধ্যে পাওয়াই যায়। মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা ওয়ারাকার অবস্থা সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি স. বলেছিলেন, আমি তাঁকে স্বপ্নে শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত অবস্থায় দেখেছি। উল্লেখ্য, শুভ্র পরিচ্ছদ ইমানের আলামত। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কায়সকে বেহেশতের মধ্যে দেখেছি। তাঁর শরীরে ছিলো সবুজ পোশাক। তিনি আমার উপর ইমান এনেছিলেন এবং আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। কায়স মানে ওয়ারাকা। কুস বা কায়স বলা হতো নাসারাদের ধর্মবেত্তাদেরকে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে বলা হয়েছে, তিনি রসুল স. এর উপর সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। ইবনে মিন্দাও ওয়ারাকা ইবনে নওফলকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। সাইয়্যেদা খাদীজার রসুলেপাক স.কে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে বিশেষ শিক্ষা। শিক্ষাটি হচ্ছে— পেরেশানী ও সন্দেহের কালে জ্ঞানী ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁদের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান জেনে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। একারণেই তরিকতের তালেব ও সালেকগণ আপন আপন মাশায়েখের কাছ থেকে তাঁদের কাশফ ও হালের হাকীকত সম্পর্কে জেনে নেন। এই ঘটনাটিই তাঁদের দলিল।

একটি সন্দেহের অপনোদন

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে— বোখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে, রসুলেপাক স. তখন কম্পনরত অবস্থায় স্বগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। হজরত খাদীজাকে বলেছিলেন, আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। সাইয়্যেদা খাদীজা তখন তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতার উল্লেখ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। শেষে বলেছিলেন, এমতো গুণাবলীর অধিকারী যাঁরা, তাঁরা কখনো বিপদগ্রস্ত হন না। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট। অথচ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, হক তায়ালা রসুলেপাক স.কে ইতোপূর্বেই দান করেছিলেন অনেক মোজেজা। যেমন বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার পূর্বে যখন গুহায় প্রবেশ করছিলেন, তখনই চতুর্দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন— ইয়া মোহাম্মদ! ইয়া রসুলাল্লাহ্! কিন্তু আওয়াজ দানকারী কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে আওয়াজ শুনেছিলেন, যার আওয়াজকারী ছিলো অদৃশ্য। সাত বছর বয়স থেকে এক বিশেষ ধরনের আলো দেখতে পেতেন তিনি। তিনি তখন আনন্দিত হতেন। ওই আলো ছিলো অন্তরের অনুভূতির আলো, দৃষ্টিগ্রাহ্য নূর, অথবা জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলো, যার মাধ্যমে হৃদয়-মন পুলকিত

হয়। প্রতিটি বৃক্ষ ও প্রস্তর তাঁকে সালাম করছিলো। তিনি তা স্পষ্ট শুনতেও পাচ্ছিলেন। 'জামেউল উসুল' এবং 'আল ওয়াফা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বের তিন বছর ইস্রাফীল ফেরেশতা তাঁর খেদমতে হাজির থাকতেন। তারপর ওহী নিয়ে নাযিল হন জিবরাইল। 'সফরুস্‌সায়াদাত' রচয়িতা বলেন, রসুলেপাক স. এর বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইস্রাফীলকে তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেন। এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মিকাইল ফেরেশতাও ছিলেন তাঁর খেদমতের নির্দেশপ্রাপ্ত। জিবরাইল আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান নিয়ে হাজির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিকাইল ছিলেন রসুল স. এর সঙ্গী। রসুল স. এর উনত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি স. মিকাইলের উপস্থিতির ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁর কাছে কোনো ওহীও আনতেন না। কেননা ওহী আনয়ন করার দায়িত্ব ছিলো জিবরাইলের। তাই প্রশ্ন— পূর্বাহ্নে এতোকিছু প্রকাশিত হওয়ার পরেও রসুলেপাক স. এর মধ্যে এরূপ ভয়ভীতি ও সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো কেনো?

এমতো প্রশ্নের নিরসনার্থে আলেমগণ বলেছেন, কোনো অসাধু আত্মার প্রভাব ও ক্ষতির আশংকায় তিনি ভয় পেয়েছিলেন— বিষয়টি এমন নয়। বরং তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন নবুওয়াতের গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে। দায়িত্বটি যে সুকঠিন, সে কথা চিন্তা করেই তখন তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিলো। ওই প্রকম্পনের প্রভাব প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর শরীরেও। তাঁর বাণী 'আমার জীবন সংকটাপন্ন' উক্ত অবস্থার ইঙ্গিতবাহী। অথবা তার অর্থ এমনও হতে পারে যে, তিনি স. যখন নবুওয়াতের গুরুভার বহন করার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন, তখন তাঁর পৃষ্ঠদেশ হয়ে পড়লো দুর্বল। মেরুদণ্ডও ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। তাই তিনি একথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলেন যে, এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি আবার হালাক হয়ে যান কিনা। তাই তিনি বলেছিলেন, আমার জীবন সংকটাপন্ন। কেউ কেউ বলেন, রসুল স. তখন ভয় পেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, যাঁকে দেখলেন, তিনি সত্যি জিবরাইল কিনা? না কোনো শয়তান, বা জ্বিন। হতে পারে, এরূপ আশংকা করেই তিনি তখন ভয় পেয়েছিলেন। অথবা মানুষ তাঁকে মাতাল, গণক ইত্যাদি বলে যাতনা দেয় কিনা, সে আশংকা হওয়াতেই তাঁর শরীর তখন প্রকম্পিত হয়েছিলো। এজাতীয় ব্যাখ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা ভয়-ভীতি তো দেখা দিয়েছিলো হজরত জিবরাইলের অবতরণের পর, ওহী ও নবুওয়াতের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের শেষে। তিনি স. নবুওয়াতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে রহস্যময় নূর। সুতরাং উক্তরূপ অপব্যাখ্যার কোনো অবকাশ এখানে নেই। আর সাইয়্যেদা খাদীজা রসুলেপাক স.কে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন সন্দেহ দূর করার জন্য, অথবা দৃঢ় জ্ঞান ও

বিশ্বাস অর্জন করার জন্য নয়। রসুল স. এর উপরে তাঁর আগে থেকেই ছিলো প্রগাঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা। ওই ভালোবাসার আতিশয্যেই তিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন একজন জ্ঞানী ও আপন লোকের কাছে 'নূরুন আলা নূর' এর বিধানানুসারে। তাছাড়া সাইয়্যেদা খাদীজা রা. যে সকল গুণাবলী ও পূর্ণতার দলিল পেশ করেছেন, সেগুলোও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং ক্ষতিকর আশংকার পরিপন্থী। ওই সকল গুণ তাঁর চোখে সদাভাস্বর ছিলো। তৎসত্ত্বেও মানবিক প্রবৃত্তি অনুসারে তাঁর ধারণা মানবিকভাবে কিছুটা টাল খেলে খেতেও হয়তো পারে, কিন্তু নবী করীম স. এর পবিত্র সত্তা ছিলো এ ধরনের সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর ওয়ারাকা ইবনে নওফলের সান্ত্বনার মাধ্যমে যদি রসুল স. এর বিষয়টি আত্মিকভাবে অধিকতর সুস্পষ্ট হয়েই থাকে, তবে বিষয়টি হবে ওই রকম— যেমন কোনো মোজেজা প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি স. স্বতস্ফূর্তভাবে বলতেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রসুল। তিনি এরকম বলতেন মানুষের মন ও মস্তিষ্কে কথাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করণার্থে, যেনো তারা ইমান আনতে পারে সহজে ও অবিলম্বে। এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয় উত্থাপিত প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন হলো। এবার তবে আমরা আরো অগ্রসর হই।

সর্বপ্রথম নাযিল হয় সুরা ইক্বরার আয়াত 'ইক্বরা বিস্‌মি রব্বিকাল্ লাজী খলাক্ব' থেকে নিয়ে 'আ'ল্লামাল ইন্‌সানা মা লাম ইয়াআ'লাম' পর্যন্ত। ইমাম মহিউদ্দীন নববী বলেছেন, এটাই সঠিক কথা। কোনো কোনো পূর্ব ও পরবর্তী জমহুরের মতও তাই। তবে এরকমও একটি মত আছে যে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্‌ছির'। ইমাম নববী বলেছেন, এই মতটি দুর্বল তো বটেই, উপরন্তু পরিত্যাজ্য। 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্‌ছির' আয়াত অবতীর্ণ হয় ওহীর ক্বেরাতের পর। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরও আলোচনা আসবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা ফাতিহা। এ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটির বর্ণনাকারী সুরক্ষিত নয়। হলেও বর্ণনাটি অকাট্য নয়। এরকমও হতে পারে যে, 'ইক্বরা'র পর 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্‌ছির' দ্বারা ইক্বরার নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে 'আস্‌তাই'জু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম'। কেননা হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে প্রথমে বলেছিলেন, হে মোহাম্মদ! আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বনির রজীম'। তারপর জিবরাইল বলেছিলেন, বলুন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। তারপর বলেছিলেন, 'ইক্বরা বিস্‌মি রব্বিকাল্ লাজী খলাক্ব'। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। আলেমগণ বলেছেন, প্রথম ওহীর পর তিন বছর পর্যন্ত ওহী বন্ধ ছিলো। ইবনে ইসহাক এই মতটির উপরে জোর দিয়েছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় বলা হয়েছে, ইমাম আহমদ শা'বী তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

নবী করীম স. এর বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার পর তাঁর উপর নবুওয়াতের ওহী নাযিল হয়। তারপর তিন বছর পর্যন্ত ইস্রাফীল, নবী করীম স. এর সঙ্গে থাকেন। তিনি তাঁকে কিছু কথা এবং কতিপয় বিষয় শিক্ষা দেন। তখন তাঁর উপর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো। এভাবে তিন বছর অতিবাহিত হলে তাঁর নিকট আসেন জিবরাইল। এরপর বিশ বছর ধরে রসুল স. এর উপর ওহী নাযিল হতে থাকে। 'রওজাতুল আহবাবে' আছে, ওহীবিরতির কালে জিবরাইল আমীন তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। ওহীবিরতির সময় রসুলেপাক স. খুবই উদ্বিগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করতেন। ভাবতেন উহুদ পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তখন জিবরাইল আত্মপ্রকাশ করতেন এবং বলতেন, মোহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি আপনার ভ্রাতা। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় একদিন রসুলেপাক স. জিবরাইল আ.কে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট দেখতে পান। ওই দৃশ্য দেখে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ঘরে ফিরে এসে বলেন, যাম্মিলূনি-যাম্মিলূনী (আমাকে কম্বলাবৃত করো- আমাকে কম্বলাবৃত করো) তখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্ছির কুম ফাআন্‌যির'। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত তাঁর রেসালত অপেক্ষা অগ্রগামী। মুহাদ্দিছগণের নীতি অনুসারে নবুওয়াতের মধ্যে তবলীগ (প্রচার) ও ইনযার (ভয় প্রদর্শন) শর্ত নয়। এমতাবস্থায় ওহী নাযিলই নফসের পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট। সুরা ইক্বরাও নফসের পূর্ণতার জন্য নাযিল হয়েছিলো। এটাই নবুওয়াতের কাজ। তার তবলীগ ও ইনযারের জন্য নাযিল হয় সুরা মুদ্দাছ্ছির। আর এটা রেসালতের কাজ।

ওহীর স্তরসমূহ

আলেমগণ ওহীর কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম স্তর হচ্ছে রুইয়ায়ে সালেহা বা সত্য স্বপ্ন। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত হতো সত্য স্বপ্ন। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুলেপাক স. যাই স্বপ্নে দেখতেন, তাই প্রভাতের আকাশের ন্যায় প্রতিফলিত হতো। তাঁর এধরনের অবস্থা ছ'মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো।

ওহীর দ্বিতীয় স্তর ঃ জিবরাইল আ. নবী করীম স. এর পবিত্র কলবে কিছু 'ইলক্বা' (আত্মিক প্রক্ষেপণ) করে দিতেন। তখন কিন্তু তিনি স. হজরত জিবরাইল আ.কে দেখতে পেতেন না। যেমন তিনি স. বলেছেন, আমার অন্তরের মধ্যে রূহুলকুদুস ফেরেশতা এই মর্মে ইলক্বা ও ইলহাম করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না সে তার রিজিক পুরা করে । হাকেম। হাকেম আরো বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্।

ওহীর তৃতীয় স্তর ঃ জিবরাইল মানুষের আকৃতি ধারণ করে রসুলেপাক স. এর নিকট আগমন করতেন এবং তাঁর কাছে আল্লাহ্তায়ালার পয়গাম পৌঁছে দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সাহাবী দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতি ধরে আসতেন। হজরত দাহিয়া ছিলেন বনী কেলাব গোত্রভূত। তিনি ছিলেন রূপবান। তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোথাও গমন করলে অন্তঃপুরবাসিনীরাও তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতো। পর্যালোচকগণ বলেছেন, জিবরাইল যখন দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতি ধারণ করতেন, তখন তাঁর আত্মা কোথায় থাকতো? তাঁর শরীর তো ছিলো তিনশ' পাখাবিশিষ্ট। সুতরাং বুঝতে হবে, রসুলেপাক স. এর নিকট যা আসতো, তা জিবরাইলের রূহও ছিলো না, ছিলো না তাঁর শরীরও। কেননা রূহ শরীরবিচ্যুত হলে মৃত্যু হয়। বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আইনী' থেকে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে সংকলিত হানাফী মাজহাবের মত হচ্ছে, রূহ স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে জিবরাইলের মৃত্যু হয়নি। জীবদ্দশাতেই তাঁর আত্মা স্থানান্তরিত হতো। তাঁর আত্মা স্থানান্তরিত হয় সেভাবে, যেভাবে শহীদগণের আত্মা সবুজ পাখির দেহে অবস্থান গ্রহণ করে। আত্মা পৃথক হওয়ার কারণে দেহের মৃত্যুবরণের বিষয়টি জ্ঞানগত বিষয়। এটি বনী আদমের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম, যা আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। বনী আদম ব্যতীত অন্যদের বেলায় নিয়মটি খাটে না। আর এটা আল্লাহ্তায়ালার কুদরত। এই সমাধানটি বাহ্যিকতার দৃষ্টিকোণগত। মুহাক্কিক্গণের মতে দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতি ধারণের বিষয়টি হতে পারে এ রকম— জিবরাইলের যেহেনের মধ্যে দাহিয়াতুল কালবীর এলমী সুরত (জ্ঞানগত আকৃতি) বিদ্যমান ছিলো। তাই তিনি তাঁর পূর্ণ গুণাবলী ও ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ে উক্ত এলমী সুরতের উপর স্বীয় সত্তাগত গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। এভাবে আবির্ভূত হতেন দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতিতে। আর ওই সময়েও তিনি তাঁর ফেরেশতাসুলভ সত্তা ও গুণাবলী নিয়েই প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। যেমন হক সুবহানাহু তায়ালার সৃষ্টির দর্পনে প্রতিবিম্বিত হওয়া (বিষয়টি অবশ্য ওয়াহ্দাতুল ওজুদ মতবাদসম্পৃক্ত— অনুবাদক)। কামেল ওলীগণের বিভিন্ন আকৃতি ধারণের বিষয়টিও সেরকম। বিষয়টি দুর্বোধ্যও বটে।

উল্লেখ্য, হজরত জিবরাইল দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতি ছাড়াও অন্য আকৃতিতেও প্রকাশিত হতেন। ইসলাম, ইমান ও এহ্সান বিষয়ক হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

ওহীর চতুর্থ স্তর ঃ কখনো কখনো সাল্সালাতুল জারাস, অর্থাৎ ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় আওয়াজ উত্থিত হতো। ওই আওয়াজ নবী করীম স. ছাড়া অন্যে শুনতে পেতেন না। এরকম ওহী রসুলেপাক স. এর নিকট ছিলো সবচেয়ে গুরুভার। এমতাবস্থায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তাঁর ললাটদেশ থেকে স্বেদবিন্দু নির্গত হতো।

উষ্ট্রারোহী অবস্থায় এরকম ওহী অবতীর্ণ হলে তাঁর উট মাটিতে বসে পড়তো। একবার হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের উরুর উপর মাথা রেখে তিনি শুয়েছিলেন। তখন এরকম ওহী অবতীর্ণ হলো। হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেতের উরু তখন ওহীর ভারে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর উপর ওহী আসার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। ওই সময় কষ্টের চোটে তাঁর মুখমণ্ডলে দেখা দিতো রৌপ্যবিন্দুর মতো ঘামের ফোঁটা। একদিন তিনি স. আমার রানের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হঠাৎ আমার রান এতো ভারী মনে হতে লাগলো যে, মনে হচ্ছিলো আমার পা ভেঙে যাবে। আমার পা হয়তো আর কখনও সচল হবে না। তাঁর উপর যখন সুরা মায়িদা নাযিল হয়, তখনও তাঁর উটনীর পা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। এরকম ওহীর সময় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রঙও পরিবর্তিত হতো। তাঁর শরীর হয়ে যেতো মেটে বর্ণের। তাঁর মাথা তখন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তো। তাঁর দেখাদেখি সাহাবীগণও মস্তক অবনত করতেন। এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি স. মস্তক উত্তোলন করতেন। এজন্যই মুহাক্কিক্বগণ বলেন, ফয়েজ সঞ্চালন এবং ফয়েজ গ্রহণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, কখনও জিবরাইলের মিলকিয়াত— রসুলেপাক স. এর উপর এমন প্রবল হয়ে যেতো যে, তিনি স. তখন নিজেকে অতিক্রম করে আলমে মালাকুতে পৌঁছে যেতেন। আবার কখনও রসুলেপাক স. এর মানবত্ব জিবরাইলের উপর এরকম প্রবল হয়ে যেতো যে, তিনি তাঁকে মানবাকৃতিতে নিয়ে আসতেন। আর এরকম হতো প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে। আর প্রথম অবস্থা হতো শাসন ও ভয় প্রদর্শনের বেলায়।

ওহীর পঞ্চম স্তর : জিবরাইল কখনও কখনও আসতেন তাঁর নিজস্ব আকৃতি নিয়ে। তখন তাঁর শরীরে শোভা পেতো তিনশত ডানা। যেমন, সুরা আন্ নাজমে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্বানগণ বলেন, এরকম হয়েছিলো দু'বার। ওয়াল্লহু আ'লাম।

ওহীর ষষ্ঠ স্তর : আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর ওহী প্রেরণ করেছেন তখন, যখন তিনি ছিলেন আসমানে। এভাবে মেরাজের রাত্রিতে নামাজের প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো।

ওহীর সপ্তম স্তর : আল্লাহ্তায়ালা এবং রসুলেপাক স. এর সরাসরি কথোপকথন— যেমন তিনি কথা বলেছিলেন হজরত মুসার সঙ্গে।

ওহীর অষ্টম স্তর : অন্তরালবিহীন আলাপন। আসমানের উপরের ওহী এই স্তরের। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, প্রকারটি ওই সকল ব্যক্তিবর্গের মতানুকূল, যাঁরা বলেন, মেরাজ রজনীতে রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার দীদার লাভ করেছেন। মাসআলাটি মতানৈক্যমণ্ডিত। ওয়াল্লহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালাকে কখনও কখনও স্বপ্নে দেখতেন। স্বপ্নেই আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হতো। যেমন তিনি স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালককে সুন্দরতমরূপে দেখেছি। তিনি তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় আমার দু'কাঁধের উপর রেখেছেন এবং আমি তার শান্তিময়তা আমার বুক পর্যন্ত অনুভব করেছি। তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ঊর্ধ্বজগতে কী বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলছে, তা কি তুমি জানো? রসুলেপাক স. এর ইজতেহাদও ওহীর মধ্যে গণ্য। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা লিখেছেন, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে যে, রসুলেপাক স. এর ইজতেহাদ সঠিক এবং অকাট্য। কেননা তিনি নিষ্পাপ। বিখ্যাত উসুলের কিতাবে বলা হয়েছে, তাঁকে কখনও ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা হতো না, যেমন করা হয়েছে বদরের বন্দীদের ব্যাপারে। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা আরো বলেছেন, হালীমী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, তাঁর কাছে ৪৬ প্রকারের ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। ওগুলোর সবই তিনি বর্ণনা করেছেন। 'ফতহুলবারী' কিতাবে বলা হয়েছে, উক্ত প্রকারসমূহের অধিকাংশকে অবস্থার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে ওহী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর সে ৪৬ প্রকার ওহী মূলত পূর্বোল্লেখিত আট প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো আলেম বলেন, রসুলেপাক স. এর নিকট হজরত জিবরাইল ২৪ হাজার বার আগমন করেছিলেন। হজরত আদমের নিকট এসেছিলেন বারো বার। হজরত ইদ্রিসের নিকট চারবার। হজরত নূহের নিকট পঞ্চাশ বার। হজরত ইব্রাহীমের নিকট বিয়াল্লিশবার। হজরত মুসার নিকট একশ' চার বার এবং হজরত ঈসার নিকট দশবার। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

বিদ্বজ্জন বলেন, ইমান ও তওহীদের পর ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম রসুলে পাক স. এর উপর ওয়াজিব হয়েছিলো দু'রাকাত নামাজ, যা জিবরাইল তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ওই দুই রাকাত নামাজ তিনি স. জিবরাইলের সঙ্গেই আদায় করেছিলেন। মুকাতিল বলেছেন, প্রথমতঃ নামাজ ফরজ ছিলো দুই রাকাতই— দু'রাকাত ফজরের এবং দু' রাকাত এশার। যেমন আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ করেছেন— তোমার প্রভুপালকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো এশা ও ফজরে। 'ফতহুলবারী'তে বলা হয়েছে, রসুলে আকরম স. মেরাজের পূর্বেও নামাজ পড়তেন। নামাজ পড়তেন সাহাবীগণও। তবে এব্যাপারে অবশ্যই মতভেদ রয়েছে যে, সে নামাজ পাঞ্জেগানা ফরজ নামাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো কি না। কেউ কেউ বলেন, তখন সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের পূর্বের নামাজ ফরজ ছিলো। তাঁরা তাঁদের অভিমতের পরিপোষকরূপে উপস্থাপন করেন এই আয়াতকে— 'তোমার প্রভুপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো সূর্যোদয়ের এবং সূর্যোস্তের পূর্বে। ইমাম নববী বলেছেন, রসুলেপাক স. এর উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব ছিলো মানুষকে

ভীতিপ্রদর্শন করা ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া। তারপর আল্লাহ্তায়ালা ফরজ করেন রাতের নামাজ। যেমন সুরা মুয্যাম্মিলে বলা হয়েছে। আবার সে বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে এই সুরারই শেষের দিকের আয়াতের মাধ্যমে। এরপর মেরাজ রজনীতে পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করার মাধ্যমে পূর্বেকার হুকুমসমূহ রহিত করে দেওয়া হয়।

ইমানে অগ্রগামীগণ

রসুলুল্লাহ স. এর উপর সর্বপ্রথম কে ইমান এনেছিলেন, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, সর্বপ্রথম ইমান এনেছিলেন হজরত খাদীজা রা.। রসুলেপাক স. হেরা গুহা থেকে যখন ওহী নাযিলের খবর নিয়ে গৃহে ফিরে আসেন, তখন তিনি সব শুনে বলেছিলেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তখন দলিলও পেশ করেছিলেন। তারপর ইমানে অগ্রগামী ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। এরকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত, হজরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং ইব্রাহীম নাখয়ী। সাহাবী, তাবেয়ী এবং আলেমগণের একটি দল এই অভিমতের সমর্থক। কেউ কেউ বলেন, হজরত খাদীজার পর ইমান আনেন হজরত আলী। তিনি তখন মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর গৃহেই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। আর সে সময় তিনি ছিলেন বালক। এজন্যই তিনি বলেছেন, আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। হজরত আলীর বয়স ছিলো তখন মাত্র দশ বছর। তিবরানী। আবু আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, উল্লেখিত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এও বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন সর্বহজরত সালমান, আবু জর, মেকদাদ, খাব্বাব, জাবের, আবু সাঈদ খুদরী এবং জায়েদ ইবনে আরকাম। ইবনে শিহাব ও কাতাদার মতও অনুরূপ। কেউ কেউ লিখেছেন, সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণকারী হচ্ছেন ওয়ারাকা ইবনে নওফল। শায়েখ ইবনুস্সালাহ্ বলেছেন, সবচেয়ে সাবধানতামূলক ও গুরুত্বপূর্ণ মত হচ্ছে— আজাদ পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমান এনেছেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হজরত আলী মুতর্জা, নারীদের মধ্যে হজরত খাদীজা, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসগণের মধ্যে হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা এবং ক্রীতদাসগণের মধ্যে হজরত বেলাল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনে আবদুল্লাহ্ দাবী করেছেন, সর্বপ্রথম হজরত আলী মুর্তজা ইমান এনেছিলেন। কিন্তু তিনি বালক ছিলেন বলে পিতা আবু তালিবের ভয়ে ইমানকে গোপন রেখেছিলেন, আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইমান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটিকে দৃঢ়তা প্রদান করে সাইয়্যেদুনা হজরত ইমাম হাসানের একটি বিবৃতি, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আলী

বলেছেন, আবু বকর চারটি বিষয়ে আমা অপেক্ষা অগ্রগামী— ১. ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা ২. হিজরতের সময় রসুলেপাক স. এর সঙ্গী হওয়া ৩. সওর পর্বতের গুহায় রসুলেপাক স. এর বিশেষ সান্নিধ্যে অবস্থান করা ৪. নামাজ কায়েম করা ও তা প্রকাশ করা।

হজরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রচারে ও প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেন সর্বহজরত জায়েদ ইবনে হারেছা, ওসমান ইবনে আফফান, যোবায়ের ইবনে আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবু উবায়েদ, আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাররাহ এবং আবু সালামা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আহাদ। এই নয় জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন আরকাম ইবনে ওসমান ইবনে মাযউন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, সাঈদ ইবনে জায়েদ এবং ফাতেমা বিনতে খাত্তাব। ইবনে সা'দ বলেছেন, সাইয়্যেদা খাদীজার পর মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমান আনেন হজরত আব্বাসের স্ত্রী উম্মে ফজল এবং হজরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক।

আমন্ত্রণ ও প্রচার

তিন বছর অতিবাহিত হলো। এই তিন বছর গোপনে গোপনে ইসলামের বিধান পালন করা এবং তাতে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। এরপর রসুলেপাক স.কে গোপনে আমন্ত্রণ ও প্রচারের কাজ শুরু করার হুকুম দেওয়া হয়। অতঃপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়— 'যা কিছু করতে তোমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে করো এবং আমন্ত্রণ ও প্রচারের কাজও প্রকাশ্যে করো। আর মুশরিকদের দিক থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে প্রকাশ্যে প্রচারের অর্থ উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করা। 'সাদউন' শব্দের আসল অর্থ প্রকাশ করা, বিশেষায়িত করা, প্রমাণ প্রকাশ করা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। তারপর থেকেই রসুলেপাক স. কোমর বেঁধে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। কুরায়েশরা তখনও তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করেনি। বাধা দিতে শুরু করে তখন, যখন তিনি বলতে শুরু করেন, প্রতিমা ও প্রতিমাপূজারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। এরকম বলার পর থেকেই তারা সম্মিলিতভাবে শত্রুতা শুরু করে। এ অবস্থা শুরু হয় নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে। আবু তালিব তখন সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর পক্ষে দাঁড়ান। রসুলেপাক স. এবং কুরায়েশদের মাঝখানে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন প্রাচীর রূপে। আল্লাহ্তায়ালা রসুলুল্লাহ্ স.কে তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। বংশগত নৈকট্যের কারণে তাঁরাও রসুলেপাক স. এর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। একদিন প্রতিমাপূজারীরা আবু তালিব ও রসুলেপাক স. এর কাছে

এলো। তিনি স. তাদের সকলকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। তারা ক্রোধান্বিত হলো। আবু তালিবকে বললো, মোহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আবু তালিব বললেন, উটনী যদি তার বাচ্চা ছাড়া থাকতে পরতো, তাহলে আমিও মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। তারপর তিনি রসুল স.কে লক্ষ্য করে কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ এরকম— মোহাম্মদ! তোমার প্রতিপক্ষীয়রা কখনো তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না। তুমি তোমার প্রচারকার্য চালিয়ে যাও। তোমার চক্ষুযুগল চির-শীতল থাকুক। তুমি আমাদেরকে কল্যাণের দিকেই ডাকছো। আর তুমি তো আমাদের কল্যাণকামী। নিশ্চয়ই তুমি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত। তুমি এমন এক ধর্মের প্রচারক, যে ধর্ম নিঃসন্দেহে সকল ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম। মানুষের নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় যদি না করতাম, তবে আমিও প্রসন্ন অন্তঃকরণে তোমার ধর্ম গ্রহণ করতাম। রসুলে আকরম স. লোকসমাগম দেখলে সেখানে চলে যেতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বলতেন, হে জনতা! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন তাঁর অংশী নির্ধারণ করতে। আবু লাহাব তাঁর এমতো অভিভাষণ শুনে পিছন থেকে বলতো, লোকসকল! এ তোমাদেরকে তোমাদের বাপদাদার ধর্ম থেকে সরিয়ে নিতে চায়। তোমরা এর থেকে দূরে থাকো। তাদের মধ্যে কেউ তাঁকে যাদুকর বলতো। কেউ বলতো কবি, কেউ গণক। আবার কেউ তাঁকে বলতো উন্মাদ। নাউযুবিল্লাহ্‌। কথিত আছে, কুরায়েশরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, হজের মওসুমে আরবের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা এসে মোহাম্মদের সুখ্যাতি শুনলে সহজেই তাঁর ভক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ওই সময় পরিকল্পিতভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে হবে। কেউ কেউ বললো, আমরা তাঁকে গণক বলে প্রচার করবো। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা ছিলো সবচেয়ে ধুরন্ধর। সে বললো, আমি তো বহু গণক দেখেছি, কিন্তু মোহাম্মদের বাণী তাদের কথার সাথে মিলেই না। দূরাগতরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। তখন লোকেরা বলতে লাগলো, তাহলে আমরা তাকে পাগল বলবো। ওলীদ বললো, এটাও তারা সহজে বুঝতে পারবে যে, সে পাগল নয়। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা তাকে কবি বলি? ওলীদ বললো, কবিত্ব কী, তা আমি খুব ভালো করেই জানি। মোহাম্মদের বচন কবিতার সাথেও সম্বন্ধ রাখে না। তারা বললো, তাহলে তাকে যাদুকর বলাই ভালো। সে বললো, যাদুবিদ্যার সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সে তো পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার শিখরবাসী। আর যাদুবিদ্যার ভিত্তি তো অপবিত্রতার উপর। ওলীদ আরও বললো, শোনো হে জনতা! মোহাম্মদ যে কালাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তা সুমিষ্ট ও আস্বাদ্য। অন্য কোনো কথা এরকম নয়। তার বচন হৃদয়হারক। অন্তরাত্মায় তার বাণী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে বিচ্ছেদ ঘটে পিতাপুত্র, ভাই-ভাই ও

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। তোমরা যদি চাও, তাহলে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে পারো। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে— 'নিশ্চয়ই সে চিন্তা করেছে, অথচ অশুভ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সে কী করে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারলো। আবারও বলছি, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কীভাবে সে এহেন সিদ্ধান্ত নিলো'।

কোনো কোনো হতভাগা রসুলেপাক স. এর পবিত্র শরীরে ময়লা নিক্ষেপ করতো। তাঁর ঘরের দরজায় রক্ত মাখিয়ে রাখতো। তাঁর চলাচলের পথে বিছিয়ে রাখতো কাঁটা। কখনো কখনো তাঁর দিকে নিক্ষেপ করতো পাথর। তিনি স. একদিন সেজদারত ছিলেন। এক হতভাগা তাঁর গলায় এমন চাপ দিলো যে, তাতে করে তাঁর চক্ষুদ্বয় কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। আরেকদিনের ঘটনা— এক কাফের তাঁর গলা অত্যন্ত শক্তভাবে চেপে ধরলো। এমন সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীক সেখানে উপস্থিত হন এবং ওই দুরাচারের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্তটি তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দাড়ি ধরে জোরে টান দিলো। ফলে উৎপাটিত হলো তাঁর দাড়ির কয়েক গাছা চুল। সে তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, লোকটি তখন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মাথায় ও মুখমণ্ডলে এমন আঘাত করলো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞান হারাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বলে যাচ্ছিলেন, তোমরা কি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যার অপরাধ শুধু এটাই যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভুপালনকর্তা। তিনি তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ সহকারেই আগমন করেছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক কোরআনুল করীমের এই আয়াত দ্বারাই সবাইকে নসিহত করতেন। আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো ফেরাউনের বংশধরদের মধ্যে যারা মুমিন ছিলেন তাঁদের ভাষ্যরূপে। হজরত মুসার সমর্থনে তাঁরা একথাটি ফেরাউনপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে কাবাশরীফের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত এসে তার চাদর দিয়ে রসুলে পাক স. এর গলদেশ বেষ্টন করে এমনভাবে টানাটানি করতে লাগলো যে, তাতে করে তাঁর গলায় ফাঁস লেগে গেলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর গলা থেকে চাদরের বন্ধন খুলে দিলেন। ওই অভিশপ্তকে লক্ষ্য করে বললেন— 'তোমরা কি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভুপ্রতিপালক'?

আলেমগণ বলেন, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মুমিনদের চেয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁরা হজরত মুসাকে কেবল বচন দ্বারা সাহায্য করেছিলো।

আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুলেপাক স.কে সাহায্য করেছিলেন মুখ ও হাত দ্বারা। নবী করীম স.কে সাহায্য-সহযোগিতা করার দিক দিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, হজরত আলী মুর্তযাও সে কথা বলেছেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, একদিন রসুলে আকরম স. কাবা শরীফের নিকটে নামাজ আদায় করছিলেন। কাছেই কুরায়েশরা সমবেত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে এক হতভাগা বললো, তোমরা কি ওই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছো? তারপর বললো, তোমাদের মধ্যে কি কেউ অমুক গোত্রের লোকদের যবেহকৃত উটের ভুঁড়ি এনে দিতে পারো? এক বর্ণনায় এসেছে 'মাশীমা' আনার কথা। মাশীমা হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত নাড়িভুঁড়ি। লোকটি আরো বললো, মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তোমরা তার কাঁধের উপরে কি নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিতে পারবে? একথা শুনে উকবা ইবনে আবী মুঈত উঠে দাঁড়ালো এবং উটের একটি ভুঁড়ি এনে রসুল স. এর দু'কাঁধের মধ্যখানে রেখে দিলো। তিনি সেজদা অবস্থায়ই পড়ে রইলেন। মাথা ওঠাতে পারলেন না। এই নিয়ে তারা হাশি-তামাশা করতে লাগলো। প্রত্যেকেই হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। সংবাদ পেয়ে সাইয়্যেদা ফাতেমা এসে তাঁর মাথার উপর থেকে সে ভুঁড়ি সরিয়ে দিলেন এবং ওই হতভাগাদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন। নামাজ শেষে রসুল স. মাথা তুলে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন,— হে আমার আল্লাহ্। এই দুর্বৃত্তদেরকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। এমতো অপপ্রার্থনার কারণে বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের দল লাঞ্ছনার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিলো। রসুলেপাক স. কুরায়েশদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করতেন। কিন্তু তারা যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করলো, তাঁর শুভকর্মে বিঘ্ন ঘটালো, তখন আল্লাহ্‌ই তাদেরকে শায়েস্তা করলেন। নাঊযুবিল্লাহি মিন আ'যাবিল হালীম।

মুসলমানদের উপরে নির্যাতন

কাফেরেরা দুর্বল মুসলমানদের উপরেও অকথ্য নির্যাতন চালাতো। আর বলতো, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করো। হজরত বেলালের গলায় রশি পেঁচিয়ে বালকদের হাতে দিয়ে দিতো। তারা সে রশি ধরে টানাটানি করতো। ফলে তাঁর গলায় ও ঘাড়ে জখম হয়ে যেতো। হজরত বেলালের মনীব উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে খালি গায়ে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর বড় পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। তাঁর শরীরে উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে দাগ দিতো। কখনও কখনও প্রহার করতো লাঠি দিয়ে। হজরত বেলাল তখন উচ্চারণ করতেন 'আহাদ- আহাদ'। কখনও কখনও তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। তবুও ঈমান ছিলো তাঁর কাছে অতি আস্বাদ্য। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর এমন

অবস্থা দেখে তাঁর মনিব উমাইয়া ইবনে খালফের নিকট থেকে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। এ সংবাদ শুনে রসুলে আকরম স. বললেন, হে আবু বকর! এ মহৎ কাজে তুমি আমাকেও অংশী করে নিলে না কেনো? হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো আগেই তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং তাঁর পিতামাতাকেও কাফেরেরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছিলো। একদিন তারা হজরত আম্মারকে প্রখর রোদে গরম বালির উপর শুইয়ে নির্যাতন চালাচ্ছিলো। রসুলেপাক স. সে দিক দিয়ে কোথাও গমনকালে তাঁর দুরবস্থা দেখে বললেন, হে ইয়াসারের পুত্র! সবর করো। তাঁর মাতা হজরত সুমাইয়াকে অত্যাচারিত হতে দেখে রসুল স. বলেছিলেন, সুমাইয়া! তোমাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। আবু জেহেল হজরত আম্মারের মাতা হজরত সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে ছুরি মেরে তাঁকে শহীদ করে দিয়েছিলো। তারপর শহীদ করেছিলো তাঁর পিতা হজরত ইয়াসারকে। হজরত আম্মারই ইসলামের প্রথম শহীদ।

কুরায়েশদের কিছু লোক একবার ইহুদীদের সঙ্গে দেখা করে রসুল স. এবং তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলো। ইহুদীরা বললো, তোমরা তাঁকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন কোরো। তিনি যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তা হলে বুঝবে, তিনি নবী। আর না পারলে মনে করবে সে একজন উন্মাদ। প্রথম প্রশ্ন— ওই সকল লোক কারা, যারা আল্লাহ্র অন্বেষণে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলো? দ্বিতীয় প্রশ্ন— কোন ব্যক্তি পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ ভ্রমণ করেছিলেন? আর তৃতীয় প্রশ্ন— রূহ কী? তারা রসুলেপাক স.কে যখন প্রশ্নগুলো করলো, তখন তিনি বললেন, আগামীকাল এসো। জবাব পাবে। তিনি স. একথার সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলেন। তাই ওহী এলো বিলম্বে। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন 'আপনি কোনো বিষয়ে এরূপ বলবেন না যে, আগামীকাল করবো। বললে তার সঙ্গে বলবেন 'যদি আল্লাহ্ চান'। অর্থাৎ তার সাথে বলবেন 'ইনশাআল্লাহ্'। তারপর আল্লাহ্তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইন সম্পর্কে, যা ছিলো কাফেরদের প্রথম দুই প্রশ্নের জবাব। শেষে রূহ সম্পর্কে জানালেন। রূহ বলতে এখানে কোন রূহকে বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রূহ মানে জিবরাইল, মানুষের আত্মা, ওই সকল ফেরেশতা, যারা কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন 'যেদিন রূহ এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, রূহ বলে এখানে মানুষের আত্মাকেই বুঝানো হয়েছে। এ মতটিই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেন, রূহ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার ওই ঘোষণা, যেখানে তিনি বলেছেন 'আপনি বলে দিন, রূহ হচ্ছে আমার রবের

হুকুম'। কথাটির তাৎপর্য এই যে, রূহের তত্ত্ব জানেন কেবল আল্লাহ্। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবকে রূহের প্রকার-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করেননি। অথবা করেছেন, কিন্তু অন্যকে জানানোর নির্দেশ দেননি। কোনো কোনো আলেম কিয়ামতের সঠিক সময়ের অবগতির ব্যাপারেও এরকম মন্তব্য করেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার বাণী 'তোমাদেরকে অত্যল্প জ্ঞান দান করা হয়েছে' আয়াতখানির দিকে ইশারা করেছেন। কেননা এই আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা এ ব্যাপারে প্রশ্নের অবতারণা করেছিলো। কথাটির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তোমরা রূহের হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপযুক্ত নও। অর্থাৎ ইহুদীদেরকে রূহ সম্পর্কে জ্ঞানদান করার কোনো যুক্তিই নেই। কিন্তু বিষয়টি এরকম নয় যে, রূহের হাকীকত সম্পর্কে রসুল স. জানতেন না।

বান্দা মিসকীন (গ্রন্থকার) বলেন, কোনো আরেফ মুমিন কেমন করে এহেন ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারে যে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন ইমামুল আরেফীন স. রূহের হাকীকত সম্পর্কে জানতেন না। হক সুবহানাহু তায়ালা তো তাঁকে তাঁর জাত ও সিফাতের জ্ঞানও দান করেছেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকিছুর এলেমই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহপাকের জাত ও সিফাতের এলেমের বর্ণনায় রূহের হাকীকতের এলেম তো ওই রকম, যেমন সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পানি। উজ্জ্বল সূর্যের তুলনায় আলোককনিকা।

সাহাবা কেরামের আবিসিনিয়ায় হিজরত

সাহাবা কেরামের উপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করলো, তখন রসুলেপাক স. তাঁদেরকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের জন্য ওই দেশটি ছিলো নিরাপদ। তাঁরা সেখানে হিজরত করেছিলেন রসুল এর নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে রজব মাসে। এগারো জন পুরুষ, মতান্তরে বারো জন পুরুষ ও চারজন রমণী ছিলেন ওই দলে— অপর মতানুসারে রমণী ছিলেন পাঁচজন। তাঁরা মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন গোপনে। কেউ কেউ গিয়েছিলেন পরিবার-পরিজনসহ, আবার কেউ ছিলেন পরিবার-পরিজনহীন। তাঁরা সমুদ্রতীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে নৌকাযোগে যাত্রা করেছিলেন আবিসিনিয়ার দিকে। সেখানকার সম্রাটের উপাধি ছিলো নাজ্জাশী। তাঁর আসল নাম ছিলো আসমাহা। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সাইয়্যেদা রুকিয়া বিনতে রসুলুল্লাহ্ স.কে। হিজরতকারীগণ সহী-সালামতে যথাস্থানে পৌঁছেছেন কিনা, সে ব্যাপারে সংবাদ পেতে যখন বিলম্ব হলো, তখন রসুলুল্লাহ্ স. চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর জনৈকা মহিলা

জানালো, আমি ওসমান ও তাঁর স্ত্রীকে উটের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। রসুল আকরম স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী লুতের পরে সস্ত্রীক হিজরতকারী হচ্ছে ওসমান ইবনে আফ্‌ফান।

সাহাবীগণ সেখানে নিরাপদে দিনাতিপাত করতে থাকেন। কিছুদিন পর সেখানে এই মর্মে সংবাদ পৌছলো যে, রসুল স. এবং মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে হিজরতকারীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা দিলেন। মক্কার কাছাকাছি পৌছার পর তাঁরা জানতে পারলেন, সংবাদটি ভিত্তিহীন। পৌত্তলিকেরা আগের মতোই মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। রসুল স. এর অনুমতি নিয়ে তাঁরা আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে হিজরত করলেন মুসলমানদের আরো একটি বড় দল।

পৌত্তলিকেরা তাঁদের নিরাপদ জীবনযাত্রার সংবাদ পেয়ে ক্রোধে এবং হিংসায় জ্বলতে লাগলো। তাঁদেরকে ধরে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করলো তারা। তারা নাজ্জাশীর সঙ্গে দেখা করে অনেক উপঢৌকন দিলো। সেজদা করে তাঁকে সম্মান জানানোর পর হিজরতকারীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলো। নাজ্জাশী বললেন, না, তা হয় না। তাঁরা আমার আশ্রিত। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুখামুখি কথোপকথনের ব্যবস্থা করলেন তাঁদের পৌত্তলিক দেশবাসীদের সঙ্গে। তাঁরা কিন্তু নাজ্জাশীকে সেজদার মাধ্যমে অভিবাদন জানালেন না। অভিবাদন জানালেন সালামের মাধ্যমে। সেজদা না করার কারণ জানতে চাইলেন তিনি। হিজরতকারীদের মধ্যে হজরত জাফর ইবনে আবী তালেব বললেন, আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করি না। আমাদের নবী আমাদেরকে এরকমই শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তাঁরা ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জানালেন। হজরত জাফরের বক্তব্য শুনে নাজ্জাশীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের নবীর উপর যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তার কিছু আমাকে পাঠ করে শোনাও। হজরত জাফর সুরা মরিয়ম থেকে তেলাওয়াত করলেন। তেলাওয়াত শুনে নাজ্জাশী এবং তাঁর মন্ত্রীরা কান্না শুরু করলেন। সকলে এক বাক্যে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই বাণী এবং নবী মুসার উপরে অবতীর্ণ বাণী জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়েছে একই দীপাধার থেকে। নাজ্জাশী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। তিনি ওই পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁর সম্পর্কে হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সুসংবাদ দিয়েছেন। এরপর নাজ্জাশী পৌত্তলিকদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দিলেন।

একটি অপপ্রচারের অপনোদন

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীগণ রসুল স. এবং মক্কার মুশরিকদের সন্ধি হওয়ার যে সংবাদটি শুনেছিলেন, তার প্রেক্ষাপটটি ছিলো এরকম— একদিন

রসুলে আকরম স. কুরায়েশদের এক সমাবেশে সুরা নাজম পাঠ করে শোনালেন। যখন তিনি স. পাঠ করলেন 'তোমরা কি লাত, উয্যা এবং তৃতীয় আরেকটি মানাতকে দেখোনি' তখন শয়তান মুশরিকদের কানে পৌঁছে দিলো এই কথাটি 'ওগুলো হচ্ছে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিমা, তাদের শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে'। পুরো সুরা পাঠ করে রসুলে পাক স. সেজদা করলেন। মুসলমানগণও সেজদা করলেন। মুশরিকরাও মুসলমানদের দেখাদেখি সেজদা করলো। সেজদা করলো না কেবল উমাইয়া ইবনে খালফ। সে তার মাথায় মাটি মেখে এবং মুখে আঘাত করে বললো, বাস্। এতোটুকুই যথেষ্ট।' সেজদা শেষে মুশরিকরা খুশি হয়ে বলতে লাগলো, এতদিনে মোহাম্মদ আমাদের প্রতিমাগুলোর প্রশংসা করলো। তারা যে সুপারিশ করতে পারবে, সে বিষয়ে স্বীকৃতি দিলো। আমরাতো এতোটুকুই বিশ্বাস করি। প্রতিমাসমূহকে আমরা কখনোই স্রষ্টা, রিজিকদাতা, জীবনমৃত্যুদানকারী মনে করি না। মোহাম্মদ যখন আমাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলো, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে নিলাম। এখন থেকে আমরা তাঁর এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলবো। এ সংবাদ প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। শয়তান সংবাদটি খুব ফলাও করে প্রচার করে দিলো। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানগণ এই সংবাদ শুনেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই ঘটনায় রসুলেপাক স. সাংঘাতিকভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করেন....'তোমার পূর্বে আমি যত নবী ও রসুল প্রেরণ করেছি, তাদের পাঠের মধ্যেও শয়তান এরকম প্রক্ষেপণ ঘটাতো। আমি সে প্রক্ষেপণকে মিটিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় করে দিয়েছি আমার মহাবাণীকে। আল্লাহ্ তো মহাজ্ঞানী ও কৌশলময়'। এই আয়াত যখন পৌত্তলিকদের কানে পৌঁছলো, তখন তারা বলতে লাগলো, মোহাম্মদ আমাদের প্রতিমাদের মান-মর্যাদার ব্যাপারে যা বলেছিলো, তা থেকে যখন পশ্চাদপসরণ করলো, তখন আমরাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

এই ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। কাযী আয়ায তাঁর 'আশশিফা' পুস্তকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর সংবাদটিকে শিথিলসূত্রবিশিষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বলেছেন, বর্ণিত বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাফেরেরাই যিন্দিকদের ঘটনাটি বানিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা কেমন করে হতে পারে? রসুলে আকরম স. ভুলক্রমেও এমন কিছু বলতে পারেন না, যা কোরআন মজীদে নেই। বায়হাকী বলেছেন, বিবরণটি অপরিচিত ও অখ্যাত। এর বর্ণনাকারীদের সকলেই দুষ্ট। ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ্ কিতাবে লিখেছেন, রসুলে আকরম স. সুরা আন্নাজম শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন। তাঁর সাথে সাথে মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন, ইনসান সকলেই সেজদা করেছে। ঘটনাটি অনেক

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিবরণে প্রতিমা বিষয়ে কোনো কথা নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রসুলেপাক স. এর জন্য প্রতিমাকে সম্মান করা বৈধ বলে কেউ মনে করলে সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধি ও উদ্বৃতির মাধ্যমে একথাই মনে করা সমীচীন যে, বর্ণিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মনগড়া। মুহাদ্দিছগণ এরকমই বলেছেন। তবে তাঁদের মধ্য হতে এক দল যেমন আবু হাতেম, তাবারী, ইবনে মুনজির, ইবনে ইসহাক, মুসা ইবনে আকাবা এবং আবু মা'শার প্রমুখ এমন কতিপয় বর্ণনাকারীর সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যাদের অধিকাংশই দুর্বল, মুনকাতে, মুরসাল, মুযতারাব এবং গায়রে সহীহ্। তাদের বিশুদ্ধতার দিকটি উপেক্ষা করলেও দেখা যায়, তাদের বক্তব্যের মধ্যে কিছু না কিছু মৌলিকত্বও রয়েছে। সুতরাং এরূপ বিবরণ পরিত্যাগ করার কোনো উপায় না থাকলে তাদের বক্তব্যের ভাবার্থ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যেমন কেউ কেউ বলেছেন— রসুলেপাক স. এর রসনা থেকে তখন বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলো অস্পষ্টভাবে তাই বুঝাই যাচ্ছিলো না, তিনি কি বলছেন। রসুলেপাক স. যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করে দিলেন। হজরত ক্বাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন কাযী আয়ায। তাবারী তা খণ্ডন করেছেন একারণে যে, রসুলেপাক স. এর উপর শয়তান প্রবল হয়ে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই সিদ্ধ নয়। এরকম হতে পারেই না। নিদ্রিত অবস্থাতেও নয়। আবার কেউ কেউ এর এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যা সুদূরপরাহত। যেমন শয়তান জোর করে তাঁর মস্তিষ্কে কথাটি প্রবেশ করিয়েছিলো। তাই তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ থেকে ওরকম কথা বেরিয়ে এসেছিলো। এই ব্যাখ্যাটি নিকৃষ্ট, ভ্রষ্ট এবং অবোধ্য। কেননা আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন 'হে শয়তান! আমার বান্দাগণের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই'। শয়তানের মধ্যে এরূপ কোনো ক্ষমতা যদি থাকতোই, তবে কোনো বান্দাই আল্লাহ্র বন্দেগী করতে পারতো না। কেউ কেউ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যেহেতু মুশরিকেরা অহরহ তাদের প্রতিমাসমূহের প্রশংসা করতো এবং ওগুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করতো, তাই তাদের ওই অপধারণা রসুল স. এর চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিলো। তাই ভুলক্রমে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে ওই বাক্যগুলি উচ্চারিত হয়েছিলো। এই ব্যাখ্যাটিকেও কাযী আয়ায প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরকম অযথার্থ ব্যাখ্যা থেকে আমরাও আল্লাহ্র পরিত্রাণ প্রার্থনা করি।

কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. যখন 'ওয়া মানাতাছ্ ছালিছাতাল উখ্রা' পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন, তখন মুশরিকরা আশংকা করতে লাগলো, এবার তিনি হয়তো তাদের প্রতিমাদের নিন্দাবাদ প্রকাশ করবেন। তখন মুশরিকরা অপবাক্যটি অতি দ্রুত রসুলেপাক স. এর তেলাওয়াতের সঙ্গে জুড়ে দিলো। তাদের স্বভাব

ছিলো এরকমই। তারা কোরআন তেলাওয়াতের সময় শোরগোল শুরু করে দিতো। বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলতো। ওই দিনও তারা এরকম করছিলো এবং বাক্যটিকে সম্বন্ধিত করে দিয়েছিলো শয়তানের সঙ্গে। অথবা শয়তান দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে শয়তান শ্রেণীকে, যার মধ্যে মানুষ শয়তানও অন্তর্ভূত। অর্থাৎ মানবরূপী শয়তানরাই অপবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলো। কেউ কেউ অর্থ করেছেন এভাবে— রসুলে আকরম স. কোরআন তারতীলের সঙ্গে তেলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক আয়াত শেষে যতিপাত ঘটাতেন। শয়তান সে সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলো। পাঠবিরতির সময় সে ঘটিয়েছিলো তার নিজস্ব বাক্যের প্রক্ষেপণ। অনুকরণ করেছিলো রসুল স. এর কণ্ঠস্বরেরও। ফলে শ্রোতারা বিভ্রান্ত হয়েছিলো। তাই তারা নির্দ্বিধায় প্রচার করেছিলো সন্ধির কথা। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' রচয়িতা লিখেছেন, এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুন্দর। মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত আলেম কাযী ইবনুল আরাবী এই ব্যাখ্যাটিকে মুস্তাহাসান বলেছেন। আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, নবী-রসুলগণের বিধানই এরকম যে, তাঁদের কথার সঙ্গে শয়তান তার নিজস্ব কথার কিছু না কিছু মিশ্রিত করার চেষ্টা করে। আর এই আয়াত আমাদেরকে একথাও বুঝিয়ে দেয় যে, রসুলে আকরম স.এর তেলাওয়াতের মধ্যেও শয়তান এমতো অপচেষ্টা চালিয়েছিলো।

এখন এ ব্যাপারে কেউ যদি বলে বসে, সুস্বীকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে তো এরকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু ঘটনাটি যদি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় 'ওয়া মা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা'— এই আয়াত দ্বারা আসলে কী বুঝানো হয়েছে? শয়তানের ইলক্বা বা প্রক্ষেপণ এর অর্থ তাহলে কী? নসখ ও মুহকাম (মোচন ও প্রতিষ্ঠা) করা হয়েছে তাহলে কোন আয়াতসমূহের। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উক্ত ঘটনার বাস্তবতা সাপেক্ষে 'তামান্না' এর অর্থ হচ্ছে পাঠ করা, তেলাওয়াত করা। কেননা 'উমনিয়াতুন' অর্থ পাঠ করা। আর উপরোক্ত ঘটনা কাল্পনিক ধরে নিলে 'তামান্না' এর অর্থ হয় আকাংখা করা, প্রবৃত্তির চাহিদা হওয়া, নফসের কামনা প্রবল হওয়ার আশংকা করা, দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হওয়া, পার্থিবতার সঙ্গে অতিসংলিপ্ত হওয়া, অন্তরে কুচিন্তার সৃষ্টি হওয়া, সাহু থেকে নিজকে গোপন রাখা, অন্তর্জগতের সঠিক পথ পাওয়া ইত্যাদি। আম্বিয়া কেরামের প্রতি উপরোক্ত বিষয়সমূহের সম্পর্ক থাকা জায়েয, যদি তাঁরা সে সবের উপর স্থায়ী না থাকেন। একারণেই রসুলেপাক স. বলেছেন 'নিশ্চয়ই আমার কলবের মলিনতা প্রভাব বিস্তার করে এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি'। আবার কখনও কখনও 'তামান্না' এর অর্থ হতে পারে স্বজাতির প্রতি আবেগপ্রবণ হওয়া। রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের

ইমান আনার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহী ছিলেন। সারাক্ষণ চাইতেন, তারা অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করুক। মনেপ্রাণে হয়ে যাক এক আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ প্রেমিক। পথপ্রদর্শন করুক অন্যদেরকেও। 'এবং আল্লাহ্‌ তাঁর নিদর্শনাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন'। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অসংখ্য হেকমত রয়েছে, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরের সার সংক্ষেপ ততোটুকুই, যতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে তাফসীরে বায়যাবীতে। ইমাম বায়যাবী বর্ণিত ঘটনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেষে বলেছেন, আম্বিয়া কেরামের ভুল হওয়া এবং অন্তরে সাময়িক ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি হওয়া যে বৈধ, তারই প্রমাণ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ওয়াল্লহু আ'লাম।

কথিত আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীকও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। আর উক্ত হিজরত বলতে সম্ভবত দ্বিতীয় হিজরতকেই বুঝানো হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে পাওয়া যায়, উক্ত হিজরত সংঘটিত হয়েছিলো নবুওয়াতের তেরোতম বৎসরে দ্বিতীয় বায়আতে আকাবার পর মদীনায় হিজরতের পূর্বে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন হিজরত করলেন, তখন মক্কার লোকেরা বললো, তিনি আমাদের কাছ থেকে অন্যত্র গমন করতে তো পারেন না। লোকেরা তাঁকে বারকুলগামাম নামক স্থান থেকে ফিরিয়ে এনেছিলো। মালেক ইবনে দাগনা নামক এক ব্যক্তি তখন হজরত আবু বকর কে আশ্রয় দিলো। দিলো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর নিজের গৃহে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করতে লাগলেন। তিনি তাঁর গৃহাঙ্গনে একটি প্রকোষ্ঠ বানিয়ে সেখানেই নামাজ আদায় করতেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কান্নাকাটি করতেন আল্লাহ্‌র প্রেমে ও ভয়ে। তাঁর অন্তঃকরণ ছিলো খুবই কোমল। কোরআন পাঠের সময় তাঁর চক্ষু থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তো। এ দৃশ্য দেখে নারী, শিশু এবং ক্রীতদাসীরা সেখানে জড়ো হয়ে যেতো। তারা কোরআনের আবৃত্তি শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তো। এরকম ফযীলত ছিলো কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীকের জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কোনো সাহাবী এরকম করার সুযোগ পেতেন না। তাঁদেরকে ইবাদত করতে হতো গোপনে।

কুরায়েশ নেতারা বিচলিত হয়ে পড়লো। মালেক ইবনে দাগনার কাছে গিয়ে তারা বললো, আমাদের নারী ও শিশুরা যে পাগল হয়ে যাবে। আপনি আবু বকরকে এরকম করতে নিষেধ করে দিন। তাঁকে কোরআন পাঠ করতে বলুন ঘরের কোনে, গোপনে। তিনি যদি আপনার কথা না শোনেন, তবে আপনিও আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করুন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন এসব কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি মালেক ইবনে দাগনাকে বললেন, আমি আপনার আশ্রয় চাই না। আমার প্রভুপালকই আমার আশ্রয়দাতা। বোখারী।

হজরত হামযার ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে রসুলুল্লাহ স. এর চাচা এবং দুগ্ধভ্রাতা হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তলিব ইমান গ্রহণ করেন। তিনি কুরায়েশদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে বড় বীর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানেরা প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে গেলেন। কথিত আছে, একদিন অভিশপ্ত আবু জেহেল রসুল আকরম স.কে খুব গালাগালি করলো। তিনি স. ব্যথিত হলেন। হজরত হামযা শিকারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে কাবাগৃহ তওয়াফ করতে শুরু করলেন। এমন সময় তিনি আবু জেহেলের অপকর্মের কথা জানতে পেরে ক্রোধান্বিত হন। সঙ্গে সঙ্গে ধনুক কাঁধে করেই তিনি সোজা চলে যান আবু জেহেলের কাছে। তাকে ধনুক দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করতে করতে রক্তাক্ত করে দেন। বলেন, তুমি মোহাম্মদকে গাল দিয়েছো। জানোনা আমি তার ধর্মমতকে পছন্দ করি। তারপর তিনি সেখান থেকে রসুল স. এর কাছে আসেন এবং ইমান গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, হজরত হামযা নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে ইমান এনেছিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের তিন দিন পর হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব ইমান গ্রহণ করেন। রসুলে আকরম স. দোয়া করেছিলেন 'আল্লাহুম্মা আই'য্যাল ইসলামা বিআমর ইব্‌ন হিশাম আও বিউমার ইব্‌ন খাত্তাব' (হে আল্লাহ্! আমর ইবনে হেশাম অথবা ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও)। আবু জেহেলের নাম ছিলো আমর ইবনে হেশাম। আবু জেহেল ও হজরত ওমর দু'জনই ছিলো প্রতাপশালী। যেহেতু আবু জেহেলের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার ঘোষণা ছিলো 'খতামাল্লহু আ'লা কুলূবিহিম' এবং 'সাওয়াউন আ'লাইহিম আ-আন্‌যারতাহুম আম্‌ লাম্‌ তুন্‌যিরহুম লা ইয়ু'মিনূন' তাই তার ব্যাপারে দোয়া কবুল হওয়ার অবকাশ ছিলো না। সুতরাং দোয়া কবুল হয় হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের ব্যাপারে। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ঊনচল্লিশ জন। হজরত ওমর চল্লিশের সংখ্যা পূরণ করলেন। তাই মদীনা-শরীফে তাঁর কবর জিয়ারতের সময় সালাম দেওয়া হয় এভাবে 'আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া মান কামালাল্লহু বিহিল আরবাঈন' (সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা চল্লিশ সংখ্যা পুরা করেছেন)।

হজরত ওমরের ইসলামগ্রহণ

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ওমরের ইসলামগ্রহণকালে মুসলমান পুরুষের সংখ্যা হলো চল্লিশ। মহিলাদের সংখ্যা ছিলো তখন এগারো। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিলম্বে। অথচ প্রথম

দিকে যখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইসলাম গ্রহণ করেন, তখনই তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো শোভনীয়। কিন্তু তা হয়নি। আর এই না হওয়ার মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র বিশেষ হেকমত। চল্লিশ সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও প্রণিধানীয়। ওয়াল্লহু আ'লাম। হজরত ওমর দেরীতে ইমান আনলেও কখনো তিনি রসুলে আকরম স. সম্পর্কে অপমন্তব্য করেননি। তাঁকে কখনো শারীরিক বা মানসিক কষ্টও দেননি। তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘটনাগুলো হয়তো সত্য। বর্ণনাকারীগণ যে যতটুকু জেনেছেন, তিনি ততটুকুই বর্ণনা করেছেন। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালাই ভালো জানেন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এসেছে, সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমার ভগ্নির মাধ্যমে আমার নিকট ইসলামের সংবাদ পৌঁছেছে। তার স্বামী ছিলেন সাঈদ ইবনে জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল। আমি একদিন আমার বোনের নিকট যেয়ে বললাম, তুমি নাকি বাপদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছো? এই বলে আমি তাকে প্রহার করতে শুরু করলাম। তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেলো। সে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললো, তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। কিন্তু ভালো করে শুনে নাও, আমি মুসলমান। আমার ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয়নি। আমি তার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, সেখানে রক্ষিত এক কিতাবে লেখা আছে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম'। আমি আরো পাঠ করলাম 'আররহ্‌মানির রাহীম'। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। আমি কিতাবখানা রেখে দিলাম। দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকালাম। দেখলাম, সেখানে লেখা আছে—সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া হুয়াল আ'যীযুল হাকীম- লাহূ মুলকুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর- হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্‌ জ্বহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়াহুয়া বিকুল্লি শাইইন আ'লীম' (আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। আসমান ও জমিনের রাজত্ব তাঁর। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সবকিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত)। হজরত ওমর বলেন, আমি আয়াতসমূহ পাঠ করতে করতে যখন 'ওয়া আমিনূ বিল্লাহি ওয়া রসূলিহ্‌' (এবং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ইমান আনো) পর্যন্ত এলাম, তখন আমার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো 'আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ্‌'। আমার ইমান আনয়নের সংবাদ শুনে মুসলমানগণ আনন্দ প্রকাশ করতে করতে উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমি মক্কার নিম্নাঞ্চল দারে আরকামে রসুলুল্লাহ্‌ স. এর

নিকট গেলাম। কয়েকদিন যাবত তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি আমার সামনে এলেন। দু'জন লোক আমার দুই বাহু শক্ত করে ধরে রেখেছিলো। তিনি স. বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। তিনি আমাকে তাঁর নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! ইসলাম গ্রহণ করো। আমার জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার অন্তরকে হেদায়েত দান করো। আমি উচ্চারণ করলাম---- 'আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রসূলাল্লহ'। মুসলমানেরা উচ্চকণ্ঠে তকবীরধ্বনি দিতে লাগলেন। সে আওয়াজে মুখরিত হলো মক্কার সকল অলিগলি। এর পূর্বে কেউ ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে পারতো না। আমার ইসলামগ্রহণের পরেই ইসলামের সকল কর্মকাণ্ড চলতে লাগলো প্রকাশ্যে।

তারপর আমি এমন এক লোকের কাছে গেলাম, যে মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করায় ছিলো ওস্তাদ। তাকে বললাম, আমি বাপদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। লোকটি সজোরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, সাবধান! খাত্তাবের পুত্র ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে। এরপর থেকে কেউ আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করলে আমার হাতেই তাকে মার খেতে হতো। এক দিনের ঘটনা। আমার মামা আবু জেহেল জিজ্ঞেস করলো, এতো গোলমাল কিসের? লোকেরা বললো, খাত্তাবের পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে সে একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, হুঁশিয়ার হয়ে যাও। আমার ভাগিনাকে আমি নিরাপত্তা দিলাম। তার ঘোষণা শুনে লোকেরা আমার কাছ থেকে সরে গেলো।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, বদবখ্‌ত আবু জেহেল তখন হজরত ওমরের উপর কঠোরতা শুরু করে দিলো। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। অবশেষে সে অত্যাচার ক্ষান্ত হলো। হজরত ওমর বলেন, তারপর অবস্থা এরকম দাঁড়ালো যে, আমি মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করতাম। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করে দিলেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর বোনের বাড়িতে পৌঁছে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। তাঁরা সুরা তোয়াহা তেলাওয়াত করছিলেন, যা লেখা ছিলো একটি পাণ্ডুলিপিতে। হজরত ওমর গৃহে প্রবেশ করে বললেন, ওটা কিসের পাণ্ডুলিপি? আমার কাছে দাও। তাঁর বোন বললেন, তুমি অপবিত্র। এটা এমন এক কিতাব, যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত এ গ্রন্থ কেউ স্পর্শ করে না '। হজরত ওমর গোসল করে নিয়ে সুরা তোয়াহা পাঠ করতে শুরু করলেন। পাঠ করতে করতে যখন উচ্চারণ করলেন 'তুমি যদি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো, তিনি তো গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুন্দর সুন্দর তাঁরই', তখন তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আহা! কতোই না সুমধুর

বাণী! মহ্যবাণী! তাঁর গুণরাজি যদি এরকম হয় যে, গোপন বিষয়ও তাঁর জানা, তাহলে তো তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। সত্যিই তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র রসুল কোথায়? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। অতঃপর তিনি গলায় তরবারী ঝুলিয়ে রসুলে আকরম স. এর খেদমতে হাজির হলেন। সাহাবীগণ ভয়ে ঘরের দরজা খুলতে চাচ্ছিলেন না। রসুলে পাক স. বললেন, দরজা খুলে দাও। তিনি স. তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। হজরত ওমরের দু বাহু ধরে আকর্ষণ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি স. তাঁর কোমর ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, হে ওমর! তুমি যদি কল্যাণের সাথে এসে থাকো, তাহলে আমি আমার হাত ফিরিয়ে নিবো। আর যদি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসে থাকো, তাহলে আমি তোমাকে ধ্বংস করে দিবো। রসুলে আকরম স. এর এ কথা শুনে হজরত ওমর কাঁপতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করলেন। বললেন 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রসূলাল্লহ্'। রসুলেপাক স. খুশিতে তকবীর বলে উঠলেন। সাহাবীগণও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উচ্চ আওয়াজে তকবীরধ্বনি দিলেন। তাঁদের তকবীরের আওয়াজ পৌঁছে গেলো কুরায়েশদের সমাবেশসমূহে। হজরত ওমর নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কুরায়েশরা তো প্রকাশ্যে লাত উয্যার উপাসনা করে, আর আপনি ধর্ম পালন করেন গোপনে। এরকম তো হতে পারে না। একথা বলে তিনি হজরত আবু বকর, হজরত হামযা এবং হজরত আলীকে সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহের দিকে রওয়ানা হলেন। কাফেরদেরকে কাবাগৃহের আশপাশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। রসুল স. কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তাফসীরকারগণ বলেন, সে সময় 'হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট, আর মুমিনদের মধ্য থেকে যারা আপনার অনুসরণ করে' এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিবরাইল রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আসমানবাসীরা হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে সাধুবাদ জানিয়েছে। তারা অতি আনন্দিত। ইবনে মাজা।

কুরায়েশদের বাড়াবাড়ি

নবুওয়াতের সপ্তম বৎসরে কুরায়েশরা যখন দেখলো, হজরত হামযা ও হজরত ওমরের ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের সম্মান ও শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহাবীগণ আবিসিনিয়ার দিকে চলে যাচ্ছেন, ফলে ইসলাম আরবদেশের বাইরেও বিস্তার লাভ করে চলেছে, তখন তাদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে

জ্বলে উঠলো। তারা রসুলেপাক স.কে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। কিন্তু যেহেতু রসুল স. ছিলেন আবু তালিবের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও যিম্মাদারীতে, তাই তাদের অত্যাচারের হাত অধিক প্রসারিত হতে পারলো না। একবার তারা আবু তালিবের নিকট এসে বললো, হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, নতুবা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তাকে বলে দিন, সে যেনো আমাদের প্রতিমাদের সমালোচনা আর না করে। তারা চলে যাওয়ার পর আবু তালিব রসুলে আকরম স.কে ডেকে এনে বললেন, তোমার গোত্রের লোকজন এসেছিলো এবং তারা তো এরকম বলে গেলো। এখন তুমি তোমার জীবনের উপর একটু সদয় হও। আমরা তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি না। রসুলেপাক স. বললেন, প্রিয় খুল্লতাত! আপনি কি এরূপ ধারণা করেছেন যে, আমি আপনার সহযোগিতার উপর ভরসা করে ধর্মপ্রচার করছি? কখোনই নয়। আমার প্রভুপালকই আমার প্রকৃত সাহায্যকারী। আমি তারই নির্দেশানুগামী। সত্যপ্রচারের পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত একাজ আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। এই মহান কাজ থেকে বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আপনি যদি আমাকে সহযোগিতা করেন এবং আমার অনুগামী হয়ে যান, তাহলে তা হবে আপনার জন্য মহাসৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ্র সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট। একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এমতো সাহসিকতাপূর্ণ কথা শুনে আবু তালিবের মনোবল আরও বেড়ে গেলো। তিনি বললেন, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। কাবার প্রভুর কসম! আমি যতক্ষণ জীবিত থাকবো, কেউ তোমাকে অবনত করতে পারবে না। তোমাকে প্রতিহত করার সাধ্য কারোই নেই। তারপর তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন, যার সারমর্ম এরকম— আল্লাহ্র শপথ! তোমার প্রতি কেউ কখনও প্রতাপের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না, যতদিন না আমাকে করা হবে মৃত্তিকাবৃত। তুমি তোমার ধর্মমত প্রকাশ্যে প্রচার করো। শংকাগ্রস্ত হয়ো না। সদাপ্রসন্ন থেকো। এ ধর্মের কারণেই যেনো তোমার চক্ষুযুগল সদাশীতল থাকে।

তারপর আবু তালিব বনী হাশেম গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করলেন। মুত্তালিবের বংশধরেরাও তাদের সঙ্গে সমবেত হলো। সকলেই গোত্রগত একাত্মতা ঘোষণা করলেও আবু লাহাব ধারে কাছে এলো না। অথচ সে ছিলো বনী হাশেম গোত্রভূত। কুরায়েশরা তাদের মধ্যে এই মর্মে চুক্তিনামা প্রস্তুত করলো যে, কেউ বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়-মিলা-মিশা ও ওঠা-বসা করতে পারবে না। কথা-বার্তাও বলতে পারবে না। এভাবে তাদের সঙ্গে করতে হবে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ। বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে বলে দিলো, তারা যেনো বনী হাশেমদের কাছে পণ্যবিক্রয় না করে। হজের সময়েও তারা দূরাগত ব্যবসায়ীদেরকে বনী হাশেমের লোকের কাছে তাদের পণ্যবিক্রয় করতে বাধা

দিতো। ওই পণ্য নিজেরাই কিনে নিতো বেশী মূল্য দিয়ে। এই মর্মে তারা একটি চুক্তিনামা লিখে তা মহরযুক্ত করে কাবাগৃহে ঝুলিয়ে দিলো। ওই চুক্তিনামায় লেখা ছিলো— বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের সঙ্গে কোনো সন্ধি হবে না, যতদিন না মোহাম্মদকে হত্যা করা হবে। কথিত আছে, যে ব্যক্তি উক্ত চুক্তিনামাটি লিখেছিলো, তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন 'তারা চায় আল্লাহ্‌র নূরকে মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করতে। অথচ আল্লাহ্তায়ালা চান তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করতে, কাফেররা যদিও তা অপছন্দ করে'। এঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো নবুওয়াতের সপ্তম বৎসরে মহররম মাসের কয়েক রাত্রি পরে। তারপর তিন বৎসর পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ চলতেই থাকে। তাঁদের কষ্ট-দুর্দশা যখন সীমা অতিক্রম করলো, তখন বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে একদল লোকের অন্তরে আল্লাহ্তায়ালা মমতা সৃষ্টি করে দিলেন। তারা উক্ত চুক্তিনামা ছিন্ন করে দিতে চাইলো। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু হলো তুমুল তর্ক-বিতর্ক-বচসা। শেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে এলো যে, তাহলে চুক্তিনামাটি উপস্থিত করা হোক। তখন আবু তালিব বললেন, মোহাম্মদ বলেছে, আল্লাহ্তায়ালা ওই চুক্তিনামার উপর ঝিঁঝিঁ পোকা নিযুক্ত করেছেন। পোকাগুলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের নাম ছাড়া আর সকল বিবরণ খেয়ে ফেলেছে। তার এ কথা যদি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো। আর যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহলে এতোটুকুই বুঝে নেওয়া উচিত যে, চুক্তিনামাটি ধ্বংসের উপযোগী। চুক্তিনামাটি সকলের সামনে উপস্থিত করা হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো, নবী করীম স. যেমন বলেছিলেন, তেমনই ঘটেছে। কুরায়েশরা লজ্জিত হলো। কিন্তু আবু জেহেল ও তার চেলারা তখন এ নিয়ে চেচামেচি শুরু করলো। বললো, চুক্তিনামাটি ছিন্ন করা যাবে না। আবু তালিব তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কাবাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে এবং রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো। আর আমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে, তা হালাল বানিয়ে দাও। এরপর কুরায়েশদের যে দলটি চুক্তিনামা বাতিল করতে চেয়েছিলো তারা শাআবে আবু তালিবে প্রবেশ করে তাদের এক ঘরে করে রাখা জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে তাদের আপন আপন ঘর বাড়িতে ফিরিয়ে আনলো, বিরুদ্ধবাদীরা কিছুই করতে পারলো না। এই প্রত্যাবর্তনতৎপরতা ঘটেছিলো নবুওয়াতের দশম বৎসরে।

ওই দশম বৎসরেই পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারস্য বিজয় লাভ করে। এ সংবাদ শুনে কুরায়েশরা খুশি হয়। তারা মুসলমানদের হাত ধরে ধরে বলতে থাকে, আজ যেমন আমাদের ভাই, তোমাদের ভাইদের উপর বিজয়ী হলো, তেমনি ভবিষ্যতে আমরাও তোমাদের উপর বিজয়ী

হবো। কাফেরেরা তাদের ভাই বলে পারস্যের অগ্নিউপাসকদেরকে বুঝিয়েছিলো। আর মুসলমানদের ভাই বলে বুঝিয়েছিলো রোমের আহলে কিতাবদেরকে। মুসলমানগণ তাদের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেন 'আলিফ লাম মীম গুলিবাতির রূম- ফী আদ্নাল আরদ্বি ওয়া হুম মিম বা'দি গলাবিহিম সাইয়াগ্লিবূনা ফী বিদ্ব'ই সিনীন' (আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন, এবার পারসীয়রা বিজয়ী হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা পরাজিত হবে। বিজয়ী হবে রোমীয়রা)। হজরত আবু বকর সিদ্দীক এ সংবাদের উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে কুরায়েশদেরকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের অন্তর খুশি করবেন না। আল্লাহ্র শপথ! কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমকরা পারস্যরাজকে পরাভূত করবে। উবাই ইবনে খালফ তাঁর কথা শুনে বললো, তিন বৎসরের মধ্যে যদি রোমকরা পারস্যদেরকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে আমি তোমাকে দশটি উট দান করবো। আর তা না হলে তুমি আমাকে দশটি উট দান করবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক একথা রসুল স.কে জানালেন। রসুলেপাক স. বললেন, যাও। উটের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নাও এবং সময়সীমাও কিছু বৃদ্ধি করে নাও। তাঁর এরূপ বলার কারণ হচ্ছে, 'বিদউন' সংখ্যাটি অস্পষ্ট, যার অর্থ হতে পারে তিন থেকে দশ পর্যন্ত। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা সংখ্যাটি অস্পষ্ট রেখেছেন, তাই সাবধানতা হিসাবে তিনি স. তিন সংখ্যাকে বৃদ্ধি করলেন এবং উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে করলেন একশত। এরপর বদরের যুদ্ধের দিন, মতান্তরে হুদায়বিয়ার দিন সংবাদ পাওয়া গেলো, রোমকবাহিনী পারস্যবাসীদের উপর জয় লাভ করেছে। হুদায়বিয়ার দিনের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কেননা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো নবুওয়াতের দশম বৎসরে। আর হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিলো হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরে। এই হিসাব অনুযায়ী নয় বৎসর সঠিক হয়। হজরত আবু বকর সিদ্দীক উবাই ইবনে খালফের কাছ থেকে একশত উটই আদায় করে নিয়েছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। 'তাফসীরে বায়যাবী' রচয়িতা লিখেছেন, ওই একশ উট উবাই ইবনে খালফের ওয়ারিশদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিলো। কারণ উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধে। কথিত আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ওই একশ' উট নিয়ে যখন রসুলেপাক স. এর নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি ওগুলোকে সদকা করে দিতে বলেছিলেন। সম্ভবত ওগুলোকে সদকা করে দিতে বলা হয়েছিলো আল্লাহ্র নেয়ামতের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। অথবা এই সন্দেহের কারণে যে, ওগুলোর ব্যাপারে শর্ত করা হয়েছিলো।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াতের পাঠরীতি রয়েছে দুইটি। তন্মধ্যে একটি 'গুলিবাত' মজহুলের সীগা দ্বারা এবং 'সাইয়াগ্লিবূন' মারুফের সীগা দ্বারা। আর অপর রীতিটি হচ্ছে 'গালাবাত' মারুফের সীগা, আর 'সাইউগলাবূন' মজহুলের

সীগা দ্বারা। দ্বিতীয় ক্বেরাত অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে— পারস্যদের উপর বিজয় লাভ করার পর রোমকরা আবার মুসলমানদের হাতে পরাজিত হবে। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার নয় বৎসর পর তারা পরাজিত হয়েছিলো।

আবু তালিবের মৃত্যু

আবু তালিব দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণ করেন নবুওয়াতের দশম বৎসরে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে বলা হয়েছে, যখন রসুলেপাক স. এর বয়স ঊনপঞ্চাশ বৎসর আটমাস এগারো দিন হলো, তখন তাঁর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। কেউ কেউ বলেন, নবুওয়াতের দশম বৎসরে শাওয়াল মাসের পনেরো তারিখে তাঁর চাচার মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ এমনও বলেছেন, আবু তালিবের মৃত্যু হয় হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে। তখন আবু তালিবের বয়স হয়েছিলো সাতাশী বৎসর। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. আবু তালিবের মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, চাচাজান! লা ইলাহা ইল্লাল্লহু কলেমা পাঠ করুন। আমি তাহলে কিয়ামতের দিন শাফাআত করে আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারবো। আবু তালিব রসুল স. এর এমতো আগ্রহ দেখে বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তাহলে কুরায়েশরা বলবে, মৃত্যুর ভয়ে আবু তালিব কলেমা পড়েছে। এরূপ আশংকা না থাকলে অবশ্যই আমি কলেমা পাঠ করে তোমাকে সন্তুষ্ট করতাম। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এসেছে, আবু তালিব তখন বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর কুরায়েশরা তোমাকে তিরস্কার করে বলবে, তোমার চাচা মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পড়েছিলো। এরূপ আশংকা না থাকলে অবশ্যই আমি কলেমা পাঠ করতাম। কথিত আছে, তখন আবু তালিব কতিপয় কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে— তুমি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছো। আমিও জানি যে, তুমি আমার কল্যাণ চাও। নিশ্চয়ই তোমার কথা সত্য। তুমি বিশ্বস্তও। তোমা কর্তৃক আনীত ধর্মমত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। মানুষের নিন্দার ভয় যদি আমার না থাকতো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে তোমার ধর্ম কবুলকারী ও তার একনিষ্ঠ প্রচারকারী হিসাবে দেখতে পেতে। তাঁর একথা শুনে কুরায়েশরা বিলাপ শুরু করলো। বলতে লাগলো, হে আবু তালিব! আপনি শেষে আপনার বাপদাদার ধর্ম, আপনার সম্মানিত পূর্বপুরুষ আবদুল মুত্তালিব, হাশেম এবং আবদে মানাফের ধর্ম পরিত্যাগ করবেন? আবু তালিব বললেন, না। আমি আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ধর্মের উপরেই আছি। এরপর তার মৃত্যু হলো। একথাও বর্ণিত আছে যে, আবু তালিব তাঁর মৃত্যুর সময় আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরকে ডেকে তাদেরকে এই মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, তোমরা সর্বদাই কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মোহাম্মদের কথা মানলে এবং তার অনুসরণ করলে তোমরা সঠিক পথ পাবে। কৃতকার্য হবে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে হেশাম ইবনে

সায়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি কুরায়েশদের যুবক ও বয়োবৃদ্ধদেরকে ডেকে আনলেন। তাদেরকে অসিয়ত করলেন, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদেরকে সকল মানুষের মধ্যে সম্মান দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে মোহাম্মদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি, তার সঙ্গে সদাচরণ কোরো। কেননা সে কুরায়েশদের মধ্যে আমীন এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদী। সমস্ত সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। সে নিশ্চয়ই এমন ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে, যা প্রত্যেক অন্তরই গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু নিন্দার ভয়ে তা অস্বীকার করে। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি, আরবের সকল ফকীর-দরবেশ, বেদুঈন ও সাধারণ জনতা সকলেই তার দাওয়াত কবুল করেছে। তারা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সম্মানিত পথপ্রদর্শক হিসাবে মেনে নিয়েছে। আরবের বড় বড় লোকের মস্তকও অবনত হয়ে গিয়েছে। তাদের মর্যাদা হয়েছে ধূলিসাৎ। বিত্তহীনেরা হয়েছে সম্পদশালী ও সম্মানিত। আর যারা সম্মানিত ছিলো, তারা হয়েছে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত। নিঃসন্দেহে সে আরবদেরকে বানিয়ে দিয়েছে শুদ্ধাচারী। তার ভালোবাসা আরবীয়দের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়েছে। তারা সকলেই তার আনুগত্য করে চলেছে। ভবিষ্যতে এরকম ঘটবে। কিন্তু তা যেনো আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি। হে কুরায়েশ জনতা! তোমরা তাকে ভালোবেসো। হয়ে যেয়ো তার সাহায্যকারী। আল্লাহ্র শপথ! যে তার অনুসরণ করবে, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। হবে সফল। কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। আমি যদি আর অল্পকালও বেঁচে থাকি, তবুও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবো। তাকে রক্ষা করবো বিপদাপদ থেকে। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিন্তু এতো কিছু করা সত্ত্বেও আবু তালিব ইমান গ্রহণ করেননি। আলেমগণ এরকম অভিমতই প্রকাশ করে থাকেন।

তাঁরা আরো বলেন, তিনি কলেমার উপর মৌখিক স্বীকৃতি দেননি। বরং অন্তরে বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর থেকে মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা এবং আনুগত্য করা পাওয়া যায়নি। বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা ও আনুগত্য করা যদি পাওয়া যায়, তাহলেই তাকে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করা হয়। আকায়েদের কিতাবসমূহে এরকমই বলা হয়েছে। আবু তালিব সেরকম কিছু করেছেন বলে কোনো হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কেবল একটি বর্ণনায় এসেছে, ইবনে ইসহাক বলেছেন, আবু তালিব মৃত্যুর সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, তাঁর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন হজরত আব্বাস দেখলেন, তিনি তাঁর ঠোঁট মৃদু মৃদু নাড়ছেন। তখন তিনি তাঁর কান আবু তালিবের মুখের কাছে নিলেন। তারপর রসুলেপাক স.কে বললেন,

হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে আমার ভাই ওই কলেমা পাঠ করেছেন, যা পাঠ করার জন্য তুমি তাঁকে বলেছিলে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন, আমি শুনেছি। এতদসত্ত্বেও সহীহ্ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁর শেষ কথা ছিলো 'আ'লা মিল্লাতি অ্যব্দিল মুত্তালিব' (আমি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপরই আছি)। তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' বলেননি। রসুল স. তখন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি ওই সময় পর্যন্ত আপনার জন্য মাগফেরাত চাইতে থাকবো, যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়। তখন অবতীর্ণ হয় 'নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সমীচীন নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়'। তাছাড়া আবু তালিবের ব্যাপারে আরো অবতীর্ণ হয়— 'আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ্ যাকে চান, তাকে হেদায়েত করেন'। সহীহ বোখারী শরীফে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুলুল্লাহ্ স.কে আবু তালিবের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি তো আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, আপনার পক্ষ নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করতেন। তিনি কী এর বিনিময় পাবেন? রসুলেপাক স. বললেন, হ্যাঁ, পাবেন। আমি তাঁকে জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর ও ঘাঁটিতে দেখেছি। অতঃপর আমি তাঁকে সেখান থেকে বের করে এনেছি। এখন তিনি এতোটুকু কষ্টে আছেন যে, তাঁর পা কেবল রয়েছে আগুনের মধ্যে, যার উত্তাপ পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর মাথার মগজ পর্যন্ত। ফলে তার মগজ গলে গলে পড়ছে। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তাঁর মাথার মগজ তাঁর পায়ের দিকে ঝুলে যাচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা আযাব হবে আবু তালিবের। আগুনের উত্তাপ পৌঁছবে তাঁর জুতার ফিতা পর্যন্ত। আর তাতেই তাঁর মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে। আর এই হাদিসের মর্ম হচ্ছে, কাফেরদের সৎকর্মের ফলে তাদের আযাব হালকা করা হবে।

'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যু কুফ্‌রী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী কাররামাল্লহু ওয়াজহাহু বলেছেন, আমি রসুলে পাক স.কে বললাম— ইন্না আ'ম্মাকাশ শাইখুদ্ব দ্বলু ক্বাদ মাতা (আপনার বৃদ্ধ ও ভ্রষ্ট পিতৃব্যের মৃত্যু হয়েছে)। তিনি স. বললেন, তোমরা তাকে গোসল দাও এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিরিক অবস্থায় তো তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বললেন, যাও। তাকে মাটির মধ্যে ঢেকে দাও। আরো বললেন, গাফারাল্লহু লাহু ওয়া রহমাহ্ (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। তার প্রতি দয়া করুন)। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. আবু তালিবের লাশের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে পিতৃব্য!

আপনি রক্তসম্পর্কের হক আদায় করেছেন। আমার হকের ব্যাপারে আপনি কোনোরূপ কার্পণ্য করেননি। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মোটকথা এই যে, আবু তালিবের বিষয়টি রহস্যযুক্ত নয়। এক বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা যখন তাঁর মৃত্যুকালে এসে ঝামেলা সৃষ্টি করলো, তখন তিনি বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিব, হাশেম ও আবদে মানাফের ধর্মের উপরেই মৃত্যুবরণ করছি। রসুলেপাক স. বলেন, আবদুল মুত্তালিব ও তার কাওম আগুনে পুড়বে। শেষযুগের আলেমগণ বলেন, রসুলেপাক স. এর পিতৃপুরুষগণ শিরিক ও কুফুরীর নাজাসাত থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। সুতরাং এই মাসআলাটির ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করাই সমীচীন। আল্লাহই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা।

সাইয়্যেদা খাদীজার তিরোধান

আবু তালিবের মৃত্যুর তিন অথবা পাঁচদিন পর ইন্তেকাল করেন উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিলো পঁচিশ বছরের। রসুলেপাক স. ওই বৎসরটিকে 'আমুল হুযন' বা 'দুশ্চিন্তার বৎসর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়্যেদা খাদীজার পরলোকগমণের পর রসুল স. ঘর থেকে খুব কম বের হতেন। কাফেরেরাও পূর্বের তুলনায় জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

এরপর তিনি স. বিবাহ করেন সাইয়্যেদা সাওদা এবং সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে। সাইয়্যেদা সাওদা বিনতে যমআ বিধবা ছিলেন। আর সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা ছিলেন ছয় বৎসরের কুমারী। রসুলেপাক স. তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন হিজরতের পর। হজরত খাদীজার তিরোধানের পর আবু লাহাব বাহ্যিকভাবে কিছুদিন সামাজিক সহযোগিতার রেওয়াজ পালন করেছিলো। কিন্তু সে যখন শুনতে পেলো, রসুল স. বলেছেন, আবদুল মুত্তালিব ও তার কাওমের স্থান হবে দোজখে, তখন সে অতুষ্ট হলো এবং সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিলো। আবার কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দিতে লাগলো। এমনকি মক্কায় বসবাস করা রসুল স. এর জন্য কঠিন হয়ে গেলো। একদিন তিনি স. ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বনী বকর ইবনে ওয়ায়েল কবীলায় চলে গেলেন। সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা সাড়া দিলো না। সেখান থেকে তিনি কাহ্‌তান নামক জনপদে দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন। তারা প্রথমদিকে অবশ্য তাঁর মেহমানদারী করলো, কিন্তু পরে পশ্চাদপসরণ করলো। সেখান থেকে তিনি স. গেলেন তায়েফ এবং ছাকীফের দিকে। হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা ছিলেন সফরসঙ্গী। তিনি স. একমাস ছাকীফে অবস্থান করেন। সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তারা তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। ক্রীতদাস ও বালকদেরকে তাঁর পিছনে

লেলিয়ে দেয়। তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি স. কোথাও পৌঁছলে তারা সেখানে গোলমাল করতে থাকে এবং গালিগালাজ করে। রসুল স. এর দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে পাথর। ফলে তাঁর চরণযুগল রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, ওই সব দুরাচার তাঁর পায়ে পাথর নিক্ষেপ করলে তিনি মাটির উপর বসে যেতেন এবং হাত দ্বারা পা মালিশ করে পায়ের যন্ত্রণা কমিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করতেন। তখন তারা আবার পাথর নিক্ষেপ করতো এবং এ নিয়ে হাসাহাসি করতো। হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা নিজে তাঁর শরীর দিয়ে নিক্ষিপ্ত পাথর ফিরানোর চেষ্টা করতেন। এক পর্যায়ে পাথরের আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি একবার রসুলে পাক স.কে জিজ্ঞেস করলাম, উহুদ যুদ্ধের দিন অপেক্ষা অধিক কষ্ট কি আপনি আর কোনোদিন পেয়েছিলেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষ থেকে আমি অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি। তবে সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছি তায়েফে। আমি সেখানে আবদ ইবনে লাইল ইবনে কেনানের কাছে সত্য ধর্মের আহ্বান নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু সে তা কবুল করেনি। আমি সেখান থেকে ব্যথিত অন্তরে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ফিরে এসেছিলাম। তাদের অত্যাচারে একবার জ্ঞানশূন্যও হয়ে পড়েছিলাম। ঘটনাটি ঘটেছিলো ছাআলীব নামক স্থানে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর যখন মাথা তুলে দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম, একখণ্ড মেঘ আমার মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে আছে। লক্ষ্য করলাম, সেখানে রয়েছেন জিবরাইল। তিনি বললেন, মক্কাবাসীরা আপনার সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করেছে এবং যা যা বলেছে, তার সকলকিছুই আপনার প্রভুপালনকর্তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি আপনার খেদমতে পাহাড়ের ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে আপনার নির্দেশানুগত করে দেওয়া হয়েছে। আপনি যা চাইবেন, তাই তারা করবে। পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সম্বোধন করে সালাম দিয়ে বললো, হক তায়ালা আপনার কাওমের লোকদের কথা শুনেছেন। আমি পর্বতরাজির ফেরেশতা। পৃথিবীর পর্বতসমূহ আমার কর্তৃত্বাগত। আর আমি কর্তৃত্বভূত আপনার। এবার নির্দেশ দিন। নির্দেশ পেলেই মক্কার দু'পার্শ্বের দুই পাহাড়কে উঠিয়ে এনে আমি তাদেরকে পিষে মেরে ফেলবো। আমি বললাম, আমি এরকম চাই না। বরং আমি আশা রাখি, হয়তো এদের বংশে আল্লাহ্তায়ালা এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করবে না।

আবদ ইবনে লায়ল ছিলো তায়েফের সরদারের নাম। তার কারণে ছায়ালীব হয়েছে নজদবাসীদের মীকাত। স্থানটিকে কারনে মানাযিলও বলা হয়। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা লিখেছেন, রসুলেপাক স. তায়েফে দশদিন অবস্থান করেছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এক বর্ণনানুসারে রসুল স. তায়েফে অবস্থান করেছিলেন এক মাস। ওয়াল্লহু আ'লাম।

জ্বিনদের বায়াত গ্রহণ

তায়েফবাসীরা যখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে মক্কার পথ ধরলেন, প্রত্যাবর্তনকালে প্রবেশ করলেন পথিপার্শ্বের একটি বাগানে। বাগানের তত্ত্বাবধায়ক তাঁর চেহারায় পেরেশানির আলামত দেখতে পেয়ে মমতাপরবশ হয়ে পড়লো। আঙ্গুরের একটি ছড়া তার আদাম নামক এক খৃষ্টান ক্রীতদাসের মাধ্যমে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলো। তিনি স. 'বিসমিল্লাহ্' বলে আঙ্গুরের দিকে হাত বাড়ালেন। আদাম বিস্মিত হয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তো এখানকার লোকের মুখে এমন কথা শুনিনি। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক ? কোন ধর্মের অনুসারী? সে বললো আমি খৃষ্টান। নিনুওয়া অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি স. বললেন, তুমি তো দেখছি পুণ্যাত্মা ইউনুস ইবনে মুত্ত্বার গ্রামের অধিবাসী। আদাম বললো, আপনি তাঁকে চিনলেন কেমন করে? রসুল স. বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা। আমার মতো তিনিও আল্লাহ্র নবী। আদাম বললো, আপনার নাম কী? তিনি স. বললেন, মোহাম্মদ। আদাম বললো, আপনার নাম আমি তওরাত কিতাবে অনেকবার পাঠ করেছি। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মক্কায় প্রেরণ করবেন। মক্কাবাসীরা আপনার আনুগত্য করবে না। তারা আপনাকে আপনার জন্মভূমি থেকে বের করে দিবে। অবশেষে আপনাকে সাহায্য করা হবে এবং আপনার ধর্ম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আদাম রসুলেপাক স. এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করলো। চোখে মুখে তাঁর হাত পায়ের স্পর্শ বুলিয়ে নিলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। তায়েফ ও ছাকীফে চরম দুরাবস্থার সময় তিনি স. আল্লাহ্তায়ালার নিকট অনেক দোয়া করেছিলেন। এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বিভিন্ন বিবরণ এসেছে। একটি দোয়া ছিলো এরকম— আল্লাহুম্মা ইন্নী আশ্কূ ইলাইকা দ্বু'ফা কুওওয়াতী ওয়া ক্বিল্লাতা হাইফী ওয়া হুয়া ইন্নী লিহাজাল্ মাখলূক্বীনা আন্তা আরহামুর রহিমীন ওয়া আন্তা রব্বুল মুস্তাদ্বআ'ফীন ওয়া যিনী ইলা মাইঁয়াকালুনী ইলা আ'দুবিা বায়ী'দিন তাজাহ্হামানী ওয়া মালাইকাতাহু আম্‌রী ইন্ লাম ইয়াকুল্ লাকা বী গদ্বাবু ফালা উবালী ওয়ালা কিন্ আ'ফিইয়াতাকা আওসাআ' ইন্নী আউযু বিনূরী ওয়াজ্হিকাল্ লাজী আশ্‌রক্বাত্ বিহিজ্ জুলুমাতু ওয়া সুল্হা আ'লাইহি আম্‌রূদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি আই ইউনায্যিলা বী গদ্বাবাকা ওয়া ইউহাল্লি আ'লিয়্যুন সাখাতুকা লাকাল্ উ'তাবী হাত্তা তারদ্বা ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিকা (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুযোগ করছি আমার শক্তির খর্বতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং আমার অসহায়ত্বের। তুমি অসহায়ের সহায়। তুমি আমাকে এমন দূর-দূরান্তরের শত্রুদের হাতে সমর্পণ করেছো, যারা আমাকে দেখামাত্রই রাগান্বিত হয়, অথচ আমাকে করেছো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও রক্ষক। তুমি যদি আমার প্রতি

অতুষ্ট না হও, তবে আমার কোনো চিন্তাই নেই। জানি, তোমার ক্ষমা অত্যধিক প্রশস্ত। আমি তোমার আশ্রয় যাচনা করি তোমার আনুরূপ্যবিহীন অবয়বের নূরের, যার মাধ্যমে অন্ধকারসমূহ দূরীভূত হয়। আলোকিত হয়ে যায় সকল দিক। আর দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই হয়ে যায় সঠিক। আমি পরিত্রাণ চাই তোমার অপরিতুষ্টি থেকে। দয়া করে আমার প্রতি পরিতুষ্ট ও সদয় হও। তোমার দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে কোনো শক্তি নেই, নেই কোনো সাহায্যও)।

এক বর্ণনায় আছে, যখন আবু তালিবের মৃত্যু হলো, তখন রসুল স. পায়ে হেঁটে তায়েফের দিকে চলে গেলেন। তায়েফবাসীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করলো। ব্যথিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিলেন তিনি। সেখানে দু' রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ্র নিকট উপরে বর্ণিত দোয়া করলেন, যার উল্লেখ রয়েছে হাদিস ও ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকে। এরপর উপস্থিত হলেন নাখলা নামক উপত্যকায়। নাখলা মক্কা থেকে এক মনযিল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। রাতে যখন তিনি নামাজে দাঁড়ালেন, তখন শামদেশের একটি শহর নসিবীন থেকে আগত সাতটি জ্বিন, কোনো কোনো বর্ণনানুসারে নয়টি জ্বিন ওই স্থান দিয়ে গমনকালে তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে পায়। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে 'বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি'। তিনি স. যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন জ্বিনদের ওই দলটি তাঁর সামনে প্রকাশিত হলো। তিনি তাদেরকে ইমানের দাওয়াত দিলেন। তারা ইমান গ্রহণ করে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়। তাদেরকে বলে, হে আমাদের কাওম! আমরা এমন একটি গ্রন্থের আবৃত্তি শুনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপর। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে হজরত ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কতিপয় জ্বিন কোরআন তেলাওয়াত শুনেছে, কিন্তু তারা রসুল স. এর সামনে প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়নি। তারপর তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে যায়। তাদের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে জ্বিনেরা দলে দলে রসুলেপাক স. এর নিকট আসতে শুরু করে এবং আত্মপরিচয় না দিয়ে কোরআন শুনতে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারা নতুন মহল্লার লোক হিসেবে রসুলেপাক স. এর নিকট আগমন করেছিলো, কিন্তু নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেনি। বর্ণিত আছে, হেরেম শরীফের নিকটস্থ একটি বৃক্ষ রসুল স.কে জানিয়ে দেয় যে, জ্বিন জাতির কতিপয় সদস্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছে, তারা হুজন নামক স্থানে অবস্থান করছে। হুজন

মক্কাশরীফের উচ্চভূমির দিকে অবস্থিত। রসুলে আকরম স. তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য মক্কার বাইরে চলে যান। সঙ্গে নেন হজরত ইবনে মাসউদকে। তাঁরা হুজনের নিম্নভূমির দিকে পৌঁছলেন। রসুলেপাক স. হাতের আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে একটি বৃত্ত আঁকলেন এবং হজরত ইবনে মাসউদকে বললেন, এ বৃত্তের বাইরে যেয়ো না। তারপর তিনি স. নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন। নামাজের মধ্যে তিনি পাঠ করলেন সুরা তোয়াহা। ওই সময় সেখানে বারো হাজার জ্বিন উপস্থিত ছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ছয় হাজার জ্বিনের কথা। নামাজের পর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। উপস্থিত সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। বর্ণিত আছে, ওই সময় জ্বিনেরা যখন তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ চায়, তখন রসুল স. ওই উপত্যকার এক প্রান্তের একটি বৃক্ষকে ইশারায় কাছে ডাকেন। গাছটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। রসুলেপাক স. বলেছেন, জ্বিনেরা সে সময় আমার কাছে তাদের জন্য এবং তাদের পশুদের জন্য খাবার চাইলো। আমি তাদের জন্য হাড় এবং তাদের পশুদের জন্য গোবর নির্ধারণ করলাম। বললাম, তোমরা যখন হাড় হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করবে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা হাড়ের মধ্যে এক ধরনের গোশত তৈরী করে দিবেন। তোমরা তা পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করতে পারবে। আর তোমাদের পশুদের জন্য যখন গোবর গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিবেন এক ধরনের খাদ্যশস্য। উল্লেখ্য, এ কারণেই হাড় ও গোবর দ্বারা এস্তেঞ্জা করার ব্যাপারে শরিয়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

রসুলেপাক স. তখন তায়েফ থেকে সরাসরি মক্কায় প্রবেশ করেননি। তাঁর সঙ্গে তায়েফ ও ছাকীফবাসীরা যে অসদাচরণ করেছিলো, মক্কাবাসীরা তা শুনতে পেয়েছিলো অন্য লোকের মাধ্যমে। অবশ্য অপআচরণ করার জন্য তারাও তৈরী হয়ে ছিলো। রসুলেপাক স. প্রথমে কুরায়েশদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের কাছে নিরাপত্তার প্রস্তাব পাঠাইলেন। কিন্তু কেউই তাঁকে নিরাপত্তা দিতে চাইলো না। অবশেষে মুতঈম ইবনে আদী তাঁকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করলো। ওই অঙ্গীকার পাওয়ায় তিনি স. মক্কায় প্রবেশ করেন। প্রথমে কাবাগৃহে পৌঁছে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তারপর কাবাগৃহের তওয়াফ শেষ করে সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন।

হিজরতের আমন্ত্রণ

নবুওয়াতের একাদশ বৎসরে হজের সময় রসুল স. অবস্থান করেন মিনা প্রান্তরের আকাবা নামক স্থানে। সেখানে তাঁর কাছে আসেন মদীনার উপকণ্ঠবাসী

খাজরাজ গোত্রের কতিপয় লোক। তিনি তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাঁদেরকে কোরআন মজীদ পাঠ করে শোনালেন। বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে রেসালতের দায়িত্ব দিয়েছেন। তোমরা যদি আমার অনুসরণ করো, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে হতে পারবে সৌভাগ্যশালী। তাঁরা মদীনার ইহুদীদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলেন, আখেরী জমানার নবীর আগমনের সময় সন্নিকটবর্তী। সে কথা মনে হতেই তাঁরা রসুল স. এর কথাবার্তা মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা অবলোকন করে বিমোহিত হলেন। বলাবলি করতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! ইনি ওই নবী, যাঁর ব্যাপারে ইহুদীরা আলোচনা করে। সুতরাং তাদের আগেই আমাদের ইমান আনা উচিত। এ ব্যাপারে মদীনায় অন্য কেউ যেনো আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে না পারে। তাঁরা সকলেই মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন মোট ছয় জন।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বৎসরে, অর্থাৎ হিজরতের এক বৎসর পূর্বে মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এর মর্যাদা অধ্যায়ে ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ওই বৎসরেই ফরজ করা হয়। হজরত খাদীজা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে নামাজ পড়তেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা ফরজ নামাজ নয়, বরং অন্য কোনো নামাজ। কেননা পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হয় মেরাজ রজনীতে। আর সাইয়্যেদা খাদীজার ওফাত হয় নবুওয়াতের দশম বৎসরে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরত

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বৎসরে হিজরতের প্রাথমিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, যা ছিলো সকল কল্যাণ ও বরকতের কুঞ্জি।

স্বজাতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রসুলেপাক স. অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এই মর্মে ভাবতে থাকেন যে, হয়তো অন্য কোনো সম্প্রদায় দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আরবের বিভিন্ন জনপদে গমন করতেন। জনতার কোনো সমাবেশ দেখলেই সেখানে উপস্থিত হতেন এবং তাদেরকে মহাকল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতেন। তাঁর মনে হতো সকলেই তাঁর কথা বুঝতে পারছে, কিন্তু সাহস করে এগিয়ে আসতে চাইছে না। যেনো তারা বলতে চায়, আগে আপনার আত্মীয়-স্বজনেরা এগিয়ে আসুক, তাহলে আপনার ব্যাপারে আমাদের আর কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না।

অবস্থা যখন এরকম, তখন বনী আশহাল জনপদের কতিপয় লোক কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়ার জন্য মদীনা থেকে এলো। নবী করীম স. তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। যুবক আয়াস ইবনে মুআজ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! এই ব্যক্তির কাছে সকলে বায়াত গ্রহণ করো। আল্লাহ্র শপথ! এঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। সঙ্গে সঙ্গে আর এক যুবক বলে উঠলো, দ্যাখো ! তাড়াহুড়া করে কিছু কোরো না। কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত। দলের অন্যান্য লোকেরা হতোদ্যম হয়ে গেলো। শেষে তারা কুরায়েশ অথবা নবী করীম স. কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়েই মদীনায় ফিরে গেলো। তবে আয়াস ইবনে মুআজ ওই সময়েই মুসলমান হয়ে গেলেন।

পরের বছর হজের সময় মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আগমন করলো খাজরাজদের একটি দল। রসুলেপাক স. তাদের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি বিশ্বজগতের প্রভুপ্রতিপালক, তিনিই আমাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। অথচ আমার স্বজাতি সত্যপ্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে। তোমরা যদি ইমান আনো এবং দ্বীনের সাহায্যকারী হও, তবে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে। তারা তাঁর বক্তব্য শুনে একে অপরের দিকে তাকালো।

বললো, ইনি তো ওই নবী, যাঁর ব্যাপারে ইহুদীরা আলোচনা করে এবং আমাদেরকে একথা বলে ভীতিপ্রদর্শন করে যে, আখেরী জামানার নবুওয়াতের সূর্য উদিত হবে আজ অথবা আগামীকাল। আমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবো। একজন বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সাবধান হও। ইমানে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করো। হও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সৌভাগ্যধিকারী। ইহুদীরা তোমাদের দিকে শোণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তাঁরা সকলেই বায়াত গ্রহণ করেন। নবী করীম স.কে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিহাসে এই বায়াত দ্বিতীয় আকাবার বায়াত নামে সুবিদিত। কেননা এই বায়াত-শপথ অনুষ্ঠিত হয় মিনা পর্বতে আকাবার নিকটে, যার আর এক নাম জানবাতুল আকাবা। পরবর্তী সময়ে ওই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রেমিক ফকীর-দরবেশরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের ইমানকে সতেজ করেন।

প্রথম আকাবার বায়াত গ্রহণকারী ছিলেন ছয় জন। হজরত আসআদ ইবনে যারারাহ এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁরা মদীনায় পৌঁছেই রসুল স. এর সুখ্যাতি প্রচার করতে থাকেন। ফলে মদীনার বিভিন্ন মজলিস ও বাড়িঘর তাঁর আলোচনায় মুখরিত হতে থাকে। ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আমন্ত্রণ। ঘটনাটি ঘটে নবুওয়াতের একাদশ বৎসরে।

পরের বছর হজের সময় আউস ও খাজরাজ গোত্রের পূর্বোল্লেখিত ছয়জন সহকারে মোট বারোজন মক্কানগরীতে আসেন। এক বর্ণনানুসারে আগমন করেন পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে হজরত উবাদা ইবনে সামেত এবং হজরত উওয়ায়েস ইবনে সায়েদাও ছিলেন। তাঁরাও আকাবার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে হজরত যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স যারকী রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মক্কায় রয়ে যান। পরে তিনি মদীনায় আসেন রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের পর। তাই তাঁকে বলা হয় মুহাজির আনসারী। দলটির আগ্রহে রসুল স. হজরত মাসআব ইবনে ওমায়েরকে তাঁদের সঙ্গে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে তাঁদেরকে কোরআন মজীদ শিক্ষা দিতে থাকেন। জানাতে থাকেন ধর্মের বিভিন্ন বিধান-প্রবিধান। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করতেন। ওই বৎসরই মদীনায় জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

একদিনের ঘটনা ঃ মদীনার এক বাগানে আনসারগণের এক সমাবেশে কোরআন এবং রসুল স. এর বাণীপ্রচার চলছিলো। সাআদ ইবনে মুআজের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে গেলো। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর মামাতো ভাই ছিলেন হজরত আসআদ ইবনে যুরারার। সাআদ ইবনে মুআজ হাতে তীর নিয়ে বাগানের প্রধান ফটকে এসে দাঁড়ালেন। আমীরদের মতো দর্পভরে বলতে লাগলেন, হে মূর্খের

দল! মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করছো কেনো? কে তোমাদেরকে আমার বাগানে আসতে বলেছে। চলে যাও। ফের যদি আসো, তবে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরপর মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। দ্বিতীয় দিন হজরত মাসআব ইবনে ওমায়ের হজরত আসআদ ইবনে যারারাকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত স্থানের কাছাকাছি এক জায়গায় ধর্মসমাবেশ ঘটালেন। তিনি কোরআন পাঠ করছিলেন। এমন সময় সংবাদ পেয়ে সাদ ইবনে মুয়াজ সেখানে উপস্থিত হলেন। কঠোরভাবে শাসালেন তাদেরকে। কিন্তু আগের দিনের মতো তিনি উত্তপ্ত ছিলেন না। হজরত আসআদ ইবনে যুরারা সেটা বুঝতে পেরে তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, হে মাতুলপুত্র! প্রথমে এঁর কথা শোনো। দ্যাখো, তিনি কি বলেন। মন্দ যদি বলেন, তবে তাকে উত্তম কথা শুনিয়ে দাও। আর তিনি যদি কল্যাণের কথা বলেন, শুভ পথের সন্ধান দেন, তবে তুমি তাঁকে মন্দ বলতে যাবে কেনো? তাঁর উপস্থিতিকে তো গণীমত মনে করা উচিত। হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায বললেন, ঠিক আছে। কী বলতে চাও শুনি। হজরত মাসআব ইবনে ওমায়ের পাঠ করলেন 'শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো....' শেষ পর্যন্ত। হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায এমতো বরকতময় বাণী শুনে কাঁপতে শুরু করলেন। তাঁর দেহের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অবশ্য ইমান প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তবুও তাঁর অন্তর ভরপুর হয়ে গেলো ইমানের নূরে। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। তাদেরকে একত্রিত করে সর্বসমক্ষে ইমানের ঘোষণা দিলেন। তাঁর কথা শুনে তাঁর গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল হামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

পরের বৎসর হজরত মাসআব ইবনে ওমায়ের আনসারদের একটি বিরাট দল নিয়ে অন্যান্য মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মক্কা মুকাররমায় রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁর ওই দলে ছিলো আউস ও খাজরাজ গোত্রের পাঁচশত লোক। অপর এক বর্ণনানুসারে তিনশত। তন্মধ্যে সত্তর বা তিয়াত্তরজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। পূর্বাহ্নে পরামর্শ করে গিয়েছিলেন যে, আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলোতে তাঁরা আকাবায় মিলিত হবেন। নির্ধারিত রাতে তাঁরা গোপনে আকাবার নিকটস্থ পাহাড়ে একত্রিত হয়ে রসুলেপাক স. এর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। রসুলেপাক স. তাঁর চাচা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। হজরত আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু রসুল স. এর প্রতি ছিলো তাঁর গভীর ভালোবাসা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি স. উপস্থিত সকলের বায়াত গ্রহণ করলেন। হজরত আব্বাস বললেন, হে দূরাগত জনতা! তোমরা কি জানো, মোহাম্মদ আমাদের মধ্যে কতটুকু সম্মানিত। আমরা সব সময় তাকে নতুন ধর্ম প্রচারের কাজ থেকে

বিরত রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। দ্যাখো, তোমাদেরকেও সে কীভাবে একত্রিত করেছে। এখন যদি তোমরা তার কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও এবং সে অঙ্গীকারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো, তবে তোমরা অবশ্যই হবে কল্যাণাধিকারী। আর যদি অঙ্গীকার রক্ষা করতে না পারো, তবে সেকথা এখনই তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও। অন্যথায় পরবর্তীতে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে। তখন তোমরা হবে শত্রুপক্ষীয়।

আনসারগণের একজন বললেন, হে নেতৃপ্রবর! আপনার কথা আমরা শুনলাম। অনুধাবনও করলাম। তারপর রসুলেপাক স.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং আপনার জন্য আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে চান, করতে পারেন। নবী করীম স. কোরআনুল করীমের কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার হচ্ছে— তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক করবে না। আর আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে— তোমরা ধর্মপ্রচারের কাজে আমাকে সহযোগিতা করবে। আর এ পথে কাফেরদের পক্ষ থেকে যে কোনো বাধা আসুক না কেনো, তোমরা তা প্রতিহত করবে। প্রস্তুত থাকবে জেহাদের জন্য। একাজ থেকে কখনও পশ্চাদপসরণ করবে না। তোমরা আমার সঙ্গে এই মর্মেও অঙ্গীকারবদ্ধ হও যে, আমি যা বলবো, তোমরা তা নির্বিবাদে মেনে নিবে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার নির্দেশ পালন করবে কায়মনোবাক্যে। আল্লাহর পথে উৎসর্গ করবে তোমাদের জীবন ও সম্পদ। প্রচলন ঘটাবে সৎকার্যাবলীর এবং প্রতিবন্ধক হবে সকল অশুভের। সর্বদা সত্য কথা বলবে। তিরস্কারের ভয়ে সত্য থেকে কখনো পিছপা হবে না। সর্বদা সত্যাধিষ্ঠিত থেকে আমাকে সাহায্য করে যাবে। আমি অচিরেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। তখন তোমরা আমাকে রক্ষা করবে এমনভাবে, যেমনভাবে রক্ষা করো তোমাদের জীবন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে। আনসারগণের প্রতিনিধি বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, আমাদের পিতা-পিতামহদের কাজ ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহ। কিন্তু আমাদের এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে অঙ্গীকার রয়েছে। আমরা সে সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করলাম। তবে একটি কথা— এমন যেনো না হয় যে, আপনি বিজয়ী হওয়ার পর আমাদেরকে ফেলে আপনার নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে যাবেন। রসুলেপাক স. মুচকি হেসে বললেন, না । সেরকম হবে না। আমি তোমাদের সাথেই থাকবো। তোমরা আমার দেহ-মনের কাছেই থাকবে। আমিও সারা জীবন দেহ-মন সহকারে তোমাদের সঙ্গে থাকবো। তোমাদের মধ্য থেকেই শেষ করবো আমার ইহলৌকিক জীবন। আমার কবর হবে তোমাদের জনপদে। তোমাদের

গৃহই হবে আমার আবাসস্থল। তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তোমাদের সঙ্গে যারা সন্ধি করবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হবো। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আমরা যদি আপনাকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে আমাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করি, তবে তার পুরস্কার হিসেবে আমরা কী পাবো? তিনি স. বললেন, তোমাদের পুরস্কার হবে 'জান্নাতুন্‌ তাজ্‌রী মিন তাহ্‌তিহাল আনহার' (এমন বেহেশত, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বিনী)। আনন্দে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন,

রাবিহাল বায়উ বিস্‌মিল্লাহি ইয়া রসূলাল্লাহ্‌
উরসুত ইয়াদাকা ফাক্বাদ বাইয়ানাকা।

(এ ব্যাবসা তো খুবই লাভজনক, বিসমিল্লাহ্‌। হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আপনার হস্ত সম্প্রসারিত করুন। আমরা আপনার কাছে আত্মবিক্রয় করছি)। তাঁদের এমতো আত্মবিক্রয়ের বায়াতের দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয় 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা মুমিনদের থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন'। এই বায়াতকে বলা হয় আকাবায়ে কুবরার বায়াত।

জীবনচরিতবিদগণ একে দ্বিতীয় আকাবার বায়াত বলেন। তবে একে তৃতীয় আকাবা নাম দেওয়াই সমীচীন। এ ঘটনা ঘটেছিলো নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বৎসরের জিলহজ মাসে, হিজরতের তিন মাস পূর্বে । তারপর রসুলে আকরম স. মদীনার আসনারগণের মধ্য থেকে বারোজনকে নেতা নির্ধারণ করলেন। এই বারোজন আগে থেকেই ছিলেন মদীনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁদের একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আপনি যদি বলেন, তবে মুশরিকদের পিতৃপৃষ্ঠস্থিত সন্তানদেরকেও আমরা তরবারীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করবো। রসুলেপাক স. বললেন, আমাকে এখনও এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তারপর আনসারগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কৃত অঙ্গীকার পালনে ব্যাপৃত হলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদেশবাহী! আপনি যদি এখনই আমাদের সঙ্গে আমাদের শহরে আপনার পবিত্র পদযুগল স্থাপন করেন, তবে আপনার হুকুমই প্রতিপালিত হবে। আপনি যা বলবেন, আমরা তা জান-প্রাণ দিয়ে পালন করবো। রসুলেপাক স. বললেন, এখনও আমি মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ পাইনি। এখনো হিজরতের স্থান অনির্ধারিত। যখনই নির্দেশ পাবো, তখনই হিজরত করবো। একথা বলে রসুলে আকরম স. আনসারগণকে বিদায় দিলেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর মক্কার কাফেরেরা সবকিছু জানতে পারলো। কিন্তু তাদের আর করার কিছুই রইলো না। তারা আক্ষেপ করতে করতে নিজেদের বুকে আঘাত করতে লাগলো এবং অপদস্থতার সঙ্গে নিজেদের মাথায় ঘষতে লাগলো মাটি।

শুভসমাচার

আনসারগণ চলে যাওয়ার পর রসুলেপাক স. আল্লাহ্‌তায়ালার সাযাদিয়াতের দরবারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, যাতে হিজরতের নির্দেশ ও স্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রথমে যে স্থান তাঁকে দেখানো হয়েছিলো, তার বৈশিষ্ট্য দু'তিনটি জায়গার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিলো। জায়গাগুলো হচ্ছে—বাহরাইন, সিরিয়ার নিকটবর্তী এক স্থান এবং ইয়াছরিব। এই তিনটি অঞ্চলই হেদায়েতের অন্তর্ভূত ছিলো। তারপর আরও অধিক সুস্পষ্ট করে তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকেই এরশাদ করা হলো। প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে এবং পরে সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো বিষয়টির প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব আরোপন। যেমন কোনো প্রিয় অতিথিকে বিভিন্নস্থান দেখানোর পর তাঁকে বলা হয়, এখন তিনি যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারেন। রসুলে আকরম স. এর সঙ্গে এরকমই করা হয়েছিলো। তাঁকে স্বপ্নে কয়েকটি স্থান দেখিয়ে শেষে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয় যে, মদীনা মুনাওয়ারাই তাঁর হিজরতের স্থান। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, মক্কা থেকে খেজুর বাগানময় একটি স্থানের দিকে হিজরত করে যাচ্ছি। মনে হয় স্থানটি ইয়ামামা, না হয় মদীনা। একবার তিনি স. তাঁর সহচরবর্গকে বললেন, আমাকে স্বপ্নে আমার হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এ-ও জানানো হয়েছে যে, আমার হিজরতের স্থান হবে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খেজুর বাগানবিশিষ্ট এক স্থান। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এই বিবরণটি পরিবেশিত হয়েছে। তিনি নিজে কখন যাত্রা করবেন, তা স্পষ্ট করে না বললেও কোনো কোনো সাহাবীকে মদীনার দিকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে অধিকাংশ সাহাবী মদীনায় চলে গেলেন। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব গেলেন তাঁর ভাই জায়েদ ইবনে খাত্তাবকে সঙ্গে নিয়ে। আর হজরত আয়াশ ইবনে রবীআ গেলেন বিশজন প্রধান সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে। আরো হিজরত করলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্‌, ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, জায়েদ ইবনে হারেছা, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ এবং হজরত বেলাল। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলেমগণ বলেছেন, অধিকাংশ সাহাবী গোপনে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব হিজরতে বের হয়েছিলেন প্রকাশ্যে। তিনি তলোয়ার ঝুলিয়ে তীর ধনুক হাতে নিয়ে কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। কুরায়েশরা তখন কাবাগৃহের আঙ্গিনায় বসেছিলো। হজরত ওমর সাতবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করলেন। মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে। বললেন, যারা পাথরের টুকরাকে নিজেদের মাবুদ মনে করে, তারা অতুষ্ট হোক। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তার সন্তানকে এতিম ও স্ত্রীকে বিধবা

বানাতে চায়, সে যেনো আমার সামনে আসে। তাঁর কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। স্থানুর মতো বসে রইলো নিজ নিজ স্থানে। ওই সময় মক্কা শরীফে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত আলী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। জীবনীকারগণ এরকমই লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ওই দু'জন ছাড়াও মক্কায় তখনো ছিলেন দুর্বল ও প্রতাপহীন সাহাবীগণ। সামর্থ্যহীনতার কারণেই তাঁরা হিজরতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁদের উপরেই কুরায়েশরা বেশী অত্যাচার করতো। কোরআন মজীদে তাঁদের দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'হে আল্লাহ! এই জালেমদের জনপদ থেকে আমাদেরকে বের হওয়ার শক্তি দাও'।

হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক সফরের আয়োজন সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে হিজরত করতে চাইলেন। তখন রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, থামো। আমার মনে হয় আল্লাহ্তায়ালা আমাকেও হিজরতের অনুমতি দিবেন। তখন তুমি হবে আমার সঙ্গী। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, তাড়াহুড়া কোরো না। আমার মনে হয়, আল্লাহ্তায়ালা এ সফরে কাউকে আমার সাথী বানাবেন। তারপর থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রসুল স.এর হিজরতের সাথী হওয়ার অভিলাষ অন্তরে পোষণ করতে থাকেন।

মক্কার মুশরিকেরা দেখলো মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ইসলামের প্রসার ঘটছে মক্কার বাইরেও। আর মক্কার মুসলমানেরাও বেশীর ভাগ মদীনায় পাড়ি জমিয়েছে, তখন তারা বুঝতে পারলো, রসুলে আকরম স.ও শীঘ্রই মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন। আবু জেহেল হয়ে উঠলো হিংসান্মোত্ত। সীমালংঘনের পথে পা বাড়ালো সে। শয়তানের দলও অবতীর্ণ হলো তার সহযোগীর ভূমিকায়। পরামর্শসভায় মিলিত হলো তারা। সেই সভায় মালাউন ইবলিস স্বয়ং উপস্থিত হলো নজদী শায়েখের রূপ ধরে। তাদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বললো। কেউ বললো, সে চলে গেলেই আপদ চুকে যায়। কেউ বললো, না, তাকে বন্দী করা উচিত। আবার কেউ কেউ বললো, তাকে হত্যা করাই উত্তম। এ সম্পর্কে কোরআনুল করীমে বলা হয়েছে 'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন কাফেরেরা তোমার ব্যাপারে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিলো, তোমাকে বন্দী করবে, অথবা হত্যা করবে, কিংবা দেশান্তরী করবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী'।

আবু জেহেল পরিকল্পনা করলো, পাঁচটি গোত্র থেকে পাঁচজন লোক একত্রিত হবে। তারা একসঙ্গে আক্রমণ করে রসুল স.কে হত্যা করবে। বনী হাশেম গোত্র পাঁচটি গোত্রের বিরুদ্ধে রক্তের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে না। শায়েখ নজদীরূপী ইবলিস আবু জেহেলের এই অপসিদ্ধান্তকেই সমর্থন করলো। রসুলেপাক স.কে সবকিছু জানানো হলো। তিনি স. গোপনে মক্কা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

হিজরত হচ্ছে আম্বিয়া কেরামের সুন্নত। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে রসুলেপাক স. এর হিজরতের অনুমতি এসেছিলো এই আয়াতের মাধ্যমে 'ওয়া কুর রব্বি আদ্ খিলনী মুদ্খালা সিদ্বক্বিওঁ ওয়া আখ্‌রিজ্নী মুখরাজ্বা সিদ্বক্বিওঁ ওয়াজ্‌আ'ল্ লী মিল্লা দুনকা সুলত্বনান নাসীরা' (আর প্রার্থনা করো, হে প্রভুপালনকর্তা! আমাকে পরিশুদ্ধতার সঙ্গে প্রবেশ করাও এবং শুদ্ধতার সঙ্গে বের করে নাও। আর আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে প্রদান করো বিজয়দীপ্ত সাহায্য)। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন জিবরাইল হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে হিজরত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। বর্ণিত আছে, তখন আবু বকর সিদ্দীক একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা উদ্ধার করেছিলেন। ওই ব্যাখ্যা ফলেও ছিলো। ব্যাখ্যাটি ছিলো, রসুলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করবেন। সেখানেই তাঁর মহাপ্রয়ান ঘটবে। আর তাঁকে সমাহিত করা হবে সেখানেই।

'রওজাতুল আহ্বাব' গ্রন্থে স্বপ্নটির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল আকরম স. ঠিক করলেন, অতি প্রত্যুষে তিনি যাত্রা করবেন। সন্ধ্যায় হজরত আলীকে ডেকে বললেন, আজ রাতে আমার ঘরে শুয়ে থেকো, যাতে তারা মনে করে আমি আমার ঘরেই শুয়ে আছি।

কুরায়েশদের কিছু আমানত রসুল স. এর নিকট গচ্ছিত ছিলো। তিনি স. সেগুলো হজরত আলীকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, আমি চলে যাওয়ার পর আমানতগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ো। উল্লেখ্য, সুষ্ঠু আমানতদারীর কারণে তাঁর শত্রুমিত্র সকলে তাঁকে বলতো 'আল আমীন'। হজরত আলী রসুল স. এর শয্যায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। এভাবে তিনি হলেন আল্লাহ্র রসুলের মহব্বতে জীবন উৎসর্গকারী। রসুল স. এর জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন 'এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে' এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে।

আত্মত্যাগের বিষয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত আলীর মধ্যে অগ্রগামী কে— সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। হজরত আলী বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন রসুল স. এর শয্যাস্থলাভিষিক্ত হয়ে। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক বীরত্ব দেখিয়েছিলেন রসুল স. এর একান্ত সঙ্গ গ্রহণ করে নিজেকে সম্ভাব্য মহাবিপদের মুখে তুলে দিয়ে। এভাবে তাঁরা দু'জনেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন মহাসংকটের মুখে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই সময় রসুলেপাক স. এর বিছানায় শয়ন করা ছিলো সবচেয়ে দুঃসাহসিকতার কাজ। কেননা ওই সময় শত্রুরা রসুল স.কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার উত্তোলন করে ঘরের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলো। সুতরাং হজরত আলীর বিপদ ছিলো সুনিশ্চিত। কিন্তু হজরত আবু বকর বিপদের দিকে পা বাড়ালেও তাঁর বিপদ তত্তুল্য সুনিশ্চিত ছিলো

না। একদল আলেম এর জবাবে বলেন, আবু তালিবের সন্তানের উপর হামলা করার ক্ষমতা কুরায়েশরা রাখতো না। কারণ আবু তালিব ছিলেন তাদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি। তারাও তাঁকে নেতা বলে মানতো। 'রওজাতুল আহ্বাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. তখন হজরত আলীকে বলেছিলেন, হে আলী! মনকে সুদৃঢ় রাখো। কাফেরেরা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

হজরত আলী স্বয়ং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বীরত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছেন, আমার বীরত্ব হচ্ছে— যুদ্ধ ক্ষেত্রের বীরত্বের ন্যায়, যেখানে উভয় পক্ষেরই মৃত্যুভয় থাকে। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ছিলো কুরায়েশদের হাতে বন্দী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তারা ছিলো তখন পাগল কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত। অথচ তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেননি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যাহোক, হজরত আলী রসুলেপাক স. এর চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রসুল স. চলে গেলেন বাইরে। আল্লাহ্তায়ালা কুরায়েশদের দৃষ্টিশক্তি রহিত করে দিলেন। তাই কেউ তাঁকে দেখতে পেলো না। গমনকালে তিনি স. সুরা ইয়াসীন 'ফাহুম লা ইউবসিরূন' পর্যন্ত পাঠ করে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁক দিয়ে ওই মাটি কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন 'ওয়া ইযা ক্বরআতাল কুরআনা জ্বাআ'লনা বাইনাকা ওয়া বাইনাল্ লাজীনা লা ইউ'মিনূনা বিল আখিরাতি হিজ্বাবাম্ মাস্তূরা' এই আয়াত পড়ে তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন। এরকম বিবৃতি দিয়েছেন ইবনে হাতেম এবং হাকেম বলেছেন, বিবৃতিটি বিশুদ্ধ। পুরো বিবৃতিটি এরকম— ওই মাটি যাদের মাথায় পড়েছিলো তারা সকলেই নিহত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। মালাউন আবু জেহেল রসুলে আকরম স. এর দিকে ইশারা করে বিদ্রূপ করে বলতো, এ তো বলে, আমরা তার ধর্মের অনুসারী হলে আরব ও আজমের কর্তৃত্ব লাভ করবো এবং জান্নাত পাবো। আর তা না করলে দুনিয়াতেই আমরা তার হাতে মারা পড়বো এবং আখেরাতে যাবো জাহান্নামে। তখন রসুল আকরম স. বলতেন, হ্যাঁ, আমি তো তাই বলি। এরকমই হবে। তুমি অবশ্যই হবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূত। আমাকে এরকমই সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

রসুল স. বেরিয়ে যাওয়ার পর একলোক এসে তাদেরকে দণ্ডায়মান থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখানে কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছো? তারা বললো, সকাল হওয়ার অপেক্ষায় আছি। ভোরে গাত্রোত্থান করার সাথে সাথে আমরা মোহাম্মদকে হত্যা করবো। লোকটি বললো, তোমাদের অমঙ্গল হোক। দেখলে না, তোমাদের সামনে দিয়ে কে বেরিয়ে গেলো? আবু জেহেল ও তার সঙ্গী-সাথীরা লজ্জিত হলো। সকাল হলে তারা হজরত আলীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার মনীব কোথায়? হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্তায়ালাই

তাঁর রসুলের অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন। বর্ণিত আছে, রসুল স. মক্কা মুয়াযযমা থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে হেরেম শরীফের যারওয়া নামক স্থানে দাঁড়িয়ে মক্কার মাটিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে মৃত্তিকা! তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল মাটি অপেক্ষা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। তোমার অধিবাসীরা আমাকে বাধ্য না করলে আমি অন্যত্র গমন করতাম না। মদীনা শরীফের চেয়ে মক্কা মুকাররমা উত্তম বলে যারা দাবী করেন, এই হাদিসটি তাঁদের পক্ষের দলিল। অপর দল দাবী করেন, মদীনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁর প্রিয় হাবীবকে সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী বানিয়েছেন। সেখানেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন। দিয়েছেন বিজয়। আমি এ সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করেছি আমার 'যজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহ্‌বুব' গ্রন্থে। উভয়পক্ষের দলিলসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করে আমি মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলতকেই সেখানে প্রাধান্য প্রদান করতে বাধ্য হয়েছি। বিষয়টি সেখানেই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

রসুলেপাক স. প্রথমে গেলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়িতে। এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেন, একদিন দুপুরে অত্যন্ত গরমের কারণে আমি আমার পিতা আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে ঘরেই বসেছিলাম। এমন সময় রসুল স. চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। এমন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সাধারণত ঘর থেকে বের হয় না। তাঁকে দেখে আমার পিতা বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এ সময় আপনার আসার কারণ কী? আপনি তো কখনও এমন সময় কোথাও বের হন না। রসুলেপাক স. বললেন, ঘরের মধ্যে যারা আছে, তাদেরকে বের করে দাও। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, ঘরে তো আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। রসুলেপাক স. হিজরতের কথা বললেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আবু বকর কি আপনার খেদমতে থাকতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে রয়েছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি তখন আমার সম্মানিত পিতাকে কাঁদতে দেখলাম। এর আগে আমি জানতাম না যে, আনন্দেও মানুষ কাঁদে। প্রকাশ থাকে যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন কেবল আনন্দে কেঁদেছিলেন, হজরত আয়েশা সিদ্দীকার এমত ধারণা হয়তো সর্বাংশে সঠিক নয়। জন্মভূমি পরিত্যাগ, দুর্গমযাত্রায় রসুল স. এর ভয়ানক কষ্ট হবে— এসব চিন্তাও তাঁর ওই কান্নার কারণ হওয়া সম্ভব। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত আবু বকর সিদ্দীকের উট ছিলো দু'টি। তিনি ও দু'টো খরিদ করেছিলেন চারশ' দিরহাম দিয়ে। অপর বর্ণনানুসারে উট দু'টোর ক্রয়মূল্য ছিলো আটশ' দিরহাম। চারমাস ধরে ভালো করে খাইয়ে উট দু'টোকে হৃষ্টপুষ্ট করে

তুলেছিলেন তিনি। দু'টি উটকেই তিনি রসুল স. এর খেদমতে পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু উট দু'টোর মূল্য গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাঁকে দিলেন ন'শ দিরহাম। ইতোপূর্বে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইসলামের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাই রসুল স. চাইলেন না যে, তাঁর খরচ আরও বদ্ধি পাক। তাছাড়া হিজরতের মতো মহান কর্মে অন্যের অর্থসাহায্য গ্রহণ করাও তাঁর মনঃপুত ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন 'প্রভুপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করো না'। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে রসুল স.কে বহনকারী উটটির নাম ছিলো কাসওয়া। অপর এক বর্ণনা মতে জাদআ। উট ক্রয় করার পর বনী দায়েল গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইবনে উরায়কাতকে পথপ্রদর্শক হিসাবে বেতনভুক্ত করে সঙ্গে নিলেন রসুলেপাক স.। আবদুল্লাহ্ ছিলো বিশ্বস্ত এবং পথপ্রদর্শনকর্মে দক্ষ। কিন্তু সে মুসলমান ছিলো না। ইমাম নববী বলেছেন, তার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করেছিলেন বায়াতে আকাবার দু'মাস কয়েকদিন পর। কেউ কেউ বলেছেন, আড়াই মাস পর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিন মাস বা তার কাছাকাছি সময়ের পর। রবিউল আউয়াল মাসের বৃহস্পতিবারে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সে দিন ছিলো সোমবার। বর্ণনাদুটির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যেতে পারে এভাবে— মক্কা থেকে বের হওয়ার দিন ছিলো বৃহস্পতিবার, আর সওর পর্বতের গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার দিন ছিলো সোমবার। অথবা মক্কা থেকে রওয়ানা দেওয়ার দিন ছিলো সোমবার এবং সওর গুহা থেকে যাত্রার দিন ছিলো বৃহস্পতিবার। এধরনের ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যদের বর্ণনার অনুকূল। যেমন বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী। উল্লেখ্য, হিজরতের প্রকৃত পরিকল্পনার কথা জানতেন কেবল রসুলেপাক স., হজরত আবু বকর, হজরত আলী এবং আবদুল্লাহ্।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেন, আমরা অতি দ্রুত সফরের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে দিলাম। আমাদের হাতের কাছে রশি জাতীয় কিছু ছিলো না। আমার বোন আসমা তার কোমরবন্দ খুলে দিলো। তাই দিয়ে মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা করা হলো। অপর টুকরাটি সে পুনরায় কোমরে পরিধান করলো। এ কারণে তাকে বলা হতো যাতুন নেতাকাইন। আবদুল্লাহ্কে বলা হলো, দিনের বেলা তুমি কুরায়েশদের সঙ্গে মিলে মিশে থেকো। আর তাদের গতিবিধির সংবাদ নিয়ে রাতের বেলা উপস্থিত হয়ো সওর পর্বতের গুহায়। রসুল স. এর জীবনালেখ্য রচয়িতাগণ এক বর্ণনায় বলেছেন, হজরত আবু বকর পাঁচ হাজার দিরহাম জমা করে রেখেছিলেন। যাত্রাকালে মুদ্রাগুলো তিনি সঙ্গে করে নেন। চলার পথে তিনি কখনও রসুলেপাক স. এর সামনে আবার কখনও পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। বর্ণিত আছে, বন্ধুর পথ চলতে চলতে রসুলেপাক স. এর পবিত্র পদযুগল রক্তাক্ত

হয়ে গেলো। তখন হজরত আবু বকর তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে সওর পর্বতের গুহামুখ পর্যন্ত পৌঁছলেন। ভিতরে কোনো বিপদ উপস্থিত হতে পারে ভেবে তিনিই প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন গুহাগাত্রে রয়েছে অনেক ফাঁক-ফোকর। তিনি তখন তাঁর চাদরখানা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে টুকরাগুলো দিয়ে ফাঁক- ফোকরগুলো বন্ধ করে দিলেন। একটি ফোকর বন্ধ করতে পারলেন না। তাই সেটির মুখে স্থাপন করলেন তাঁর পায়ের গোড়ালী। এরপর রসুল স.কে সেখানে প্রবেশ করতে বললেন। শ্রান্ত রসুল গুহার ভিতরে প্রবেশ করে হজরত আবু বকরের উরুদেশের উপর মাথা রেখে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সাপ অথবা বিচ্ছু হজরত আবু বকরের পায়ের গোড়ালীতে দংশন করতে লাগলো। বিষের যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেন তিনি। তবুও রসুল স. এর বিশ্রামে ব্যাঘাত হবে ভেবে এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না। মুখে উচ্চারণ করলেন না যন্ত্রণাপ্রকাশক কোনো শব্দ। কিন্তু আপনাআপনি এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর। তিনি স. জাগ্রত হলেন। বললেন, আবু বকর! চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গী। আল্লাহ্তায়ালা শান্তি বর্ষণ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক আরাম বোধ করলেন। সর্প অথবা বৃশ্চিক তার কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। হজরত আবু বকর পরে এক সময় বলেছেন, গুহামধ্যে রসুল স.এর দিকে তাকাতেই দেখলাম, তাঁর চরণযুগল রক্তরঞ্জিত। আমি কেঁদে ফেললাম। জীবনে কখনও তিনি এতো কষ্ট পাননি।

আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গ বলেন, হজরত মুসা পথ চলতে চলতে যখন তাঁর পায়ের দিকে দেখলেন রক্ত ঝরছে, তখন বললেন 'তারা কক্ষণও সফলকাম হবে না। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রভুপালনকর্তা। তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন'। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন কুরায়েশদের আক্রমণাশংকা করলেন, তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন, চিন্তা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সঙ্গী। নবী মুসা প্রথম দৃষ্টিপাত করেছিলেন নিজের দিকে। তারপর আল্লাহ্তায়ালার প্রভুপালকত্বের দিকে। তাঁর অবস্থা ওই ব্যক্তির অনুরূপ, যিনি বলেন 'আমি কোনোকিছুই দেখিনি, কিন্তু পরবর্তীতে আমি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছি'। আর রসুলেপাক স. এর প্রথম দৃষ্টি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াতের দিকে। তারপর নিজের দিকে। সুতরাং তাঁর অবস্থা ওই ব্যক্তির ন্যায় বলেন যিনি 'আমি কোনোকিছুই দেখিনি, কিন্তু প্রথমেই দেখেছি আল্লাহ্তায়ালাকে'। এরূপ দর্শন অধিকতর পূর্ণ ও পরিণত। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আছে, কোনো কোনো আরেফ বলেছেন, হজরত মুসা বনী ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন 'ইন্না মায়ী' রাব্বী' (আমার সঙ্গে আছেন আমার রব)। আর আমাদের নবী হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বলেছিলেন 'ইন্নাল্লাহা মাআ'না' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গী)। এভাবে হজরত মুসা তাঁর প্রভুপালকের

সঙ্গতাকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু আমাদের নবী আল্লাহ্‌তায়ালার নূরের মুশাহাদার সঙ্গে হজরত আবু বকর সিদ্দীককেও শামিল করে নিয়েছিলেন। তাই তখন হজরত আবু বকরেরও আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য হাসিল হয়েছিলো। তাঁর উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়েছিলো। হজরত আবু বকর সরাসরি আল্লাহ্‌র তাজাল্লী দর্শন করলে স্থির থাকতে পারতেন না। অতএব বুঝতে হবে হজরত মুসার মুশাহাদা (আত্মিক দর্শন) এবং আমাদের নবীর মুশাহাদা পৃথক প্রকৃতির।

বান্দা মিসকীন (গ্রন্থকার) বলেন, হজরত মুসা আল্লাহ্‌র দীদার কামনার সময়ও এরকম করেছিলেন। বলেছিলেন 'আরিনী আনযুর ইলাইকা' (আমাকে দর্শন দাও আমি তোমাকে দেখি)। আর আমাদের নবী দোয়া করেছেন 'আরিনা হাকায়িকাল আশ্‌ইয়া কামা হিয়া' (আমাদেরকে বস্তুসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করাও)। এই দোয়ায় আমাকে না বলে বলেছেন আমাদেরকে। এভাবে তাঁর উম্মতকেও তাঁর দোয়ার অন্তর্ভূত করেছেন। বক্তব্যকে করেছেন পরোক্ষ। বস্তু সমূহের হাকীকত দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এরকম বলেননি যে, 'আরিনী যাতাকা' (আপনার সত্তার দর্শন দান করুন)। এভাবে আদবের পরিপূর্ণতার দিকে এবং মারেফতের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, হাকীকতের হাকীকত তো স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালাই। রসুলেপাক স. যখন সওর গহ্বরে প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা গহ্বরমুখে একটি বাবলা গাছ উৎপন্ন করলেন। তাঁরই ইশারায় একজোড়া জংলী কবুতর এসে গাছটির ডালে বাসা তৈরী করলো। ডিম পাড়লো। একটি মাকড়শা এসে গহ্বরের মুখে তৈরী করলো জাল। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে আছে, মক্কার হেরেমের কবুতরগুলিও সেই জাতের কবুতর। রসুলেপাক স. এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বংশ রক্ষা করবেন। কেউ তাদেরকে বধ করবে না। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন, মাকড়শা এরকম জাল প্রথম বানিয়েছিলো হজরত দাউদের জন্য। পরে বানায় আমাদের নবীর জন্য।

বোখারী শরীফে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন কাফেরেরা আমাদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলো। একেবারে গুহামুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো তারা। তাদের মধ্যে কেউ নিচের দিকে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারতো। রসুলেপাক স. বললেন, হে আবু বকর! ওই দু'জনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ্? তারপর কাফেরেরা ফিরে গেলো। বলতে বলতে গেলো, মোহাম্মদ এই গুহায় ঢুকলে কবুতরের ডিম তো আর আস্ত থাকতো না। মাকড়শার জালও ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। আর গাছটিও তো দেখছি আমাদের জন্মের পূর্বের । এক বর্ণনায় আছে, তাদের একজন বললো, আমার পিতারও পূর্ব থেকে গাছটি এখানে আছে। এরকম

কথা বলাবলির পরও তাদের সন্দেহ ঘুঁচলো না। আমাদের পায়ের চিহ্ন দেখে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ এখান দিয়েই চলে গিয়েছে। হয়তো বা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের সন্ধান পেলোই না। এটা ছিলো রসুল স. এর মহান মোজেজা।

সওর পাহাড়ের গহ্বরে রসুলে পাক স. ছিলেন তিন রাত। কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী বারো রাত। বর্ণনাদু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনার্থে বলা যেতে পারে, তিনি স. সোমবার গিরিগহ্বরে প্রবেশ করেছিলেন, আর সেখান থেকে বের হয়েছিলেন বৃহস্পতিবার। এই বৃহস্পতিবার যদি সোমবারের পরের বৃহস্পাতিবার হয় তাহলে সেখানে তিনি ছিলেন তিন দিন। আর যদি এই বৃহস্পতি বার হয় পরের সপ্তাহেব বৃহস্পতিবার, তাহলে হয় বারো অথবা তেরো দিন। ওয়াল্লহু আ'লাম। তবে তিন দিনের বর্ণনাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আবদুল্লাহ্ সারাদিনের সংবাদ রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছে দিতো রাতের বেলায়। আর হজরত আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রা দিনের বেলায় আশেপাশে বকরী চরাতেন। আর রাত হলে বকরীর দুধ পৌঁছে দিতেন গুহাভ্যন্তরে। ওই দুধই ছিলো তাঁদের রাতের আহার। লেখকের ধারণা, ওই গুহায় হয়তো অন্য কোনো প্রবেশপথ ছিলো, যেদিকে কেবল কোনোকিছু প্রবেশ করানো যায়, সশরীরে প্রবেশ করা যায় না। গেলেও বের হওয়া যায় না। কেননা গুহাটির প্রধান প্রবেশ পথে ছিলো মাকড়শার জাল ও কবুতরের ডিম ভরা বাসা। তার উপর সেখানে ছিলো একটি বাবলা বৃক্ষও। এখন প্রশ্ন— অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে তাঁদের ওজু এস্তেঞ্জার ব্যবস্থা হতো কীভাবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ওই কর্ম দু'টোও তখন নিশ্চয় সম্পন্ন হতো মোজেজার মাধ্যমে। ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুলে আকরম স. এর বের হওয়ার সময় জিবরাইল তাঁর পাখার আঘাতে গুহার মুখ প্রশস্ত করে দিতেন। হাদিসবেত্তাগণ অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। তাই বর্ণনাটি দোষযুক্ত হওয়াও সম্ভবপর।

এই গ্রন্থের লেখক সওর পর্বত স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি বলছেন, আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বিরাট দেহবিশিষ্ট লোক। তার সীনাও ছিলো খুব প্রশস্ত। আমি বললাম, প্রথমে তুমি গুহায় প্রবেশ করো। সে 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে আনায়াসে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লো। আমার মুখ থেকে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হলো— আল্লাহ্ আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্। এক সময় মহান নিদর্শনরাজি দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হাবীবকে আরশে আলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার এমনও করলেন যে, কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রবেশ করালেন গিরিগহ্বরে। আমার তো মনে হয়, এই দুই দর্শনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুই দর্শনই সমপ্রকৃতির দর্শন। এদের মধ্যে কোনো

বিভাজনই পরিলক্ষিত হয় না। পার্থক্য থাকতে পারে কেবল গুণাবলীর তাজাল্লি দর্শনের মধ্যে। মূল দর্শন তো একই। ওয়াল্লহু আ'লাম। সেখানে আমরা রাত যাপন করলাম। এর কিছুদিন পর রসুলেপাক স. এর স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের যিয়ারতে গেলাম। সেখানে আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অজস্র দোয়া দরুদ পেশ করার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করেছিলাম।

মদীনা অভিমুখে

সওর পাহাড়ের গুহায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হলো। শেষ রাতের ভোরে দু'টি উট নিয়ে উপস্থিত হলো চুক্তিবদ্ধ পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্। হজরত আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রাও এসে হাজির হলেন। রসুলে পাক স. কাসওয়া নামক উটটির উপর আরোহণ করলেন। হজরত আবু বকর বসলেন পশ্চাতে। অপর উটটির উপর আরোহণ করলেন আবদুল্লাহ্ এবং আমের। তারপর যাত্রা শুরু হলো সমুদ্রোপকূলের পথে। সারা দিন সারা রাত একটানা পথ চললেন তাঁরা। পরের দিন সূর্য যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে গেলো, তখন হজরত আবু বকর রসুল স. এর বিশ্রামের জন্য ছায়াময় স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলেন। থামলেন একটি প্রকাণ্ড পাথরের ছায়ায়। স্থানটি পরিষ্কার করে সঙ্গে নেওয়া চামড়ার বিছানাটি বিছিয়ে দিলেন। বালিশও ছিলো তার সঙ্গে।

রসুল স. শয্যায় শয়ন করার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এক বকরীর রাখালকে দেখতে পেয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক তার দিকে এগিয়ে গেলেন। দুধ চাইতেই সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করে তার সাথে পানি মিশিয়ে পান করতে দিলো। তাজা উষ্ণ দুধ এভাবে পানি মিশিয়ে পান করাই ছিলো আরবদের রীতি। হজরত আবু বকর দুধপান করার পর রসুলেপাক স.কে ঘুম থেকে জাগলেন। আরেক পেয়ালা দুধ চেয়ে নিয়ে তাঁকেও পান করালেন। তারপর আবার পথ চলতে শুরু করলেন। আলেমগণ একটি বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করেন, মালিক ছাড়া কেবল রাখালের অনুমতিতে দুগ্ধগ্রহণ করা কি হজরত আবু বকরের জন্য বৈধ ছিলো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আরবদের নিয়ম ছিলো, মালিক তার রাখালকে এ ধরনের অনুমতি দিয়েই দিতো। বলে দিতো মুসাফির ব্যক্তি দুধ চাইলে তাকে বিমুখ কোরো না। এরকমও হতে পারে যে, হজরত আবু বকর ওই বকরীর মালিককে চিনতেন এবং একথাও জানতেন যে, মালিক এ ঘটনা জানতে পারলে খুবই আনন্দিত হবে। আবার রাখালের কাছ থেকে তিনি দুধ ক্রয় করে নিয়েছিলেন এবং রাখালটিও ছিলো দুধবিক্রির অনুমতিপ্রাপ্ত —এরকম হওয়াও তো সম্ভব। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, ব্যর্থমনোরথ ও বিক্ষুব্ধ কুরায়েশদের একটি দল আমার কাছে এলো। অভিশপ্ত আবু জেহেলও ছিলো

তাদের মধ্যে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না, তিনি কোথায়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে গালি দিলো এবং আমার গালে বসিয়ে দিলো একটি চড়। ফলে আমার কানের অলংকার ভেঙে পড়ে গেলো।

পথিমধ্যে হিজরতকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো উম্মে মা'বাদ আতেকা বিনতে খালেদ খাযায়ীর। কাদীদ নামক স্থানের তাঁবুবাসিনী ওই বৃদ্ধা ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং অতিথিবৎসলা। তাঁবুর দরজায় বসে তিনি মুসাফিরদের মেহমানদারী করতেন। রসুলে পাক স. সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে খেজুর, দুধ ও গোশত চাইলেন। কিন্তু তিনি ওগুলোর কোনোটাই দিতে পারলেন না। বললেন, বড়ই অনটনের ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে আমাদেরকে। আমার কাছে যে এখন কিছুই নেই। রসুলেপাক স. তার তাঁবুর দিকে তাকালেন। দেখলেন, তাঁবুর এক কোনে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণশীর্ণ একটি বকরী। দুর্বল হওয়ার কারণে বকরীটি মাঠে চরতে যেতেও পারেনি। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, এ বকরীর স্তনে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বললেন, না। এতো হাড় জির জিরে ছাগীর স্তনে কি দুধ থাকে? রসুল স. বললেন, অনুমতি যদি দাও, তবে আমি বকরীটি দোহন করতে পারি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রসুলেপাক স. বকরীর পা দু'টি একত্রিত করে তার স্তনের উপরে তাঁর পবিত্র হাত বোলালেন। তারপর 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠের পর বললেন 'আল্লাহুম্মা বারিক লাহা ফী শাতিহা' (হে আল্লাহ তাকে এবং তার বকরীর মধ্যে বরকত দাও)। বকরীর স্তন দুধে ভরে গেলো এবং তার পা দু'টি হয়ে গেলো পৃথক। রসুলেপাক স. দুধদোহন করার জন্য উম্মে মা'বাদের কাছ থেকে একটি পাত্র চেয়ে নিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাত্রটি দুধে ভরে গেলো। তাঁবুর সকল লোককে পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুধ পান করালেন রসুলেপাক স.। তারপর পান করালেন সঙ্গী-সাথীদেরকে। নিজে পান করলেন সকলের শেষে। তারপর পুনরায় দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। এভাবে তাঁবুর সকল পাত্র দুধে ভরপুর করে দিলেন। জীবনীকারগণ বলেন, রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাতের স্পর্শধন্য হয়ে ওই বকরীটি আঠারো বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলো। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতকালে দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। ওই দুর্ভিক্ষে মারা পড়েছিলো অনেক পশু-পাখি। তখনও ওই বকরিটি সকাল-সন্ধ্যা দুধ দিতো। বকরীটি মারা যায় দুর্ভিক্ষের পরে।

উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ, যার আসল নাম আকতাম ইবনে হুন, তিনি ওই দিন মাঠে বকরী চরানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে সকল পাত্র দুধে ভর্তি দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে মা'বাদ! এতো দুধ কোত্থেকে এলো। আমাদের দুধের বকরী দু'টো তো ছিলো মাঠে।

উম্মে মা'বাদ বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের ঘরে একজন বরকতময় ব্যক্তির শুভাগমন ঘটেছিলো, যাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ এরকম— একথা বলে তিনি রসুলেপাক স. এর কথাবার্তা, আচরণ ও দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিলেন। আবু মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি তো তাহলে ওই লোক, যার অন্বেষণে কুরায়েশরা মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর নাম ও যশোবার্তা তো এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আহা, আমি উপস্থিত থাকলে তাঁর সেবা করে ধন্য হতে পারতাম। তবে আমি দৃঢ় আশা রাখি, তাঁর সাথে একদিন আমি মিলিত হতে পারবো। অন্তর্ভূত হতে পারবো তাঁর দলের। বর্ণিত আছে, তিনি ও তার স্ত্রী উম্মে মা'বাদ মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের গৃহে রসুলেপাক স. এর শুভাগমনের তারিখটি সব সময় মনে রাখতেন।

একটি উটনী থেকেও রসুলেপাক স. এভাবে দুধ দোহন করেছিলেন। ওই উটনীর স্তন থেকেও প্রচুর দুধ নিঃসৃত হয়েছিলো। হিজরতের সময় আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সারাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুমের ঘটনাটি তার অন্যতম। কুরায়েশরা ঘোষণা দিয়েছিলো, যদি কেউ মোহাম্মদ ও তার সাথী আবু বকরকে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারে, তবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। দুঃসাহসী সারাকা একাজ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হলো। তার নিজ মুখের বর্ণনা— আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁদের পিছু পিছু ধাওয়া করলাম। এক পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম তাঁদের একেবারে কাছে। হঠাৎ আমার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সেটিকে তুলে পুনরায় তার উপর আরোহণ করলাম। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো বার বার। আমি রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের দুটি পা মাটিতে দেবে গেলো। আমিও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম মাটিতে। ঘোড়াকে আঘাত করতে লাগলাম। কিন্তু ঘোড়া পা ওঠাতে পারলো না। এক পর্যায়ে আমি রসুল স. এর খুব কাছে পৌঁছে গেলাম। তখন আমার ও তাঁর মধ্যে ব্যবধান ছিলো দু'টি তীরের ব্যবধানের সমান। তিনি স. আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং পাঠ করলেন 'আল্লাহুম্মাকফিনা শাররাহু বিমা শি'তা' (হে আল্লাহ্! এর ক্ষতি থেকে যেরকমভাবে তোমার ইচ্ছা সেরকমভাবে আমাকে হেফাজত করো)। একথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ঘোড়ার চারটি পা মাটিতে দেবে গেলো। আমি বললাম, হে মোহাম্মদ! আমার ঘোড়াকে মুক্তি দিন। আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি ওয়াদা করছি, কেউ আপনার ক্ষতি করতে এলে আমি তাকে প্রতিহত করবো। রসুল স. দোয়া করলেন 'আল্লাহুম্মা ইন কানা সদিক্বান ফাত্লিক ফারাসাহু' (হে আল্লাহ্! সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার ঘোড়াকে মুক্ত করে দাও)। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার চারটি পা মাটি থেকে বেরিয়ে

এলো। আমি রসুল স. এর কাছে কিছু পণ্যসামগ্রী হাদিয়াস্বরূপ উপস্থিত করলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, এসবের প্রয়োজন আমার নেই। তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না। শুধু বলি, আমার বিষয়টিকে তুমি গোপন রেখো। উল্লেখ্য, সারাকা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কাবিজয়ের সময়। ওই সময় তাঁর সম্প্রদায়েরও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। কথিত আছে, সারাকা নিকটবর্তী হলে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে তো আমাদেরকে ধরেই ফেললো। রসুলেপাক স. বলেছিলেন 'লা তাহ্‌যান ইন্নাল্লাহা মাআ'না' (ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমাদের সাথী)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তখন দোয়া করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাকার ঘোড়ার পা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। সারাকা বলেন, তখনই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, রসুল স. অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আমি তখনই কিছু সামগ্রী নজরানা হিসাবে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি।

আবু বুরায়দা আসলামী এবং আবু সুলায়মান খাত্তাবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন আবু বুরায়দা আসলামী তাঁর কবীলার সত্তর জন লোক নিয়ে রসুলেপাক স.কে বন্দী করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। কুরায়েশরা ঘোষণা দিয়েছিলো, তাঁকে ধরে দিতে পারলে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সে ঘোষণা শুনেই তিনি বের হয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম বুরায়দা। বারদুন অর্থ ঠাণ্ডা, রসুল স. তাই হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, ক্বদ বারাদা আমরুনা ওয়া সালাহা (আমাদের কাজ ঠাণ্ডা এবং মঙ্গলময় হবে)। তারপর বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? তিনি বললেন, বনী আসলাম গোত্রের। তিনি স. বললেন, সালামা (কল্যাণ ও শান্তি)। বনী আসলামের কোন শাখার লোক তুমি? তিনি বললেন, বনী সাহাম। রসুল স. বললেন, আসাবতা সাহমাকা (তুমি তোমার অংশ লাভ করেছো) অর্থাৎ তুমি লাভ করেছো ইসলাম। আবু বুরায়দা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? রসুলেপাক স. বললেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুল। আমি তাঁর নাম শোনা মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আরো বলেন, আমার সঙ্গে যারা ছিলো, তারাও মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মদীনায় প্রবেশের সময় আপনার সঙ্গে একটি ঝাণ্ডা থাকা উচিত। এ কথা বলেই আমি আমার মাথার পাগড়ি খুলে তীরের সঙ্গে বেঁধে ঝাণ্ডা উড়িয়ে রসুল করীম স. এর আগে আগে চলতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি মদীনায় পৌঁছে কোন ভাগ্যবানের বাড়িতে পদধূলি দান করবেন? আমি কামনা করছিলাম, তিনি যদি আমার গৃহের অতিথি হতেন। রসুলেপাক স. বললেন,

আমার উটটি যে স্থানে বসে যাবে, সেই স্থানই হবে আমার অবস্থানস্থল। দেখা যাক সে কোথায় থামে। ওই সময় কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে ফিরছিলো। তারা সেখানে রসুল স. এর আগমনের কথা শুনে যাত্রাবিরতি করলো। তারা রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকরকে হাদিয়া হিসেবে দিলো একজোড়া শুভ্রবস্ত্র।

মদীনায়

রসুলেপাক স. এর মদীনায় হিজরতের সংবাদ পাওয়ার দিন থেকে প্রতি দিন ভোরে আনসারগণ নগরপ্রান্তের উঁচু টিলায় উঠে তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে সূর্য যখন উত্তপ্ত হয়ে যেতো, তখন তাঁরা ফিরে আসতেন স্বগৃহে। একদিন এক ইহুদী দূর থেকে হঠাৎ রসুলেপাক স. এর কাফেলা দেখতে পেলো। দেখামাত্রই সে আনসারদেরকে ডেকে বলতে লাগলো, এসে গেছেন। তোমাদের কাঙ্খিতজন এসে গেছেন। একথা শোনা মাত্রই মুসলমানগণ আপন আপন হাতিয়ার নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে সরওয়ারে আলম স.কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন। সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগলো— মারহাবান আহ্লান সাহ্লান। আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়লেন সকলে। আনসারদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলতে লাগলেন— জাআ রসুলুল্লাহ্, জাআ নাবীউল্লাহ্ (আল্লাহ্র রসুল এসেছেন, আল্লাহ্র নবী এসেছেন)। আনন্দে নৃত্য শুরু করলেন সবাই। বর্ণিত আছে, বনী নাজ্জার গোত্রের ছোটো ছোটো মেয়েরা রসুলেপাক স. এর শুভাগমনে আনন্দ প্রকাশ করে দফ বাজিয়ে কাসীদা পাঠ করছিলো এভাবে— নাহনু জাওয়ারিন মিম্ বানী নাজ্জার — ইয়া হাব্বাযা মুহাম্মাদান মিন যার (আমরা বনী নাজ্জার গোত্রের বালিকা। কতোইনা উত্তম হলো, হে মোহাম্মদ! আপনি আমাদের প্রতিবেশী হলেন)। এক দিক দিয়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বনী নাজ্জার গোত্রের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। তাঁর মহাসম্মানিতা মাতা ছিলেন ওই গোত্রের কন্যা। তাই তারা তাঁকে প্রতিবেশী বলে সম্বোধন করেছিলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো? তারা বললো, হ্যাঁ। হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা সকলেই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি স. বললেন, আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি। আনসারদের গৃহবাসী রমণীগণ আপন আপন বাড়ির ছাদে এবং দরজায় দাঁড়িয়ে আনন্দসঙ্গীত গাইলেন— 'তলাআ'ল বাদরু আ'লাইনা মিন ছানিইয়াতিল ওয়াদায়ী' — ওয়া যাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা মাদাআ' লিল্লাহি দায়ী'

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তাঁরা তখন গাইছিলেন— আইইয়াতু হাল মাবউ'ছু ফীনা — বিল আমরিল মুত্বাআ' (আনুগত্য করা যায় এমন নির্দেশ নিয়ে

আমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন আপনি, হে মাহনুভব!) হজরত আনাস বলেছেন, ওই সময় আমার বয়স ছিলো আট অথবা নয় বৎসর। তখন রসুলেপাক স. এর সম্মানে মদীনায় ঘরবাড়ি এমনভাবে আলোকিত হয়েছিলো যে, মনে হচ্ছিলো এখন বুঝি দিন। এরপব নবুওয়াতের সূর্য যখন অস্তমিত হয়, তখন মনে হয়েছিলো, যেনো সারা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন।

রসুলেপাক স. মদীনা মুনাওয়ারায় পদার্পন করেন ১২ অথবা ১৩ই রবিউল আউয়ালে। এ মতানৈক্য ঘটেছে চন্দ্র দেখার মতানৈক্যের ভিত্তিতে। ইমাম নববী 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবের উদ্বৃতি অনুসারে তাঁর কিতাব 'সিয়ারে' বারোই রবিউল আউয়ালের উপর জোর দিয়েছেন। তারিখ নিয়ে আরও কতিপয় মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু সেগুলো বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। রসুলেপাক স. মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন ২৭ শে সফরে। আর সওর পর্বতের গুহা থেকে বের হয়েছিলেন, পহেলা রবিউল আউয়ালে। ভ্রমণের বিবরণ এতোটুকুই। এ পর্যন্ত সকলেই একমত। তিনি মদীনায় পৌঁছেন সোমবারে। এই বারের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সোমবারের ফযীলত সম্বন্ধে বলা হয়েছে— রসুলে পাক স. এর জন্ম হয়েছিলো সোমবারে। নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিন, মক্কা থেকে হিজরতের দিন, মদীনায় পদার্পন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণও হয়েছিলো সোমবারেই। অধিকাংশ জীবনচরিত রচয়িতাদের মতে ইসলামী সন অর্থাৎ চন্দ্র মাসের হিসাব চালু হয়েছিলো মদীনা শরীফে রসুলেপাক স. এর আগমনের পর, তাঁরই নির্দেশানুসারে। তবে সাধারণের মধ্যে একথাও সুবিদিত যে, হিজরী সন গণনা এবং তা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন হজরত ওমর ফারুক। তাঁর খেলাফতকালে হজরত আলীর ঐকমত্য গ্রহণের পর মহররম মাস থেকে তা চালু করা হয়েছিলো।

রসুলে আকরম স. মদীনায় পৌঁছে বনী আমর ইবনে আউফের এর বাড়িতে ওঠেন। পরবর্তীতে এখানেই মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনদিন পব হজরত আলী এখানে এসে রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত আলী মক্কা থেকে মদীনায় পায়ে হেটে পৌঁছেন। ফলে তাঁর পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। রসুলেপাক স. ফোস্কাগুলিতে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষত নিরাময় হয়ে যায়। খায়বরের যুদ্ধের দিনও এরকম হয়েছিলো। হজরত আলীর চোখ উঠেছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর মুখের পবিত্র লালা তাঁর চোখে মালিশ করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গিয়েছিলো তাঁর চোখের রোগ। পরবর্তী জীবনে আর কখনও তাঁর চোখে রোগ হয়নি।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. মদীনায় পৌঁছার পর একটি গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। তিনি তখন ছিলেন চুপচাপ। হজরত আবু বকর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ক্রমে ক্রমে ভীড় বাড়তে লাগলো। কোনো কোনো আনসার ইতোপূর্বে তাঁকে দেখেননি। তারা ধারণা করলেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীকই

তাঁদের নবী। তাঁরা এসে তাঁকেই সালাম করে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। সূর্য তখন মধ্যগগনে। হজরত আবু বকর দেখলেন, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রসুল স. এর শরীরে রোদ এসে পড়ছে। তিনি তাঁর চাদর প্রসারিত করে রসুল স. এর মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করলেন। মানুষ তখন বুঝতে পারলো, নবী কে? তাঁদের ভুল ধারণা দূর হয়ে গেলো। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেছেন, এই ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুলে আকরম স. এর উপরে তখন মেঘ মালা বা ফেরেশতারা ছায়া বিস্তার করেনি। এরকম ছায়া বিস্তারের ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে। এক বর্ণনামতে রসুলেপাক স. ওই স্থানে অবস্থান করেছিলেন বিশদিন। আরেক বর্ণনানুসারে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহঃস্পতিবার— এই চার দিন। প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। যাহোক, শুক্রবার সূর্য যখন উঁচুতে উঠে গেলো, তখন তিনি বাতনে ওয়াদী অতিক্রম করে ওই স্থানে চলে গেলেন, যেখানে তৈরী করা হয়েছিলো একটি ছোট মসজিদ। সেখানে তিনি জুমার নামাজ পড়ালেন এবং নামাজের পূর্বে দিলেন এক দীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ। ওই ভাষণ শুনে ইমানদারদের অন্তরে নূরের জোয়ার এসেছিলো। নামাজ শেষে আবার তিনি নিজের বাহনের উপর আরোহণ করলেন এবং মদীনার ভিতরের দিকে অত্যন্ত প্রশান্ত মনে যাত্রা করলেন। মদীনাবাসীরা তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন পায়ে হেঁটে, কেউ কেউ বাহনারোহী হয়ে। আমর ইবনে আউফ গোত্রের লোকজন, যারা কোবার বাসিন্দা ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, সম্ভবত এ স্থানে রসুল স. এর কষ্ট হচ্ছে, তাই তিনি অন্যত্র গমন করছেন। রসুলেপাক স. তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আমাকে আকালাতুল কুরায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আকালাতুল কুরা, আকালাতুল বুলদান এগুলো ছিলো মদীনার অন্যতম নাম। যেমন মক্কার নাম ছিলো উম্মুল কুরা।

কাসওয়া তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। অনুগামী জনতা মনে মনে আশা করতে থাকেন, যদি আল্লাহ্‌র রসুল স. দয়া করে তাদের অতিথি হন। কেউ কেউ এই কথা মুখ ফুটে বলতেও থাকেন। রসুলেপাক স. তাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া খায়ের করে বলেন, আমার এই উষ্ট্রী নির্দেশ প্রাপ্ত। সে যে স্থানে অবতরণ করবে, সেই স্থানই হবে আমার অবস্থানস্থল। কাসওয়া তার আপন মনে চলতে লাগলো। শেষে গিয়ে থামলো ওই স্থানে, যেখানে এখন রয়েছে মসজিদে নববী। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতো, সে সময় রসুলেপাক স. এর উপর সেই অবস্থার প্রাধান্য দেখা গেলো। উষ্ট্রীটি উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পুনরায় পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়লো। তার এরূপ যাওয়া এবং আসা ছিলো মসজিদে নববীর সীমানা চিহ্নিতকরণ। ওই স্থান থেকে হজরত আবু আইয়্যুব আনসারীর ঘরের দরজা ছিলো খুবই নিকটে। তিনি রসুলেপাক স. এর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র উটনীর

পিঠ থেকে নামিয়ে তাঁর দৃষ্টির সামনে রাখলেন। হয়তো তিনি এরকম করেছিলেন, রসুল স. এর ইশারা পেয়ে। আল্লাহ্‌তায়ালাই ভালো জানেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। তারপর সে আসবাবপত্র তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে ওঠালেন। রসুলেপাক স. বললেন, ব্যক্তির স্থান ওখানেই, যেখানে তার আসবাবপত্র থাকে। এভাবে হজরত আবু আইয়্যুব হলেন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। 'জালিকা ফাদ্বলুল্লাহি ইউতীহি মাই ইয়াশা'।

হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী বলেন, রসুলেপাক স. আমার বাড়িতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। বাড়ীটি ছিলো দোতালা। তিনি স. নিচের একটি প্রকোষ্ঠ পছন্দ করলেন। উপর তলায় থাকতো আমার মা ও আমার সন্তান-সন্ততিরা। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক, আমার পরিবার-পরিজন উপর তলায় বসবাস করবে, বিষয়টি আমার জন্য বিশেষ বিব্রতকর। কিন্তু তিনি স. তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বললেন, আমাদের জন্য নিচের ঘরটিই অধিকতর উত্তম। আমার সঙ্গে অহরহ লোকেরা সাক্ষাত করতে আসবে। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার-পরিজন নিয়ে উপরেই থাকো। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে রসুলেপাক স. হজরত আবু আইয়্যুব আনসারীর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন সাতমাস। তবে এর কম-বেশীর বর্ণনাও পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রকার ঃ হিজরতের বৎসর থেকে ওফাতের বৎসর

রসুলেপাক স. মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন দশ বৎসর। জীবনীকারগণ উক্ত দশ বৎসরের ঘটনাবলীর বৎসরওয়ারী বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য কিছু কিছু ঘটনার নির্দিষ্ট বৎসর সম্পর্কে মতভেদও রয়েছে। আবার আলেমগণ কোনো কোনো ঘটনার বৎসরের অগ্র-পশ্চাৎও ঘটিয়েছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে 'বৎসর' শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। 'মাআরেজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বৎসর ভাগ করে ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর, তৃতীয় বৎসর ইত্যাদি।

হিজরী প্রথম বৎসরের ঘটনাবলী ঃ মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা

রসুলেপাক স. মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম কোবা নামক স্থানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বনী আমর ইবনে আউফের বাড়িতে অবতরণের পর তিনি স. হজরত আলী ব্যতীত অন্য তিনজন খলীফাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। হজরত আলী তখনও মদীনায় এসে পৌঁছেননি। তিনি পৌঁছেছিলেন তিনদিন পর। পরে সম্ভবত তিনি ওই মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। এখানেই রসুল স. সর্বপ্রথম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করেছিলেন। জীবনচরিতরচয়িতাগণ বলেছেন, এটাই প্রথম মসজিদ, যা মুসলমানদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো।

এর পূর্বে অন্য মসজিদ নির্মিত হলেও তা ছিলো নির্মাতার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। যেমন হজরত আবু বকর সিদ্দীক হিজরতের পূর্বে তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তিনি নামাজ পড়তেন, কোরআন পাঠ করতেন। কুরায়েশদের শিশু ও নারী এবং ক্রীতদাসেরা তাঁর কোরআন পাঠ শোনার জন্য সেখানে জড়ো হতো। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে মসজিদে কোবার মাহাত্ম্য প্রকাশার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে 'লা মাস্জিদুন উস্সিসা আ'লাত্ তাক্ওয়া মিন আওওয়ালি ইয়াওমিন আহাক্কু আন তাকুমা ফীহি- ফীহি রিজালুন ইউহিব্বূনা আই ইয়াতত্বহ্হারূন ওয়াল্লহু ইউহিব্বুল মুত্বত্বহ্হিরীন'। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে মসজিদে নববীর কথা। এই অভিমতটির সমর্থনে কিছুসংখ্যক হাদিসও পাওয়া যায়। তবে প্রকৃত কথা এই যে, এই আয়াতের মধ্যে যে ভাব রয়েছে তা উভয় মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেননা উভয় মসজিদই নির্মিত হয়েছিলো তাকওয়ার উপর। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত আবু হুরায়রা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের একটি দল একবার রসুল স. এর কাছে এলেন। তিনি স. তাঁদেরকে বললেন, মসজিদে তাকওয়ার দিকে যাও। তারপর তিনি স. নিজেও হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের কাঁধে হাত রেখে ওই মসজিদের দিকে গেলেন। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় 'মাস্জিদুন উস্সিসা আ'লাত্তাক্বওয়া' দ্বারা মসজিদে কোবাকেই বুঝানো হয়েছে। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন, প্রথমদিন থেকেই তাকওয়ার উপর যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে মসজিদে কোবা। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন 'এই মসজিদে এমন লোকজন আছে, যারা পবিত্রতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা কামনাকারীদেরকে পছন্দ করেন'। এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওজু করে মসজিদে কোবায় এসে নামাজ পাঠ করে, সে পায় একটি ওমরা পালনের সওয়াব। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, এই মসজিদ যদি পৃথিবীর এক প্রান্তেও থাকে, তবে আমি আমার উটের কলিজার পানি পান করে হলেও সেখানে পৌছবো। তিনি নিজ হাতে এই মসজিদ ঝাড়ু দিতেন, তার ধূলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার করতেন। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, এ মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করা আমার কাছে বায়তুল মুকাদ্দাস দু'বার জিয়ারত করার চেয়েও বেশী পছন্দনীয়। এ মসজিদে কী পরিমাণ দুর্লভ রহস্য রয়েছে তা যদি মানুষ জানতো, তাহলে তারা এর দিকে দৌড়ে আসতো এবং এর রহস্য অনুসন্ধান করতো। বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় হজরত আবু হুরায়রা থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে কোবার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে এরকম আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ

এ বৎসরের অন্যতম ঘটনা হচ্ছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ। তিনি ইহুদীদের ধর্মযাজক ছিলেন। ছিলেন নবী ইউসুফের বংশধর। তিনি স্বয়ং বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন মানুষ তাঁর মজলিসে যোগদান করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে লাগলো। একদিন আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। রসুলেপাক স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর যখন দৃষ্টি করলাম, তখনই বুঝলাম, এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তারপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম 'উফশুস্ সালাম' (তোমরা সালাম প্রসারিত করো)। অর্থাৎ পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দাও। অথবা এতোটুকু আওয়াজে সালাম দাও, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, সালাম দেওয়া হয়েছে। রসুলেপাক স. আরও বললেন 'আত্ইমুত্ত্বয়াম' (আহার করাও)। তার মানে নিঃস্বদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করো, অভাবীদের প্রতি সদয় হও। আরও বললেন 'ওয়া সিলুল্ আরহাম' (নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকো)। কেননা তারা তোমাদের নিকটজন। তাদেরকে পরিত্যাগ কোরো না। তারপর বললেন 'ওয়া সল্লু বিল্লাইলি ওয়ান্ নাসু ইয়ানাম' (রাতে নামাজ পড়ো, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে)। এটাই ছিলো রসুল স. এর আগমনের পর সর্বপ্রথম বক্তৃতা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন, তারপর আমি ঘরে ফিরে এলাম। পরে তাঁর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, যার উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না। প্রথম প্রশ্নটি ছিলো— কিয়ামতের আলামত কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন— আল্লাহ্তায়ালা জান্নাতীদেরকে প্রথম খেতে দিবেন কী? তৃতীয় প্রশ্ন— সন্তান কখনো তার পিতার আকৃতি পায়, আবার কখনো আকৃতি পায় মায়ের, এর কারণ কী? রসুলেপাক স. এর উপর ওহী নাযিল হলো। তিনি স. বললেন, পূর্ব দিক থেকে একটি অগ্নি বের হবে, যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে, যেমন বকরীর রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় তার বকরীর পালকে। তারপর বললেন, জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম খেতে দেওয়া হবে ওই মাছের কলিজা, যার পিঠের উপর রয়েছে পৃথিবী। ওই খাদ্য হবে অত্যন্ত স্বাদ এবং তৃপ্তিদায়ক। হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অপার শক্তিমত্তার মাধ্যমে সেইদিন মৃত্তিকাকে বানিয়ে দিবেন শুভ্র রুটি। তারপর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি স. বললেন, পিতা-মাতার বীর্য থেকে যার বীর্য গর্ভাশয়ে বেশী প্রবেশ করে সন্তান পায় তারই আকৃতি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন, তিনটি প্রশ্নের যথাউত্তর পেয়ে আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ্'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! ইহুদীরা মিথ্যা বলতে এবং অপবাদ

রটনা করতে সিদ্ধহস্ত। তারা আমাকে আলেম ও সরদার হিসাবে গণ্য করে। বলে, আমি তাদের সরদার, সরদারের সন্তান। তারা মনে করে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম, সবচেয়ে বড় আলেমের সন্তান। অথচ তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেলে আমার নামে অপবাদ রটনা করবে। সুতরাং আমি চাই আপনি তাদেরকে পরীক্ষা করার আগে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবেন না। তাদেরকে ডেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুন, তারা কী বলে। রসুলে আকরম স. আমাকে আড়ালে যেতে বলে ইহুদীদেরকে ডাকলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া যে আর কোনো মাবুদ নেই, সে কথা তোমরা ভালো করেই জানো। তওরাত কিতাবে তোমরা একথা পাঠ করেছো। আর শোনো, আমি আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সত্য ধর্মসহকারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। ইহুদীরা বললো, আপনি যে আল্লাহ্‌র রসূল, তা আমরা কীভাবে বুঝবো? তিনি স. বললেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা বললো, তিনি আমাদের সরদার। আমাদের সরদারের সন্তান। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম, সবচেয়ে বড় আলেমের সন্তান। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান। রসুলেপাক স. বললেন, তিনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে তোমরা কী বলবে? তারা বললো, আল্লাহ্ তাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করুন। রসুলেপাক স. পুনরায় একই কথা বলতে লাগলেন। আর তারাও একই জবাব দিতে লাগলো। শেষে তিনি স. বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বেরিয়ে এসো। আমি কলেমা শাহাদত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলাম। বললাম, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মোহাম্মদ মুস্তফার উপর ইমান আনো। তোমরা তো জানোই যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। তারা বললো, তুমি মিথ্যা বলছো। আমরা জানি না। তুমি আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি, নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান। তুমি মূর্খতম, মূর্খতম ব্যক্তির সন্তান।

প্রথম প্রথম আনসারগণের দেখাদেখি ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ রসুল স. এর প্রতি অনুরাগ দেখাতে শুরু করেছিলো। আবার কেউ কেউ শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। হুয়াই ইবনে আখতাব এবং তার ভাই ইয়াসির ইবনে আখতাব ছিলো তাদের অগ্রণী। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ অবলম্বন করলো কুটকৌশলের পথ। ওই সকল মুনাফিকের উদ্দেশ্য ছিলো বাহ্যিক আনুগত্য দেখিয়ে জান-মালের হেফাজত করা। আউস ও খাজরাজ গোত্রেরও কেউ কেউ হলো তাদের কৌটিল্যানুগামী। অবশ্য অধিকাংশ মুনাফিক ছিলো ইহুদীদের মধ্য থেকেই। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছিলেন মহাসৌভাগ্যশালী। তাঁরা সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর রেসালতের হাকীকত জানতেন। তাই তাঁরা

কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে প্রথম পর্যায়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ সকল ইহুদীই রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে জানতো। তওরাত কিতাবে তারা সর্বশেষ নবীর কথা বার বার পাঠ করতো। তাঁর জন্য যুগ যুগ ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষাও করে যাচ্ছিলো তারা। তাদের পিতৃপুরুষদের বংশানুক্রমিক অসিয়তও ছিলো রসুল স. সম্পর্কে। পবিত্র কোরআনে সে কথা বলা হয়েছে এভাবে— 'তারা তাঁকে এমনভাবে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে'।

আহলে বাইতকে আনার ব্যবস্থা

এ বৎসর রসুলেপাক স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা এবং আপন ক্রীতদাস আবু রাফেকে পাঁচশো দিরহাম ও দু'টি উট দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তারা যথাসময়ে হজরত ফাতেমা, উম্মে কুলসুম, সাওদা বিনতে যামআ, উসামা ও তাঁর মা এবং উম্মে আয়মানকে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে এলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর এবং তাঁর পরিবার পরিজনও ওই দলের সঙ্গে মদীনায় চলে আসেন।

মসজিদ নির্মাণ

এ বৎসরই মদীনা শরীফে মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়। এখন মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফ যে জায়গায়, ঠিক সেই জায়গাতেই রসুল স. এর উট বসে পড়েছিলো। পুনরায় দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার আগের স্থানে এসে বসেছিলো। এভাবে সে সীমানা নির্দেশ করেছিলো মসজিদের। রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে নবী মুসার আরীশের ছাদবিশিষ্ট ঘরের মতো একটি আরীশ নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার উচ্চতা হবে অনধিক সাত হাত এবং সে ঘরের ছাদ বানাতে হবে পাথর ও খেজুর পাতা দিয়ে। আল হাদিস।

মসজিদে নববী নির্মাণ করার পূর্বে যেখানেই নামাজের ওয়াক্ত হতো, সেখানেই তিনি স. নামাজ সমাধা করতেন। যে স্থানটিতে মসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়, সেখানে বনী নাজ্জার গোত্রের কয়েকটি ঘর ছিলো। তার সামনে ছিলো খালি ময়দান। রসুলেপাক স. বললেন, হে নাজ্জার গোত্র! তোমরা এই জমিটুকুর মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা মূল্য চাই না। এর বিনিময়ে অন্য কোনো জমিও চাই না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্তায়ালা যদি তার বিনিময় দেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, এ জমির মালিক কে? তারা বললো, দু'জন এতিম। তারা এখানে খেজুর শুকায়। নবী করীম স. বললেন, জায়গাটি তাদের কাছ থেকে কিনে নাও। বনী নাজ্জার গোত্রের লোকেরা বললো, তাই করবো। তাদের থেকে কিনে নিয়ে আমরা এ জমি সম্প্রদান করবো আপনাকে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তখন এতিমদ্বয় বললো, আমরা মূল্য নিবো না।

দান করবো। কিন্তু রসুলেপাক স. তাদের কথায় সম্মত হলেন না। হজরত আবু বকরকে জমির মূল্য বাবদ দশ মিছকাল স্বর্ণ পরিশোধ করতে বললেন। তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি দুর্লভ শ্রেণীর বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. মসজিদের সামনের বাড়ির মালিক জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তোমার এই জমিটুকু ওই ঘরের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও, যে ঘর আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে দান করবেন বেহেশতে। তুমি একথায় সম্মত হলে আমি মসজিদটি প্রশস্ত করতে পারি। ওই আনসারীর আর কোনো সম্পদ ছিলো না বিধায় তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি সন্তান-সন্ততিধারী। বিনামূল্যে জমিটি প্রদানের সামর্থ্য আমার নেই। হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান তখন তাঁকে ওই জমিটুকুর মূল্য বাবদ দশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করলেন। পরে তা অর্পণ করলেন রসুল স.কে। স্থানটিতে ছিলো খেজুর বাগানের ছোট টিলা এবং মুশরিকদের কিছুসংখ্যক কবর। রসুলেপাক স. হুকুম দিলেন খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলো। টিলাও সমতল করে নাও, আর কবরগুলি মাটিতে মিশিয়ে দাও। এ থেকে বুঝা যায়, কোনো জায়গায় মসজিদ নির্মাণের স্থলে কবরস্তান থাকলে, তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ মসজিদের জন্য কবরস্তানকে সমতল বানানো জায়েয। তারপর সাহাবীগণকে বললেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য ইট পাথর জমা করতে থাকো। এখনও (এই গ্রন্থ রচনাকালে) ইট পাথর জমা করার জায়গাটির চিহ্ন বিদ্যমান। জায়গাটি জান্নাতুলবাকীর দিকে অবস্থিত।

মসজিদে নববীর দেয়াল বানানো হয় শুকনো ঘাস দিয়ে। ছাদ খেজুর পাতা দিয়ে। আর স্তম্ভ বানানো হয় খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে। তখন মসজিদে নববীর অবস্থা এরকম ছিলো যে, বৃষ্টি হলে ছাদ ভেদ করে পানি পড়তো। ফলে মেঝে ভিজে যেতো। কাদাও হতো। সেজদা করতে হতো ওই কাদার উপরেই। নির্মাণকর্ম চলার সময় সাহাবীগণ প্রত্যেকেই একটি একটি করে পাথর বয়ে আনতেন। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার পাথর বয়ে আনতেন দু'টি করে এবং বলতেন, একটি পাথর আমার পক্ষ থেকে, আর আরেকটি রসুল স. এর পক্ষ থেকে। আর রসুলেপাক স. বলতেন, সকলে পাবে একগুণ সওয়াব, আম্মার পাবে দ্বিগুণ। তিনি স. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসারকে বলেছিলেন, শেষ জীবনে তোমার খাদ্য হবে দুধ, আর ইসলামের শত্রুরা তোমাকে শহীদ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুল স. বলেছিলেন, ধর্মদ্রোহীদেরকে তুমি বেহেশতের দিকে আহ্বান করবে, আর তারা তোমাকে ডাকবে দোজখের দিকে।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. সাহাবীগণের সঙ্গে মিলে পাথর বহন করে আনতেন। আর পাথরের ধূলাবালি তাঁর পবিত্র পেটে লেগে যেতো। সাহাবীগণ রসুলেপাক স.কে পাথর বহন করতে দেখে আরো বেশী অনুপ্রাণিত হতেন।

আবেগপ্রবণ হয়ে তাঁরা সমস্বরে গাইতেন— 'লাইন কৃআদনা ওয়ান্ নাবিয়্যু ইয়া'মালু যাকা, ইযান আল আমালুল্ মুদাল্লালু' (আমরা বসে থাকবো আর আমাদের নবী কাজ করবেন, তা কি হয়? আমরা তো তা হলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো)। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে আরো উৎসাহ প্রদানার্থে বলতেন 'আল্লাহুম্মা লা খইরা ইল্লা খইরাল আখিরাহ; ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ্' (হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া যে কল্যাণ নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে দয়া করো)। এক বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. নিজের কাপড়ে করে পাথর বহন করে এনেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন এই কবিতাটি— 'হাযাল হাম্মালু লা হাম্মালু খইরা হাজা, আবাররু ইন্দা রব্বিনা ওয়া আত্বহারু' (এই যে বহনকারী, অবশ্যই এ বহনকারী মঙ্গলাধিকারী, আমাদের প্রভুপালকের নিকট অতি পুণ্যবান, অতি পবিত্র)। তাছাড়া 'আল্লাহুম্মা লা খইরা ইল্লা খইরাল আখিরাহ্, ফারহামিল আনসারু ওয়াল মুহাজিরাহ' এই কবিতাটিও সুরেলা কণ্ঠে গেয়েছিলেন তিনি স.। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' পুস্তকে এসেছে, ইবনে শিহাব জুহুরী বর্ণনা করেছেন, রসুল করীম স. এর কণ্ঠ থেকে এই কবিতা ছাড়া আর কোনো কবিতা বা ছন্দবদ্ধ বাক্য শোনা যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স. নিজে কবিতা রচনা করতেন না। কচিৎ কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন মাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় উত্তর-দক্ষিণ প্রস্থ ছিলো চৌয়ান্ন হাত এবং পূর্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্য ছিলো ষাট হাত। হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে খায়বরের যুদ্ধের পর মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। তখন উভয় দিকেই একশ একশ হাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে এর আয়তন কাঠামো এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতেই থাকে। 'তারিখে মদীনা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্মাণের সময় মসজিদে নববীর কেবলা ছিলো বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে। পরবর্তীতে কেবলা করা হয় মসজিদে হারামের দিকে। তখন মসজিদে নববীতে মেহরাব ছিলো না। মেহরাব সংযোজিত হয় ওমর ইবনে আবদুল আযীযের দ্বারা। তখন তিনি ওলীদ ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে মদীনার প্রশাসক ছিলেন। তিনিই মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করেছিলেন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আছে, মসজিদে নববীর অলিন্দে এক স্থানে ছাউনি দেওয়া ছিলো। গৃহপরিজনবিবর্জিত সর্বহারা সাহাবীগণ সেখানে বাস করতেন। স্থানটিকে বলা হতো সুফ্ফা। তাই সেখানে যাঁরা থাকতেন, তাঁদেরকে বলা হয় আস্হাবে সুফ্ফা। রসুলেপাক স. রাতে তাঁদেরকে নিজের কাছে ডেকে বসাতেন। অর্পণ করতেন বিত্তবান সাহাবীগণের দায়িত্বে। তাঁরা তাঁদের মেহমানদারী করতেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা বলেছেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার এমন সত্তুর জন লোককে দেখেছি, যাঁদের একটি

পরিধেয় বস্ত্র-কম্বল ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। তাঁরা পরিধেয় বস্ত্রটি পরিধান করতেন তাঁদের গলায় বেঁধে। আর সে বস্ত্রের প্রান্ত পৌঁছতো তাঁদের হাঁটুর নিচ পর্যন্ত, আবার কারও পায়ের গিরা পর্যন্ত। সেজদা করার সময় তাঁরা তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র এক হাতে চেপে ধরে সেজদায় যেতেন, যাতে আবরণীয় স্থান অনাবৃত হয়ে না পড়ে। হজরত আবু হুরায়রার এই বর্ণনাটি দৃষ্টে অনুমিত হয়, আসহাবে সুফ্‌ফার সংখ্যা সত্তরের অধিক ছিলো। হাদিস শরীফে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, এক সময় আসহাবে সুফ্‌ফার সংখ্যা চারশ' পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। বিভিন্ন কারণে এ সংখ্যা কখনো কমতো, কখনো বাড়তো। এরকম হওয়ার কারণ ছিলো মৃত্যু, বিবাহশাদী ইত্যাদি। হজরত আবু হুরায়রার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই বিরে মাউনার যুদ্ধে সত্তর জন আসহাবে সুফ্‌ফা সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। কোনো কোনো পুস্তক থেকে এরকম তথ্যও পাওয়া যায় যে, সুফ্‌ফা বলা হয় মসজিদে নববীর ওই অংশকে, যা সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছিলো। আর কেবলা পরিবর্তনের পর যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তা ছিলো বিপরীত দিকে। মসজিদের দেয়াল পূর্ব অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে মসজিদে মিম্বর ছিলো না। তখন রসুলেপাক স. মসজিদের ভিতরে খেজুর গাছের একটি কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বর বানানোর পর তিনি স. মিম্বরের উপরে বসতেন। যখন খেজুরের কাণ্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়, তখন রসুল স. এর বিরহে সে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে আছে, ঘটনাটি ঘটেছিলো অষ্টম বা সপ্তম হিজরীতে। কোনো কোনো জীবনালেখ্য প্রণেতা বলেছেন, কাঠের মিম্বর স্থাপন করার পূর্বে রসুলেপাক স. মেঝের উপরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কিন্তু বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তখন তিনি স. খুতবা দিতেন খেজুরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। রসুলেপাক স. মসজিদে নববীর পাশে কাঁচা ইটের কয়েকটি কামরা বানিয়েছিলেন। আর খেজুরের ডাল-পাতা দিয়ে বানিয়েছিলেন কামরাগুলোর ছাদ। তখন তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন কেবল হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হজরত সাওদা। তাঁরা থাকতেন পাশাপাশি দু'টি ভিন্ন কামরায়। হজরত আবু আইয়্যুব আনসারীর বাড়ি থেকে এখানে আসার পর হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কামরাতেই রসুলেপাক স. তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন।

হজরত আয়েশার সঙ্গে বাসর যাপন

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার সঙ্গে রসুলেপাক স. এর বাসর অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হিজরতের প্রথম বৎসরে নয় মাস পর, শাওয়াল মাসে। নবুওয়াতপ্রাপ্তির বৎসরের হিসাবে দশম বৎসরে তিনি স. হজরত আয়েশা এবং হজরত সাওদাকে বিবাহ করেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বয়স ছিলো তখন ছয় বৎসর। তিনি স্বয়ং বলেছেন, মদীনায় এসে আমার শ্রদ্ধেয় জনক আবু বকর সিদ্দীক অবস্থান করেন

সাখ ইবনে হাবীব ইবনে লিয়াফ, অথবা খারেজা ইবনে জায়েদ নামক মহল্লায়। যে দিন আমি রসুলেপাক স. এর গৃহে আসি, সেদিন তাঁর কাছে সমবেত হন কতিপয় আনসার পুরুষ ও রমণী। আমার পিতা আমার চুলে চিরুনী করে সিঁথি কেটে দিলেন। আমার মুখ ধৌত করে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন রসুলুল্লাহ্‌র কাছে। যেহেতু সে সময় আমার দম ফুলে উঠছিলো; তাই তিনি কিছু বিলম্বে আমাকে নিয়ে তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। দেখলাম, তিনি খাটের উপর বসে আছেন। আমার আম্মাজান আমাকে তাঁর উরুদেশের উপর বসিয়ে দিলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এই নিন আপনার জীবনসঙ্গিনী। আল্লাহ্‌তায়ালা তার মধ্যে আপনার ওসিলায় এবং আপনার মধ্যে তার ওসিলায় বরকত দান করুন। তারপর সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আর তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করলেন। তখন তিনি উট বা বকরী জবেহ করে বিবাহভোজের আয়োজন করেননি। ঘরে রক্ষিত ছিলো কেবল এক পেয়ালা দুধ, যা পাঠানো হয়েছিলো সা'দ ইবনে উবাদার গৃহ থেকে। আমার বয়স হয়েছিলো তখন নয় বৎসর। হজরত আসমা বিনতে উমায়েস বলেছেন, উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বাসরের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন ওলিমার ব্যবস্থা ছিলো না। ঘরে ছিলো কেবল এক পেয়ালা দুধ। ওই দুধ কিছু পান করেছিলেন রসুল স. নিজে, বাকীটুকু তিনি পান করিয়েছিলেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে। তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ করছিলেন। আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র হাত ফিরিয়ে দিবেন না। পান করুন। তখন তিনি ব্রীড়াবনতা হয়ে পেয়ালা গ্রহণ করলেন এবং সামান্য পান করলেন।

মুহাজিরগণের রোগভোগ

এ বৎসরে কোনো কোনো মুহাজির মদীনার আবহাওয়ায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন মদীনায় রোগব্যাধি, জ্বর-জারি লেগেই থাকতো। রসুলেপাক স. এর শুভপদার্পনের পর এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। আবহাওয়া হয়ে যায় স্বাস্থ্যসম্মত। তাঁর দোয়ার বরকতে বালামসিবত-জ্বর-ব্যাধি সব চলে যায় অংশীবাদী জনপদ জুহফার দিকে। প্রথম দিকে জ্বরাক্রান্ত হন হজরত আবু বকর, হজরত বেলাল এবং হজরত আমের। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিজনের মধ্যে সকাল যাপন করে, অথচ মৃত্যু থাকে তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিকতর নিকটে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা পিতার সেবাযত্নের জন্য তাঁর কাছে গিয়ে যখন বর্ণিত কাসিদাটি শুনতে পান তখন বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আব্বুজী যে হুঁশ হারিয়েছেন। একি বলছেন তিনি! হজরত বেলাল ও হজরত আমের ওই বাড়িরই এক কোনে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মুখে মক্কার কাফেরদের জন্য অভিসম্পাত উচ্চারিত হচ্ছিলো। তাঁরা বলে

যাচ্ছিলেন, ওরা আমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিলো? মক্কার পানির নহর এবং পাহাড়-প্রান্তরের কথা স্মরণ করে তাঁরা কবিতা পাঠ করছিলেন, আর জ্বরের ঘোরে বিলাপ করছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রসুল স. এর কাছে গিয়ে তাঁদের অসুস্থতার কথা জানালেন। রসুল স. প্রার্থনা করলেন— হে আল্লাহ্! তুমি মদীনাকে আমাদের কাছে ওইরূপ প্রিয় করে দাও, যেরূপ আমাদের কাছে প্রিয় মক্কা। অথবা প্রিয় করে দাও মক্কা অপেক্ষা অধিক। মদীনার আবহাওয়াকে আমাদের জন্য করে দাও অধিকতর বিশুদ্ধ। আর বরকত দাও এখানকার মাপে ও ওজনে। এখানকার জ্বরকে তুমি স্থানান্তরিত করে দাও জুহ্ফার দিকে।

আজানের প্রচলন

আজানের প্রচলন প্রথম হিজরী সনের আর একটি অন্যতম ঘটনা। ইতোপূর্বে ইবাদত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়টির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কোনো কোনো জীবনালেখ্যপ্রণেতা ঘটনাটিকে দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হজরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ

প্রথম হিজরীর আরেকটি অন্যতম ঘটনা হচ্ছে হজরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ। তিনি পারস্যের ইসপাহান অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ছিলেন ওই সম্প্রদায়ভূত, যারা পূজারী ছিলো শাদা-কালো ঘোড়ার। সত্যধর্মের অন্বেষণে তিনি গ্রহণ করেছিলেন পরিব্রাজক জীবন। প্রথমে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইঞ্জিল কিতাব অধ্যয়ন করেন। তারপর এক আরব গোত্র তাঁকে বন্দী করে এক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। ওই ইহুদী তাঁকে মাকাতিব (চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস) করে নেয়। রসুলেপাক স. তাঁকে চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে সাহায্য করেন। কোনো কোনো জীবনচরিতপ্রণেতা বলেন, রসুলেপাক স. তাঁকে ইহুদীর কাছ থেকে কিনে নিয়ে স্বাধীন করে দেন। ইতোপূর্বে তিনি বিক্রি হয়েছিলেন দশ জায়গায়। এভাবে বিক্রি হতে হতে রসুলেপাক স. এর নিকট পৌঁছেছিলেন সকলের শেষে। রসুলেপাক স. যখন মদীনায় আগমন করেন, তখনই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামগ্রহণের ঘটনা এরকম— একদিন তিনি একপাত্র ভিজা খেজুর নিয়ে রসুলেপাক স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, হে সালমান! এ খেজুর কিসের? তিনি বললেন, আপনার ও আপনার সাহাবীগণের জন্য সদ্কা। তিনি স. বললেন, আমি সদ্কা গ্রহণ করি না। এ কথা শুনে তিনি খেজুরগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। অন্য আর এক দিন হাজির হলেন আর এক পাত্র ভিজা খেজুর নিয়ে। রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, হে সালমান! এ খেজুর কিসের? তিনি বললেন, আপনার ও আপনার সাহাবীগণের জন্য হাদিয়া। উল্লেখ্য,

সদকা হচ্ছে, করুণামিশ্রিত দান, যেখানে দাতার মর্যাদা থাকে উর্ধ্বে। সদকা দরিদ্র-মিসকিনদের হক। আর হাদিয়া হচ্ছে সম্মানী, যেখানে গ্রহীতার সম্মানই থাকে উর্ধ্বে। এরকম উপঢৌকন দিতে হয় শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিবর্গকে। তাঁরা এরকম উপহার গ্রহণ করলে দাতাকেই কৃতজ্ঞ ও ধন্য হতে হয়।

রসুলেপাক স. সাহাবীগণকে বললেন, হাত বাড়াও। খাও। তখন হজরত সালমান ফারসীর নজর পড়লো রসুলেপাক স. এর পৃষ্ঠদেশের মহরে নবুওয়াতের দিকে। নবুওয়াতের এ চিহ্নটি দেখামাত্রই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও তিনি ছিলেন ইহুদীর গোলাম। তারপর রসুল স. ওই ইহুদীর কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে তাঁকে আজাদ করে দেন। এক বর্ণনানুসারে হজরত সালমান ফারসী হায়াত পেয়েছিলেন সাড়ে তিনশ বছর। তবে অধিকাংশের মতে তিনি বেঁচেছিলেন দুইশত পঁচিশ বছর। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেউ কেউ বলেন তিনি হজরত ঈসার জামানা পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

হজরত সালমান ফারসী ছিলেন খন্দকের যুদ্ধের প্রথম সাক্ষী। তিনিই ওই যুদ্ধে পরিখা খনন করার পরামর্শ দেন। বলেন, আমাদের দেশে পরিখাবেষ্টিত হয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। পরিখাখননের সময় আনসার ও মুহাজিরগণের প্রত্যেকেই হজরত সালমানকে কাছে পেতে চাইতেন। তাই রসুলেপাক স. তখন বলেন, সালমানু মিন্না মিন আহ্লিল বাইত (সালমান আহলে বায়তেরই একজন)। আর সালমান তাদেরও একজন, যাদের অনুরাগী বেহেশত স্বয়ং।

হজরত ওমর ফারুক তাঁর খেলাফতকালে হজরত সালমান ফারসীকে মাদায়েনের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের উপার্জনলব্ধ আহার গ্রহণ করতেন। বায়তুলমাল থেকে যা পেতেন, তা সদ্কা করে দিতেন। অভাবী লোকদেরকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভূত সাহাবী ছিলেন তিনি। বহুসংখ্যক হাদিসে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি হজরত ওসমানের খেলাফতকালে পয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলে। প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি বলতেন, আনা সালমানুবনুল ইসলাম (আমি ইসলামের পুত্র সালমান)। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, কুরায়েশরা ভালোভাবেই জানে যে, মূর্খতার যুগে ইবনে খাত্তাব ছিলো তাদের প্রিয় ব্যক্তি। তবে আমি জানি, ওমর ইবনুল ইসলাম সালমান ইবনুল ইসলামের ভাই।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন

হিজরতের প্রথম বৎসরের আরেকটি অন্যতম ঘটনা হচ্ছে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন। এই বন্ধন স্থাপন করা হয়েছিলো জোড়ায় জোড়ায় পঁয়তাল্লিশজন আনসার ও পঁয়তাল্লিশজন মুহাজিরের

মধ্যে। কারো কারো মতে উভয়পক্ষের পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশত জনের মধ্যে। এই বন্ধনের ভিত্তি ছিলো পারস্পরিক আত্মীয়তা ও উত্তারাধিকারিত্ব। ঘটনাটি ঘটেছিলো 'আওয়া লাবিল আরহামু বা'দুহুম আওলা লিবা'দি ফী কিতাবিল্লাহ' (রক্তসম্পর্কীয় ভাই-বোন আল্লাহ্র ফরায়েজে একে অপরের অধিকতর নিকটবর্তী) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বিষয়টি রহিত হয়ে যায়।

শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানীর গ্রন্থ 'ফতহুলবারী' থেকে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে, ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। কেবল আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যই অঙ্গীকারগ্রহণার্থে এরকম করা হয়েছিলো। যখন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত ওসমান, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ সাহাবীগণের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হলো, তখন হজরত আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো অনেককেই ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন। আমি তো বাদ পড়ে গেলাম। আমার ভাই কে হবে? রসুলে আকরম স. বললেন, আমি। (দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমার ভাই)।

নামাজের রাকাত বৃদ্ধি

হিজরতের প্রথম বৎসরে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো। তা হচ্ছে, ইকামত অবস্থায় বিভিন্ন নামাজের রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি করা। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা লিখেছেন, রসুলেপাক স. মদীনায় আগমনের পর যখন দু'মাস, কারো কারো মতে এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলো, তখন নামাজের রাকাতসংখ্যা বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো। ইতোপূর্বে মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত ছাড়া অন্যান্য সকল নামাজ ছিলো দুই রাকাত করে। তারপর জোহর, আসর ও এশার নামাজ দু'রাকাত করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফজরের নামাজ দুই রাকাতই থেকে যায়। কেননা এই নামাজে দীর্ঘ ক্বেরাত পাঠ করা হয়। মাগরিবের নামাজও আগের মতো তিন রাকাত রাখা হয়। কেননা মাগরিব হচ্ছে দিবাভাগের বিতির তুল্য। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, প্রথমে দুই রাকাত করে নামাজ ফরজ করা হয়েছিলো। রসুলেপাক স. এর মদীনায় হিজরতের পরে দুই রাকাত ও চার রাকাত করে নামাজ ফরজ করা হয়। আর সফরের সময়ের নামাজ আগের মতোই দুই রাকাত ঠিক রাখা হয়। এই হাদিসের ভিত্তিতেই হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, মুসাফিরের জন্য নামাজ কসর করা ওয়াজিব। বাহ্যিকভাবে অবশ্য এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে চার রাকাতই ফরজ ছিলো, পরে মুসাফিরের জন্য দু'রাকাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মতটির দলিল এই হাদিসটি— 'ইন্নাল্লাহা ওয়াদ্বাআ' লিল্ মুসাফিরি নিস্ফা সালাতিন' (নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মুসাফিরগণের উপর অর্ধেক নামাজ ফরজ করেছেন)। কোনো কোনো আলেম বলেন, স্বগৃহবাসী অবস্থায় নামাজ চার রাকাত করেই শুরু করা হয়েছিলো।

ভ্রমণাবস্থায় তা দু'রাকাত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম মুসলিম প্রমুখ এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। মোটকথা, হানাফী মাজহাব অনুসারে কসর করা ওয়াজিব। শাফেয়ী মাজহাব অনুসারে কসর করা না করা দু'টোই ইচ্ছাধীন।

বাঘের কথা বলা

হিজরী প্রথম বৎসরের আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে, বাঘের কথা বলা। বর্ণিত আছে, মদীনার উপকণ্ঠ থেকে একদিন একটি বাঘ বকরীর পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে গেলো। রাখাল বাঘটি তাড়া করে বকরীটি ছিনিয়ে নিয়ে এলো। বাঘ তখন বললো, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে রিজিক দিয়েছেন। তুমি তা ছিনিয়ে নিলে? রাখাল বিস্মিত হয়ে বললো, বাঘও কি কথা বলতে পারে? বাঘটি বললো, এটা কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়; বরং বিস্ময়ের বিষয় এটাই যে, এক লোক মদীনার মরুভূমি ও খেজুর বাগানের মাঝখানে থেকে অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন; আর তুমি তা বিশ্বাস করছো না। রাখালটি ছিলো ইহুদী। সে রসুলেপাক স. এর নিকট এসে তার সঙ্গে বাঘের কথা বলার বিষয়ে বললো। রসুলেপাক স. বললেন, এটা হচ্ছে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম আলামত। কিয়ামত অতি শীঘ্রই আসবে, যখন মানুষ আপন আপন গৃহ থেকে বের হবে, কিন্তু ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। তখন জুতা, হাতের লাঠি এবং ঘরে যা কিছু তারা রেখে এসেছিলো, সব বিষয়ে তাদেরকে খবর দেওয়া হবে। ঘটনাটিকে সত্যপন্থী আলেমগণ নবুওয়াতের মোজেজাসমূহের অন্তর্গত একটি ঘটনা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি মোজেজাই।

আশুরার রোজা

এই প্রথম হিজরীতেই আশুরার তারিখে (দশই মহররমে) রোজা রাখার জন্য সাহাবা কেরামকে হুকুম করা হয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. মদীনায় এসে দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা পালন করে। বলে, এইদিন নবী মুসাকে ফেরাউনের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয় এবং ফেরাউনকে তার পুরো বাহিনীসহ নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মারা হয়। এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি সারাজীবন এ রোজা পালন করে যান। রসুলেপাক স. একথা শুনে বললেন, ভ্রাতা মুসার সুন্নত অনুসরণ করার ব্যাপারে আমরাই বেশী হকদার। জনৈক সাহাবীকে ডেকে তিনি স. এইদিনে রোজা রাখার ঘোষণা দিতে বলেন। তারপর থেকে তিনি ও তাঁর সাবাহীগণ আশুরার রোজা রাখতে থাকেন।

আলেমগণ বলেন, আশুরার রোজা সম্পর্কে তিনি স. জানতে পেরেছিলেন ওহীর মাধ্যমে। পরে যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হয়, তখন থেকে আশুরার

রোজার গুরুত্ব কমে যায়। রসুল স. তখন বলেন, আশুরার রোজা এখন ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে রাখবে, অন্যথায় রাখবে না। কোনো কোনো কিতাবের বিবরণদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে আশুরার রোজা ফরজ ছিলো। কিন্তু রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজার ফরজের বিধান রহিত হয়ে যায়।

বোখারী, মুসলিম, মালেক, আবু দাউদ ও তিরমিজীর গ্রন্থে উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূর্খতার যুগে কুরায়েশরা আশুরার রোজা পালন করতো। রসুল স.ও এরকম করতেন। বিদ্বানগণ বলেন, কুরায়েশরা আশুরার রোজা রাখতো পূর্ববর্তী শরিয়তের শিক্ষা প্রবল থাকার কারণে। তারাও আশুরার দিবসের সম্মান করতো এবং ওই দিন তারা কাবাগৃহকে পোশাক পরিধান করাতো। হজরত ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূর্খতার যুগে কুরায়েশদের দ্বারা একটি বৃহৎ পাপ সংঘটিত হয়। তখন তাদের অন্তরে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আশুরার দিনে রোজা রাখলে তাদের ওই পাপ মোচন হবে। 'ফতহুলবারী' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'সফরুস্ সায়াদাত' পুস্তকে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. আশুরার রোজা খুবই আগ্রহের সাথে পালন করতেন। 'জামেউল উসুল' পুস্তকে 'নাসায়ী শরীফ' থেকে বর্ণিত হয়েছে, চারটি বিষয় রসুল স. কখনও পরিত্যাগ করেননি— আশুরার রোজা, যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিনের রোজা, আইয়ামে বীযের রোজা এবং ফজরের ফরজের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ। আলেমগণ বলেছেন, আশুরার রোজা রাখা যায় তিনভাবে— ১. নয়, দশ ও এগারো তারিখে তিনটি রোজা ২. নয় ও দশ তারিখে দু'টি রোজা ৩. শুধু মাত্র দশ তারিখে একটি। প্রথম ধারণাটিই উত্তম। মক্কাবিজয়ের পর রসুলেপাক স. বলেন, আগামী বৎসর থেকে আমি নয় তারিখেও রোজা রাখবো। তিনি স. এরকম বলেছিলেন ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণার্থে। মসনদে ইমাম আহমদ ও বায়যার গ্রন্থদ্বয়ে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আশুরার দিনে রোজা রেখো ইহুদীদের বিরুদ্ধ নিয়মে— পূর্বে অথবা পরে একটি করে রোজা যোগ করে। 'সফরুস্ সায়াদাত' গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে।

আশুরার রোজার ফযীলত সম্বন্ধে হাদিস শরীফে এসেছে, আশুরার একটি রোজা এক বৎসরের রোজার সমতুল্য। এক বর্ণনায় এসেছে, এই রোজার দ্বারা এক বৎসরের গোনার কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর আরাফার দিনের রোজা দুই বৎসরের রোজার সমতুল্য। দুই বৎসরের রোজার সমতুল্য হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলেমগণ বলেন, আশুরার রোজা হজরত মুসা আ. এর শরিয়তের বিধান, আর আরাফার দিনের রোজা শরিয়তের বিধান রসুলেপাক স. এর।

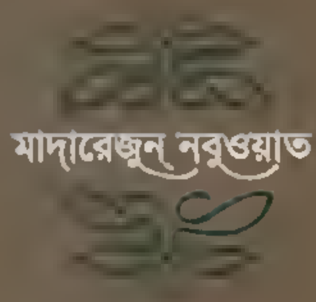
হজরত বারা ইবনে মা'রুরের ইন্তেকাল

হিজরীর প্রথম বৎসরেই হজরত বারা ইবনে মা'রুর ইন্তেকাল করেন। তিনি আনসারদের একজন মুখপাত্র ছিলেন। ছিলেন খাজরাজ ও আসলামী গোত্রসম্পৃক্ত। তিনি ওই সকল সৌভাগ্যবানগণেরও অন্তর্গত ছিলেন, যাঁরা স্বগোত্রের লোকদের কথায় বিশ্বাস করে দ্বিতীয় আকাবার রাতে রসুলেপাক স. এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। আর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়ত করে যান। আর আনসারগণের মুখপাত্রগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। রসুলেপাক স. মদীনায় আগমনের পর সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কবরের কাছেই তাঁর জানাযার নামাজ পড়েন। দোয়া করেন— আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়ারাদ্বু আনহু (হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাকে রহম করো এবং তার প্রতি পরিতুষ্ট হও)।

হজরত আসআদ ইবনে সুরারাহ'র ইনতেকাল

হজরত আসআদ ইবনে সুরারাহ'র ইন্তেকাল হয় এই বৎসরেই। তিনিও ছিলেন আনসারগণের মুখপাত্রগণের অন্যতম। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবাতে শপথ নিয়েছিলেন। বনী সায়েদার মুখপাত্র ছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মদীনার আনসারদেরকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেন এবং ইসলাম প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু আনসার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনার প্রতিটি গৃহে ইসলামের আমন্ত্রণ পৌঁছে দেন। তাঁর ইন্তেকাল হয় প্রথম হিজরীর ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে। তখন মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ চলছিলো। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। আনসারগণ বলেন সর্বপ্রথম তাকেই জান্নাতুল বাকীতে কবর দেওয়া হয়। আর মুহাজিরগণ বলেন, সেখানে প্রথম সমাহিত করা হয় ওসমান ইবনে মাযউনকে। এ বৎসর আরো ইন্তেকাল করেন হজরত কুলসুম ইবনে হাদান এবং মুহাজিরগণের মধ্যে হজরত ওসমান ইবনে মাযউন। মুশরিকদের মধ্য থেকেও অনেক লোকের মৃত্যু হয় এই বৎসরে। তাদের মধ্যে রয়েছে হজরত আমর ইবনুল আসের পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের পিতা ওলীদ ইবনে মুগীরা। জীবনচরিতবিদগণ বলেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা মৃত্যুকালে খুব বেশী চিৎকার করছিলো। তখন আবু জেহেল তাকে বললো, চাচা! এতো চিৎকার করছো কেনো? সে বললো, আমার ভয় হচ্ছে, ইবনে আবু কাবশার ধর্ম না জানি মক্কায় প্রবল হয়ে যায়। তখন আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, ভয় কোরো না, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। তার ধর্ম প্রবল হতে পারবে না। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকেরা রসুলেপাক স.কে ইবনে আবু কাবশা বলতো। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেন, জাহেলীযুগের এক ইবাদতপ্রিয় ব্যক্তির নাম ছিলো আবু কাবশা। তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে মনে করে তারা রসুলেপাক স.কে ইবনে আবু কাবশা বলতো। কেউ কেউ বলেন, আবু কাবশা ছিলেন রসুলুল্লাহ স. এর দুগ্ধ সম্পর্কিত পিতামহ।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত



ISBN 984-70240-0016-3